শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-১

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত

জাতীয় চার নেতা

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীন বাংলাদেশের উপ-রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের একজন অন্যতম সংগঠক ও নেতা।

তাজউদ্দীন আহমেদ ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ সহচর। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের (যা মুজিবনগর সরকার হিসেবে পরিচিত) প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় তিনি সফল নেতৃত্ব প্রদান করেন।

তাজউদ্দীন আহমদ

মুহাম্মদ মনসুর আলী

ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এবং বঙ্গবন্ধুর খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। সে সময়ে খাদ্য, বস্ত্র, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের জন্য অর্থ সংস্থানের যে গুরু দায়িত্ব ছিল তা তিনি সফলভাবে পালন করেন।

আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান তৎকালীন নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মুজিবনগর সরকারের স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন। সে সময়ে তিনি ভারতে আশ্রয় নেওয়া লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর জন্য ত্রাণ সংগ্রহ ও ত্রাণ শিবিরে তা বিতরণ এবং পরবর্তী সময়ে শরণার্থীদের পুনর্বাসন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অত্যন্ত সফলতার সাথে পালন করেন।

আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান

তৎকালীন আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন এই চারজন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার প্রায় আড়াইমাস পরে ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর ঘাতকদল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী এই চার জাতীয় নেতাকে নির্মমভাবে গুলি করে ও বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-১

Shrimp Culture & Breeding-1

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

নবম ও দশম শ্রেণি

লেখক

মো: নাজমুল হক

বিএসসি ফিসারিজ (অনার্স)

এমএস ইন ফিসারিজ অ্যান্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি

বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ (মৎস্য)

কমিউনিটিভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, সুনামগঞ্জ

সম্পাদক

ড. মোহা: সাইনার আলম

সহকারী পরিচালক

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

মৎস্য ভবন, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ২০১৬

পুনর্মুদ্রণ: , ২০২১

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানব সম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিকস্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনালস্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনালস্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ বছর উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ক্রটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ক্রটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম পত্র		
অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
প্রথম	বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদ	১–১২
দ্বিতীয়	বাগদা চিংড়ির জীববিদ্যা	১৩–২৭
তৃতীয়	বাগদা চিংড়ির চাষ	২৮–৫৭
চতুর্থ	বাগদা চিংড়ির খামার	৫৮–৬১
পঞ্চম	বাগদা চিংড়ি খামারের অবকাঠামো নির্মাণ	৬২–৬৫
ষষ্ঠ	বাগদা চিংড়ির খামার প্রস্তুতকরণ	৬৬–৮৪
সপ্তম	পোনা মজুদ	৮৫–৯৯
অষ্টম	পোনার মজুদোত্তর ব্যবস্থাপনা	১০০–১১২
নবম	বাগদা চিংড়ির খাদ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা	১১৩–১২০
	ব্যবহারিক	১২২–১৫১

দ্বিতীয় পত্র		
অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
প্রথম	বাগদা চিংড়ি আহরণ ও বাজারজাতকরণ	১৫৩–১৭৪
দ্বিতীয়	বাগদা চিংড়ির গুণগতমান সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ	১৭৫–১৯৭
তৃতীয়	বাগদা চিংড়ির প্রজনন ও হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা	১৯৮–২১৫
চতুর্থ	বাগদা চিংড়ির ব্রুড সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা	২১৬–২২০
পঞ্চম	বাগদা চিংড়ির নার্সারি	২২১–২৪০
ষষ্ঠ	বাগদা চিংড়ির রোগ ব্যবস্থাপনা	২৪১–২৫৯
সপ্তম	বাগদা চিংড়ি চাষের প্রকল্প প্রণয়ন	২৬০–২৬৬
	ব্যবহারিক	২৬৮–২৯৩
	তথ্য পুঞ্জি	২৯৪–২৯৫

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদ

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আধা লোনা বা স্বল্প লোনা পানিতে বাগদা চিংড়ি চাষ হয়। এ অঞ্চলের আবহাওয়া, জলবায়ু ও পানির গুণাবলি বাগদা চিংড়ি চাষের সহায়ক। জলজ সম্পদ সমৃদ্ধ বাংলাদেশের চিংড়ি ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে, অভ্যন্তরীণ জলজ সম্পদ ও সামুদ্রিক এলাকা। এ দেশে বদ্ধ জলাশয় আছে ৫,২৮,৩৯০ হেক্টর, তার মধ্যে পুকুর বা ডোবা ৩.০৫.০২৫ হেক্টর, বাঁওড় ৫.৪৮৮ হেক্টর ও চিংড়ি খামার এলাকা ২.১৭.৮৭৭ হেক্টর। উক্ত জলাশয় রয়েছে ৪০,৪৭,৩১৬ হেক্টর, তার মধ্যে নদী ও মাহেলা ৮,৫৩,৮৬৩ হেক্টর, বিল ১,১৪,১৬১ হেক্টর, কাপ্তাই লেক ৬৮,৮০০ হেক্টর, বন্যাপ্লাবিত এলাকা ২৮,৩২,৭৯২ হেক্টর ও সুন্দরবন এলাকা ১,৭৭,৭০০ হেক্টর। বাংলাদেশের ৭১০ কিলোমিটার তটরেখার কাছাকাছি বেইজলাইন থেকে সাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত প্রায় ১,৬৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বিস্তৃত একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের সামুদ্রিক জলসম্পদ রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, এ দেশের স্বাদু পানিতে ২৪ প্রজাতির চিংড়ি ও লোনা পানিতে ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ-এর ২০০৭-২০০৮ সনের তথ্যানুসারে বাংলাদেশের জলজসম্পদ ও মাছের মোট উৎপাদন নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো।

সারণিঃ বাংলাদেশের জলজ সম্পদ ও মাছের উৎপাদন

মৎস্য সেক্টর	জলায়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (মে. টন)	শতকরা (%)
ক. অভ্যন্তরীণ জলাশয়			
(১) মুক্ত জলাশয়			
১. নদী ও মোহনা	৮,৫৩,৮৬৩	১,৩৬,৮১২	
২. সুন্দরবন	১,৭৭,৭০০	১৮,১৫১	
৩. বিল	১,১৪,১৬১	৭৭,৫২৪	
৪. কাপ্তাই লেক	৬৮,৮০০	৮,২৪৮	
৫. পাবনভূমি	২৮,৩২,৭৯২	৮,১৯,৪৪৬	
মোট	৪০,৪৭,৩৬১	১০,৬০,১৮১	৪১.৩৬
(২) বদ্ধ জলাশয়			
১. পুকুর	৩,০৫,০২৫	৮,৬৬,০৪৯	
২. বাওড়	৫,৪৮৮	৪,৭৭৮	
৩. চিংড়ি খামার	২,১৭,৮৭৭	১,৩৪,৭১৫	
মোট	৫,২৮,৩৯০	১০,০৫,৫৪২	৩৯.২৩
অভ্যন্তরীণ জলাশয় (মোট)	৪৫,৭৫,৭০৬	২০,৬৫,৭২৩	৮০.৫৯
(৩) সামুদ্রিক জলাশয়			
১. ট্রলার		৩৪,১৫৯	
২. আর্টিসেনাল		৪,৬৩,৪১৪	
মোট		৪,৯৭৫৭৩	১৯.১৪
সর্বমোট		***২৫,৬৩,২৯৬***	***১০০.০০***

সুত্রঃ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০০৯ সংকলন, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

চিংড়ির প্রাপ্তিস্থান

নিচে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু লোনা ও স্বাদু পানির চিংড়ির প্রাপ্তিস্থান বর্ণনা করা হলো:

বাগদা চিংড়ি (*Penaeus monodon*): বাংলাদেশের উপকূলীয় ও মোহনা অঞ্চল, যেমন বাগেরহাটের উর্ধ্ব মোহনা, চালনা মোহনা, খুলনার পশুর নদীর মুখে নিম্ন মোহনা, পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালি, খেপুপাড়া মোহনা, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলা এবং বঙ্গোপসাগর। তাছাড়া ভোলা জেলার লালমোহন ও চরফ্যাশন উপজেলা সংলগ্ন মেঘনা নদী ও বুড়গৌরাঙ্গ নদীর মোহনায় পাওয়া যায়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, তাইওয়ান, উত্তর অস্ট্রেলিয়া, মালয় আর্কিপেলাগো, জাপান, দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা ও লোহিত সাগরে এদের পাওয়া যায়।

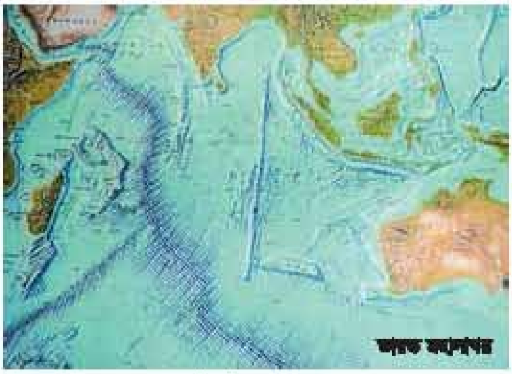

চিত্র: বাগদা চিংড়ির বিচরণ এলাকা

চাকা চিংড়ি (Penaeus indicus): বাংলাদেশের খুলনা, চালনা, পটুয়াখালী, খেপুপাড়া, কক্সবাজার ও বঙ্গোপসাগরে পাওয়া যায়। গালফ অব এডেন, মাদাগাস্কার, আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, নিউগিনি, ভারত ও উত্তর অস্ট্রেলিয়ায় এই চিংড়ি দেখা যায়।

চিত্র: চাকা চিংড়ির বিচরণ এলাকা

বাগতারা চিংড়ি (Penaeus semisulcatus): বাংলাদেশের সুন্দরবনের মোহনা ও পটুয়াখালীর খেপুপাড়া এদের বিচরণ এলাকা। দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা, মালয় আর্কিপেলাগো, জাপান, অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চল, ফিলিপাইন, ভারতের পূর্ব উপকূল, নিউগিনি ও মালয়েশিয়াতে এই চিংড়ি পাওয়া যায়।

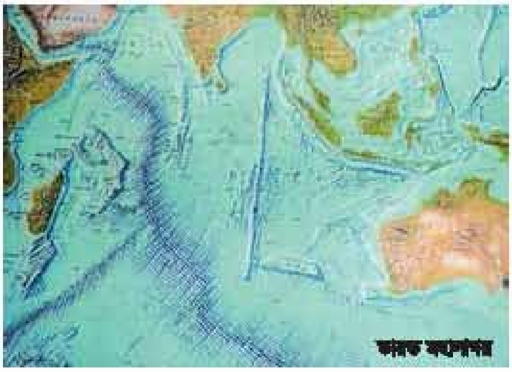

চিত্র: বাগতারা চিংড়ির বিচরণ এলাকা

হরিণা চিংড়ি *(Metapenaeus monoceros)*: বাগেরহাটের ঊর্ধ্ব মোহনা, চালনা মোহনা, কুমারখালী মোহনা, ডুবলা, চরচাপলি, খুলনার পশুর নদীর মুখে নিম্ন মোহনা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও বঙ্গোপসাগর এলাকা এই চিংড়ির বিচরণ ক্ষেত্র। দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত মহাসাগর, মালয়েশিয়া, মালাক্কা স্ট্রেইট ও ভারতের সমগ্র সমুদ্র উপকূল এলাকায় এদের পাওয়া যায়।

চিত্রঃ হরিণা চিংড়ির বিচরণ এলাকা

হন্নি চিংড়ি *(Metapenaeus bravicornis)*: বাগেরহাটের ঊর্ধ্ব মোহনা, চালনা মোহনা, চট্টগ্রাম মোহনা, সাতক্ষীরা মোহনা ও বঙ্গোপসাগর এদের বিচরণ ক্ষেত্র। পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ভারতের সমুদ্র উপকূলে এদের। পাওয়া যায়। পাকিস্তান ও ভারতে এটি বাণিজ্যিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিংড়ি।

চিত্রঃ হন্নি চিংড়ির বিচরণ এলাকা

ডোরা কাটা চিংড়ি *(Penaeus japonicus)*: বাংলাদেশের গভীর সমুদ্রে এই চিংড়ি পাওয়া যায়। জাপান ইন্দো-প্যাসিফিক এলাকা, আফ্রিকা ও ভারতের মাদ্রাজ উপকূলে এই ডোরা কাটা চিংড়ি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

চিত্রঃ ডোরা কাটা চিংড়ির বিচরণ এলাকা

বাগতারা চিংড়ি *(Parapenaeopsis stylifera)*: বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলাধীন মহেশখালী এলাকায় মূলত এই চিংড়ি পাওয়া যায়। কুয়েত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, ভারত, বার্মা ও ইন্দোনেশিয়াতে এদের বিচরণ এলাকা।

চিত্র: বাগতারা চিংড়ির বিচরণ এলাকা

বাগাচামা চিংড়ি *(Penaeus:hierguensis)*: ঈষৎ লবণাক্ত পানি ও লোনা পানিতে বাগাচামা চিংড়ি বাস করে। সমুদ্রের ১০-৪৫ মিটার পানির গভীরে এদের পাওয়া যায়। দক্ষিণ চীন সাগর, মালয় আর্কিপেলাগো, অস্ট্রেলিয়া, এরাবিয়ান গালফ, পাকিস্তান ও ভারত এদের বিচরণ ক্ষেত্র।

চিত্র: বাগাচামা চিংড়ির বিচরণ এলাকা

গলদা চিংড়ি *(Macrobrachium rosenbergii)*: বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র বিশেষ করে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, চাঁদপুর, চট্টগ্রামের হালদা নদী ও ভালো জেলায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্র উপকূল, পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় অঞ্চল, উড়িষ্যা ও অন্ধ্র প্রদেশ, পূর্ব আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, শ্রীলংকা ও মায়ানমারে এই চিংড়ি পাওয়া যায়। এছাড়াও পশ্চিম গোলার্ধের ইন্দো জেলটা এলাকায় এদের পাওয়া যায়।

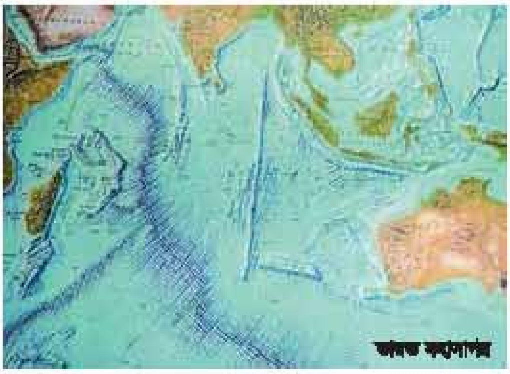

চিত্র: গলদা চিংড়ির বিচরণ এলাকা

২০২২

ছটকা চিংড়ি *(Macrobrachium inalcolmasonnii)*: বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, কুমিল্লাম্লা জেলার দাউদকান্দি, চাঁদপুর, নরসিংদী, রংপুর, ফরিদপুর, ফেনী, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও চট্টগ্রামে এই চিংড়ি পাওয়া যায়। এছাড়া ভারতের গঙ্গা, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণাকাবেরী, পাকিস্তানের সিন্ধু নদ, মায়ানমার ও বোর্নিওতে ছটকা চিংড়ি পাওয়া যায়।

ডিমুয়া চিংড়ি *(Macrobrachium villosinanus)*: বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই বিশেষ করে কুমিল্লাম্লা, ফেনী ও বাগেরহাট জেলা, বিল ডাকাতিয়া, মেঘনা, কর্ণফুলী ও হালদা নদীতে এদের বিচরণ এলাকা। এছাড়া ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বার্মায় এদের পাওয়া যায়।

শুল চিংড়ি *(Macrobrachiurn birnanicus)*: বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই কম বেশি এই চিংড়ি পাওয়া যায়। তবে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ও সিলেট অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে শুল চিংড়ি পাওয়া যায়।

গোদা চিংড়ি *(Macrobrachium rude)*ঃ বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রামের হালদা নদীতে পাওয়া যায়। ভারত, আফ্রিকা, মাদাগাস্কার ও শ্রীলংকাও এদের বিচরণ এলাকা।

চিকনা চিংড়ি *(Macrobrachium idella)*: বাংলাদেশের সর্বত্রই বিদ্যমান। পূর্ব আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, মালয় আর্কিপেলাগো, ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের মোহনা ও নদীতে বিশেষ করে পূর্ব সমুদ্র উপকূলে এদের বিচরণ ক্ষেত্র।

লটিয়া চিংড়ি *(Macrobrachium mirabile)*: বাংলাদেশের মেঘনা নদী, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী ও খুলনা অঞ্চলে এই চিংড়ি বাস করে। ভারতের গাঙ্গেয় অঞ্চল, মায়ানমার, মালয়েশিয়া ও বোর্নিও-তে পাওয়া যায়।

চিংড়ি সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

জাতীয় আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চিংড়ি সম্পদ বাংঙ্গাদেশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে। সত্তর দশকের দিকে বিশ্ব বাজারে চিংড়ির চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে চিংড়ির উৎপাদন প্রতিযোগিতামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়। এ সময়েই বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বেড়ি বাঁধের অভ্যন্তরে প্রথমে চিংড়ি চাষ শুরু হয়। এর পূর্বেও বাংলাদেশে সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হত। চাষ প্রযুক্তি হিসেবে খামারের অভ্যন্তরে উপযুক্ত সময় অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত ও প্রতিপালিত অধিক পোনা সমৃদ্ধ মোহনা অঞ্চলের পানি নালা কেটে প্রবেশ করিয়ে চিংড়ির পোনা পালনের জন্য সংরক্ষণ করা হত। খামারে নির্দিষ্টভাবে বা নির্দিষ্ট সংখ্যক পোনা মজুদ না করে মূলত জোয়ারের পানির সাথে ভেসে আসা পোনা সংরক্ষণের মাধ্যমেই চিংড়ি চাষ করা হত। এ কার্য সম্পাদনে বাগদা চিংড়ির প্রজনন মৌসুমের (মার্চ-নভেম্বর) পূর্ণিমার সময়ে জোয়ারের পানি খামারে প্রবেশ করানো হত এবং তিন-চার মাস পর খামারের পানি বের করে দিয়ে চিংড়িসহ অন্যান্য মাছ আহরণ করা হত। এ সময়ে হেক্টর প্রতি চিংড়ির গড় উৎপাদন ছিল প্রায় ২০ থেকে ৫০ কেজি। নিচের সারণিতে বিগত ১০ বছরের চিংড়ির উৎপাদন উল্লেখ করা হলো।

মূলত সত্তর দশকে চিংড়ির বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাংলাদেশে সত্তর থেকে আশি দশকের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে চিংড়ি চাষি ও খামার স্থাপনের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সত্তর দশকের শেষের দিকে খুলনা অঞ্চলের সাতক্ষীরা সদর, দেবহাটা, কালীগঞ্জ ও শ্যামনগর উপজেলায় গতানুগতিক পদ্ধতিতে প্রথমে চিংড়ি চাষ শুরু হয়। অধিক লাভজনক শিল্প হিসেবে চিংড়ি সম্পদ স্থানীয় জনসাধারণের কাছে বিবেচিত

হওয়ার কারণে ধীরে ধীরে চিংড়ির চাষ খুলনা, বাগেরহাট, পিরাজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী ও যশোর অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তার লাভ করে।

সারণি: বিগত ১০ বছরে বাংলাদেশে চিংড়ির উৎপাদন

বছর	চিংড়ি উৎপাদন মে. টন						সর্বমট উৎপাদন মে.টন
	অভ্যন্তরীণ জলাশয়			সামুদ্রিক জলাশয়			
	উন্মুক্ত	চাষকৃত	মোট	ট্রলার	আর্টিসেনাল	মোট	
১৯৯৮-১৯৯৯	৪৯২৯৬	৬৩১৬৪	১১২৪৬০	৩৭৬৫	২৭৯৭৭	৩১৭৪২	১৪৪২০২
১৯৯৯-২০০০	৪৩১৬৭	৬৪৬৪৭	১০৭৮১৪	২৯১৫	২৮৪৮০	৩১৩৯৫	১৩৯২০৯
২০০০-২০০১	৪৪৩৪৩	৬৪৯৭০	১০৯৩১৩	৩১৭২	২৭৮৬৫	৩১০৩৭	১৪০৩৫০
২০০১-২০০২	৫৪৯৬৫	৬৫৫৭৯	১২০৫৫৪	৩১৬৮	২৮৮০৮	৩১৯৭৬	১৫২৫২০
২০০২-২০০৩	৬০৮৭৬	৬৬৭০৩	১২৭৫৭৯	২৪৮৬	২৯৪৪৫	৩১৯৩১	১৫৯৫১০
২০০৩-২০০৪	৬৩১০৩	৭৫১৬১	১৩৮২৭০	৩০৭৫	৩৩৪১৩	৩৬৪৮৮	১৭৪৭৫৮
২০০৪-২০০৫	৬৮৭৬৮	৮২৬৬১	১৫১৪২৯	৩৩১১	৪০৯৫০	৪৪২৬১	১৯৫৬৯০
২০০৫-২০০৬	৭৭৩৮১	৮৫৫১০	১৬২৮৯১	৩৪৪৪	৪৪৬৭৫	৪৮১১৯	২১১০১০
২০০৬-২০০৭	৮২৪২২	৮৬৮৪০	১৬৯২৬২	২১৭৫	৪৯৬৯৪	৫১৮৬৯	২২১১৩১
২০০৭-২০০৮	৭৫৬৭৮	৯৪২২১	১৬৯৮৮৯	২৬২০	৫০৫৮৬	৫৩২০৬	২২৩০৯৫

সুত্র: জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০০৯ সংকলন, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

বিগত ১৯৮৩-৮৪ সালের দিকে বাংলাদেশে বাগদা চিংড়ি চাষের মোট জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ৫১.৮১ হাজার হেক্টর এবং হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ছিল প্রায় ৮৫ কেজি/উৎপাদন চক্র। পঞ্চাশ দশকের দিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বাদুপানিতে গলদা চিংড়ির চাষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শুরু হলেও আমাদের দেশে শুরু হয় সত্তর দশকের শেষ দিকে। এ সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে জাপান, হাওয়াই, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও তাইওয়ানে গলদা চিংড়ি চাষের উপর উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের পূর্বে গলদা চিংড়ির চাষের কোনো স্বতন্ত্র এলাকা ছিল না বললেই চলে এবং বাগদা চিংড়ি মাত্র আড়াই হাজার হেক্টর জমিতে চাষ করা হত। এ সময় গলদা চিংড়ির গড় উৎপাদন ছিল হেক্টর প্রতি ৪০ থেকে ১০০ কেজি। বাংলাদেশে সমগ্র উপকূলীয় ও অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে চিংড়ি চাষ ব্যাপক প্রসার লাভ করে মূলত আশি থেকে নব্বই দশকের দিকে। বর্তমানে বেশিরভাগ খামারে সনাতন পদ্ধতি পরিহার করে অনেকটা উন্নত চাষ প্রযুক্তির মাধ্যমে চিংড়ি চাষাবাদ হচ্ছে। তবে উন্নত চাষ প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত চিংড়ি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হলেও উপকূলবর্তী এলাকায় কিছুটা পরিবেশগত সমস্যা দেখা যাচ্ছে বলে প্রাপ্ত তথ্যে প্রতীয়মান হয়।

রপ্তানি বাণিজ্যে পোশাক শিল্পের পরেই চিংড়ি শিল্পের অবদান। গত ২০০৬-২০০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ৭৩.৭১ ও ৭৫.৩০ হাজার মেট্রিক টন চিংড়ি রপ্তানি করে যথাক্রমে ৩৩৫৩ ও ৩৩৯৬ কোটি টাকা আয় করা সম্ভব হয়েছে। আবার বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত হিমায়িত মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের মধ্যে চিংড়ির অবদান প্রায় ৯০ শতাংশ। আমাদের জাতীয় আয়ের ৪.৬৩ শতাংশ ও কৃষি আয়ের ২৩ শতাংশ আসে মৎস্য খাত থেকে। বাংলাদেশে এই শিল্পে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য পেশা, যেমন- আহরণ, চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, রপ্তানি বাণিজ্য এবং অন্যান্য মৎস্যবিষয়ক সহায়ক কাজে নিয়োজিত।

২০২২

বাংলাদেশ হতে মোট রপ্তানির প্রায় ৯৫ শতাংশ চিংড়ি ইউরোপডীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে রপ্তানি করা হয় । বিগত ১০ বছরের প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, চিংড়ি রপ্তানির পরিমাণ এবং অর্জিত আয় প্রতি বছর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে প্রক্রিয়াজাকরণ কারখানার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৫ সালে হিমায়িত কারখানার সংখ্যা ৯৭ থাকলেও বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৩৩ টি । প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাগুলোত নারীদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। সামুদ্রিক জলজসম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। অবহেলিত উপকূলীয় এলাকায় ব্যবস্থা উন্নত হচ্ছে । চাষের এলাকা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেসরকারিভাবে হ্যাচারির সংখ্যা ও শ্রিম্প খাদ্য কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ।

চিংড়ি সম্পদের সামাজিক গুরুত্ব

শতাব্দীকাল থেকেই আমাদের দেশের চিংড়ি প্রাকৃতিক পরিবেশে লালিত-পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চিংড়ি সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম হলেও অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই সম্পদের গুরুত্ব আজ নানা প্রশ্নের সম্মুখীন । উপকূলীয় এলাকার বিশাল জনগোষ্ঠীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ বছরের প্রায় ৬ থেকে ৮ মাস বাগদা চিংড়ির পোনা ধরার কাজে নিয়োজিত । এক গবেষণায় দেখা যায়, সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষক পরিবারের ৭০-৭৫ শতাংশ সদস্য পোনা ধরার মৌসুমে পোনা ধরে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে ।নিচের সারণিতে অঞ্চলভেদে পোনা সংগ্রহকারীদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলোঃ

সারণিঃ অঞ্চলভেদে চিংড়ি পোনা সংগ্রহকারীদের বৈশিষ্ট্য

সংগ্রহকারীর প্রকারভেদ		খুলনা-বাগেরহাট-সাতক্ষিরা অঞ্চল	চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অঞ্চল
বয়সঃ	১-১৫ বৎসর	২৩.৭%	৮০.০%
	১৬-৩০ বৎসর	৭৬.০%	১৬.৭%
লিঙ্গঃ	পুরুষ	৬৯.২%	৬৮.৪%
	মহিলা	৩০.৮%	৩১.৪%
পারিবারিক সদস্য সংখ্যা (গড়)		৬ জন	৯ জন
দৈনিক আয় (টাকা)		৩৬.২০	৫০.৭০

উপরোক্ত সারণিতে দেখা যায় উপকূলীয় অঞ্চলের শতকরা প্রায় ৩১ ভাগ মহিলা পোনা সংগ্রহের কাজে জড়িত । কাজেই বলা যায়, পোনা সংগ্রহের ফলে দুস্থ ও বিধবা মহিলারা অনেকাংশেই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । বাগদা চিংড়ির পোনা আহরণ থেকে এই অতিরিক্ত আয়ের ফলে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থায় কিছুটা হলেও সচ্ছলতা দেখা দিয়েছে । উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষ, ধান চাষ ও লবণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভূমির ব্যবহার নিয়ে গ্রামীণ জনপদে অনেক সময় সামাজিক কলহ-বিবাদের সৃষ্টি হয় । চিংড়ি চাষ অত্যন্ত লাভজনক বিধায় চিংড়ি বড় করার জন্য চিংড়ি চাষিরা খামারের লোনা পানি ধান চাষকালীন সময়েও আটকিয়ে রাখে । ফলে ক্রমান্বয়ে চিংড়ি চাষের জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ধানের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে, এমনকি ধান চাষিদের আমন বীজতলাও নষ্ট হচ্ছে । ফলশ্রুতিতে দরিদ্র বর্গাচাষি ও প্রান্তিক চাষিরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা অঞ্চলে একই জমিতে ধান ও চিংড়ি চাষ এবং চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অঞ্চলে একই জমিতে লবণ ও চিংড়ি চাষ হয়ে থাকে । কক্সবাজার অঞ্চলে পানির লবণাক্ততা

২০২২

অধিক বিধায় ধান চাষ সুবিধাজনক নয়। এসব জমিতে নভেম্বর-এপ্রিল মাসে লবণ উৎপাদিত হয়। নিচের সারণিতে চিংড়ি, ধান ও লবণ উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্যাবলি দেয়া হলো:

সারণি: উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি, ধান ও লবণ উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাবলি

চাষ পদ্ধতি		খুলনা-বাগেরহাট-সাতক্ষীরা অঞ্চল	চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অঞ্চল
চিংড়ি চাষ:	উৎপাদন হার (কজি/হে।)	২০৭.২০	৩৭৪.১০
	আয় (টাকা/হে.)	১৪৭৩৪.৩০	৯৫৭৭.২০
ধান-চিংড়ি চাষ :	ধানের উৎপাদন (কেজি/হে.)	৬৬০.০০	—
	চিংড়ির উৎপাদন (কেজি/হে.)	৪২.৭০	—
ধান উৎপাদন কেজি/হে.:	চিংড়ি চাষের পুর্বে	৬১৭.১০	—
	চিংড়ি চাষের পরে	৬০৫.৩০	—
লবন উৎপাদন:		—	
	চিংড়ি/মাছ উৎপাদন (কেজি/হে.)		৭৭.৯০
লবন উৎপাদন কেজি/হে.			
	চিংড়ি চাষের পূর্বে	—	১৩৫৫৮.৫০
	চিংড়ি চাষের পর	—	১২৯৬৪.৫০

চিংড়ি চাষের জমিতে আপাত দৃষ্টিতে ধানের উৎপাদন কিছুটা কমে গেলেও চিংড়ি চাষই উৎপাদন হ্রাসের একমাত্র কারণ নয়। বরং চিংড়ি চাষিদের ধান চাষের জন্য দেরিতে জমি ছেড়ে দেয়া, দেরিতে ধানের বীজ রোপণ করা কিংবা আগাম ধান কেটে নেয়া প্রভৃতি কারণে ধানের স্বাভাবিক উৎপাদন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

চিংড়ি চাষে পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বাগদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারিত হওয়ার পূর্বে ধান উৎপাদন ও লবণ চাষের অন্যতম ক্ষেত্র ছিল। কিন্তু চিংড়ি চাষ অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা হিসেবে পরিগণিত হওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং এর ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব দেখা দিয়েছে। পরিকল্পিত চাষ ব্যবস্থাপনা ছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক চিংড়ি চাষ সম্প্রসারিত হলে দীর্ঘমেয়াদীভাবে পরিবেশের উপর কী প্রভাব পড়তে পারে সে সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা থাকা দরকার।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের এক গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, সাতক্ষীরা অঞ্চলে ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় ৫৮ হাজার লাকে (প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক) প্রাকৃতিক উৎস থেকে পোনা সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত থাকে। সাতক্ষীরা অঞ্চলে প্রত্যেক পোনা সংগ্রহকারী বাগদা চিংড়ির লার্ভা বা পোনা সগ্রহ করতে ৩৮ টি অন্যান্য চিংড়ি প্রজাতি, ৬টি মাছের প্রজাতি ও ৫৬ টি মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য প্রাণীকণা (জু-প্ল্যাংকটন) বিনষ্ট করছে। বাগেরহাট অঞ্চলে ১৪ টি অন্যান্য প্রজাতির চিংড়ি, ৬টি মাছের প্রজাতি ও ২১টি মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য প্রাণীকণা বিনষ্ট করছে। চিংড়ি চাষের ফলে অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন-উপকূলীয়

২০২২

এলাকার জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী, স্থলজ গাছপালা ইত্যাদির উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে বলেও গবেষণায় দেখা যায়। উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষের ফলে বিভিন্ন পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হয়েছে। চিংড়ি চাষের ফলে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের প্রাচুর্যতাও হ্রাস পেয়েছে।

চিংড়ি সম্পদ উন্নয়নে সমস্যা

আমাদের দেশে চিংড়ি চাষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। বাগদা চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে লবণাক্ত পানি প্রধান উৎপাদন উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। চিংড়ি চাষের অন্যান্য উপকরণসমূহের মধ্যে চিংড়ি পোনার প্রাপ্যতা, সম্পূরক খাদ্য ও লাগসই প্রযুক্তি অন্যতম। চিংড়ি উৎপাদনে চিংড়ির জীব-পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যসমূহের সংরক্ষণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিকভাবে উপরোক্ত উৎপাদন উপকরণসমূহের সমন্বয়ের অভাব ও চিংড়ি চাষ পদ্ধতির উপর প্রযুক্তিগত ধারণা না থাকার কারণেই বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। নিচে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে চিংড়ি উৎপাদনের প্রধান প্রধান সমস্যাসমূহ বর্ণনা করা হলো:

ক. সামাজিক সমস্যা: চিংড়ির অর্থনৈতিক মূল্য বেশি ও চিংড়ি ধরা সহজ হওয়ার কারণে চিংড়ি চাষ এলাকায় সামাজিক সমস্যাও বেশি। ফলে অনেক সময় অধিকাংশ চাষি ও উদ্যোক্তা চিংড়ি চাষে আগ্রহ কম দেখায়। লোনা পানির চিংড়ি চাষ সমৃদ্ধ উপকূলীয় এলাকার জনসাধারণ তুলনামূলকভাবে কম শিক্ষিত হওয়ায় আর্থ-সামাজিক সংঘাত অনেক সময় খুব প্রকট হয়ে উঠে। চিংড়ি চাষ ব্যয়বহুল হওয়ার সাথে সাথে আয়ের হার বেশি হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এলাকার মহাজন বা প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ চিংড়ি চাষে সংশ্লিষ্ট এলাকার দরিদ্র চিংড়ি চাষিদের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এলাকার চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণে দরিদ্র চাষিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় না। এছাড়াও চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনাও অন্যতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। চিংড়ি চাষের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, দ্রুত ঋণ প্রাপ্তিতে জটিলতা চিংড়ি চাষের জমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে জটিলতা, ইত্যাদি অন্যতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত।

খ. পরিবেশগত সমস্যা: বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে অপরিকল্পিতভাবে লোনা পানির চিংড়ি চাষ করার ফলে নানা ধরনের পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। চিংড়ি চাষের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উপকূলীয় বন ভূমি, কৃষি জমি এবং পানীয় জলের উৎস। আরও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উপকূলীয় বনজসম্পদ, হ্রাস পাচ্ছে গো-চারণ ভূমি, কৃষি জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, উপকূলীয় এলাকার জীব-বৈচির্ত্য হ্রাস ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে প্রাণির বিচরণ ক্ষেত্রও নষ্ট হচ্ছে। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে পরিবেশের উপর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে।

গ. প্রযুক্তিগত প্রতিককতা: সত্তরের দশকে আমাদের দেশে চিংড়ির চাষ শুরু হলেও এখনো আধুনিক চাষ ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি বলেই প্রতীয়মান হয়। এর প্রধান কারণগুলো হলো- চিংড়ি চাষের উপর সাধারণ চাষিদের মাঝে প্রযুক্তিগত ধ্যান-ধারণার অভাব, আধানিবিড় বা নিবিড় চাষ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণের দুষপ্রাপ্যতা, সময়মত চিংড়ির পোনার অভাবে চংড়ি খামারে পরিমিত পোনা মজুদ না করা, ইত্যাদি।

ঘ. চিংড়ি বিপণনগত সমস্যা: আমাদের দেশে এখনও চিংড়ি সম্পদ বিপণনের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি বললেই চলে। মূলত চিংড়ি উৎপাদনকারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা, সংরক্ষণ সুযোগ-সুবিধা ও মধ্য-সুবিধাভোগীদের (ফড়িয়া, আড়তদার, বেপারী) উপর ভিত্তি করে এ বাজার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে খুব কম।

পরিমাণ চিংড়িই চিংড়ি উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে সরাসরি ক্রেতার হাতে পৌছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা ধারাবাহিক পর্যায়ের মাধ্যমে বাজারে আসে। বর্তমানে চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়ায় রপ্তানি একটি প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা হিসেবে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশও ইতোমধ্যে বিশ্ববাজারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। কিন্তু বিশ্ববাজারে বাংলাদেশকে টিকে থাকতে হলে সংশ্লিষ্ট সকল ক্রেতার চাহিদানুযায়ী চিংড়ির গুণগতমান উন্নতকরণের জন্য চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়াকে অধিকতর কার্যক্ষম করা একান্ত অপরিহার্য। এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপসমূহের মধ্যে বিরাজমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা প্রয়োজন এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে চিংড়ি বিপণন নীতিমালা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

চিংড়ি চাষ উন্নয়ন সমস্যা সমাধানের জন্য কতিপয় সুপারিশ

আমাদের দেশে চিংড়ি চাষ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও উৎপাদন উপকরণসমূহের অপ্রতুলতাসহ বিভিন্ন কারণে বাধাগ্রস্ত হলেও চিংড়ি চাষ উন্নয়ন সম্ভাবনাকে ফলপ্রসূ করার জন্য কতিপয় সুপারিশ নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক) স্থিতিশীলভাবে চিংড়ি উৎপাদনের লক্ষ্যে আধানিবিড় পদ্ধতিতে খামারে প্রতি বর্গমিটারে ১৫ টির অধিক বাগদা এবং ৮ টির অধিক গলদা চিংড়ির পোনা মজুদ করা উচিত নয়।

খ) প্রতিটি ফসল তোলার পর বা চিংড়ি আহরণের পর চিংড়ির রোগ প্রতিরোধের জন্য বাগদা ও গলদা চিংড়ির খামারের তলদেশে সঞ্চিত কালোমাটি বা বর্জ্য পদার্থ তুলে ফেলে পরবর্তী চাষের পুর্বে লাঙল দিয়ে চাষ দেয়া যেতে পারে।

গ) আধানিবিড় খামার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্যাডেল চালিত বায়ু সঞ্চালন যন্ত্রের ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হবে যাতে খামারের শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ এলাকা পরিষ্কার করা যায় এবং অক্সিজেনজনিত সমস্যা না হয়।

ঘ) খামার পানির পিএইচ ৭.৫ থেকে ৮.৫ এর মধ্যে রাখা উচিত এবং প্রতিদিন পানির পিএইচ-এর পরিবর্তন বা উঠানামা ০.৪ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও হাইড্রোঅক্সাইডের পরিবর্তে ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং ক্যালসিয়াম-ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট ব্যবহার করা যেতে পারে। চুন প্রয়োগের পূর্বে অবশ্যই পানি এবং মাটির পিএইচ পরিমাপ করতে হবে।

ঙ) চিংড়ি পোনা সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হ্যাচারি স্থাপন কার্যক্রমকে অধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন এবংএ প্রেক্ষাপটে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরাহাট এলাকায় বাগদা চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করাসহ হ্যাচারি মালিকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

চ) উৎপাদনকারীদের নিকট প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন- খাবার, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট, চা বীজের খৈল ও রোটেননসহ অন্যান্য জীবাণুনাশকের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

ছ) চিংড়ি উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট বায়ু সঞ্চালন যন্ত্র, পাম্প এবং খামারের অন্যান্য উপকরণ উৎপাদনের জন্য সরকারি পর্যায় থেকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

জ) মাঠ পর্যায়ে চিংড়ি চাষিসহ বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

২০২২

ঝ) চিংড়ি চাষের বর্তমান সমস্যা ও তার সমাধানকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল সুফলভোগীদের সমন্বয়ে নিয়মিতভাবে । আলোচনা সভা/কর্মশালা/সেমিনার-এর আয়োজন করা যেতে পারে ।

ঞ) চিংড়ি চাষের সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্ভূত সমস্যার আশু সমাধানকল্পে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে প্রাপ্ত ফলাফল দ্রুত কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে ।

ট) আধানিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি খামার স্থাপনের ক্ষেত্রে অভীষ্ট এলাকার কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে ।

ঠ) চিংড়ি খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষাকারী স্বাদু পানির শামুক ও ঝিনুকের অনিয়ন্ত্রিত আহরণ বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে ।

ড) বাগদা চিংড়ির পোনা আহরণের সময় যাতে অন্যান্য মাছের বা প্রাণীর পোনা নষ্ট না হয়, সেজন্য চিংড়ির পোনা আহরণকারীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এবং চিংড়ির পোনা আহরণকারীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে । তাছাড়া উপকূলীয় এলাকায় অধিক স্থায়িত্বশীল সমন্বিত চিংড়ি চাষের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা যেতে পারে ।

ট) অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষ সমপ্রসারণ বন্ধ ও উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান রক্ষা করার লক্ষ্যে সকল চিংড়ি খামার, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, ইত্যাদিকে মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে নিবন্ধনের আওতায় আনতে হবে । তাছাড়া সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে ।

ণ) চিংড়ি চাষের দ্রুত সম্প্রসারণ ও স্থায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে আগ্রহী চাষিদের নিকট সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে ।

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের আয়তন কত?
২. বাংলাদেশের সামুদ্রিক এলাকায় কয়টি প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়?
৩. বাগাচামা চিংড়ি সাগরের কত গভীরতায় পাওয়া যায়?
৪. বাংলাদেশের কোথায় হন্নি চিংড়ি পাওয়া যায়?
৫. বাংলাদেশের কোথায় ডিমুয়া চিংড়ি পাওয়া যায় ?
৬. বাংলাদেশে বর্তমানে মোট আহরিত চিংড়ির পরিমাণ কত?
৭. উপকূলীয় এলাকার শতকরা কত ভাগ মহিলা পোনা ধরে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে?
৮. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে একই জমিতে লবণ ও চিংড়ি চাষ হয়ে থাকে?
৯. বাংলাদেশে সাধারণত কোন সময়ে চিংড়ি চাষের জমিতে লবণ উৎপাদন করা হয়?
১০. বাংলাদেশে চাষযোগ্য উপকূলীয় এলাকার কতভাগ এলাকায় বর্তমানে চিংড়ি চাষ হচ্ছে?
১১. বাংলাদেশে বর্তমানে চিংড়ির গড় উৎপাদন কত?
১২. বাংলাদেশে বর্তমানে মোট মাছের উৎপাদন কত?

২০২৫

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. হরিণা চিংড়ি পৃথিবীর কোন কোন দেশে পাওয়া যায়?

২. অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন ৫ টি চিংড়ির বৈজ্ঞানিক নাম লেখ ।

৩. চিংড়ি চাষের জমিতে ধানের উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণগুলো উল্লেখ কর ।

৪. চিংড়ি চাষ এলাকার প্রধান সামাজিক সমস্যাগুলো কি?

৫. পরিবেশের উপর চিংড়ি চাষের প্রতিক্রিয়া কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে চিংড়ি সম্পদের গুরুত্ব বর্ণনা কর ।

২. বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সমস্যা বর্ণনা কর ।

৩. বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে সামাজিক সমস্যা বর্ণনা কর ।

৪. বাংলাদেশে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাজারজাতকরণ সমস্যা বর্ণনা কর ।

৫. বাংলাদেশে চিংড়ি চাষ উন্নয়নে বিরাজমান সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানগুলো বর্ণনা কর ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাগদা চিংড়ির জীববিদ্যা

বাগদা চিংড়ির বহিঃঅঙ্গসংস্থান গলদা চিংড়ির অনুরূপ। তবে বাগদা চিংড়ির প্রথম ৩টি এবং গলদা চিংড়ির প্রথম ২টি বক্ষ যষ্ঠ উপাঙ্গ চিমটে রূপান্তরিত হয় এবং গলদা চিংড়ির বহিঃকঙ্কালের ২য় উদর খণ্ডকের প্লিউরার মত বাগদা চিংড়ির ২য় উদর খণ্ডকের প্লিউরা ১ম ও ৩য় উদর খণ্ডকের প্লিউরাকে আবৃত করে না। তাছাড়া গলদা চিংড়ির তুলনায় বাগদা চিংড়ির শিরোবক্ষ অঞ্চল তুলনামূলকভাবে উদর অঞ্চলের চেয়ে ছোট।

বাগদা চিংড়ি সাগর, উপকূলীয় অঞ্চল ও নদী মোহনা অঞ্চলের লোনা ও ঈষৎ লোনা পানিতে বাস করে, যেখানে বিস্তৃত হলেও জোয়ার-ভাটার প্রভাব আছে। লোনা পানির বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ির মধ্যে বাগদা চিংড়িই সমগ্র বিশ্বে বাণিজ্যিকভাবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও বাংলাদেশে এই চিংড়ি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। ভৌগলিকভাবে বাগদা চিংড়ির আবাসস্থল মূলত ৩০° পূর্ব থেকে ১৫৫° পূর্ব দ্রাঘিমা এবং ৩৫° উত্তর থেকে ৩৫° দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

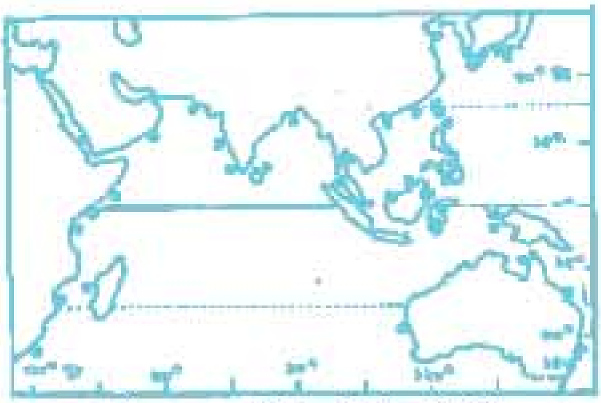

চিত্রঃ বাগদা চিংড়ির ভৌগলিক বিস্তৃতি

বাংলাদেশের উপকূলীয় ও মোহনা অঞ্চল, বাগেরহাটের উর্ধ্ব মোহনা ও চালনা মোহনা, খুলনার পশুর নদীর মুখে শিব মোহনা, পটুয়াখালীর রাঙাবালি ও খেপুপাড়া মোহনা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও বঙ্গোপসাগর সহ ভোলা জেলার লিস উপজেলা সংলগ্ন মেঘনা নদী ও কুতুবদিয়ার নদী মোহনা এলাকায় বাগদা চিংড়ি পাওয়া যায়। সাধারণত বাগদা চিংড়ি নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত সাগরের ১০ থেকে ২০ ফ্যাদম (১ ফ্যাদম= ৬ ফুট) গভীরতায়, ৩২.৫ থেকে ৩৩.০ পিপিটি লবণাক্ততায় এবং ২৮০ থেকে ৩০ সে তাপমাত্রায় পিচ্ছিল পরিবাহের চিংড়ির ডিমের পরিস্ফুটন ঘটে থাকে। জোয়ারের টানে এবং ঢেউয়ের সাথে সাথে পোস্ট লার্ভা অবস্থায় এই চিংড়ি মোহনা অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জলাশয়ে এরা পূর্ণতা লাভ করে থাকে।

চিংড়ি শনাক্তকরণ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেমন- জাপান, আমেরিকা, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে চিংড়ির সিস্টেমেটিক শ্রেণিবিন্যাসের উপর ব্যাপক কাজ হয়েছে এবং নতুন নতুন চিংড়ি প্রজাতি শনাক্তকরণের কাজ এগিয়ে চলেছে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, বাংলাদেশে চিংড়ি সিস্টেমেটিক শ্রেণিবিন্যাসের উপর গবেষণা শুরু হয় ১৯৫৭ সালে। বাংলাদেশে মিঠা পানিতে ২৪টি ও লোনা পানিতে ৩৬টিসহ মোট ৬০ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া গেলেও সারা বিশ্বে ৩৫১ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায় বলে প্রাপ্ত তথ্যে প্রতীয়মান হয়। মিঠা পানির চিংড়ি বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ জলাশয় যেমন- পুকুর-ডোবা, দিঘী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ও নদীতে এবং লোনা পানির চিংড়ি খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও কক্সবাজার জেলার সাগরের লোনা পানি ও উপকূলীয় অঞ্চলের ঈষৎ লবণাক্ত পানিতে পাওয়া যায়।

চিংড়ির বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য, অভ্যন্তরীণ অঙ্গের বৈশিষ্ট্য, স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য, খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাসের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি শনাক্ত করা হয়।

চিংড়ির শ্রেণিবিন্যাস

সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রাণিকে একটি স্বাভাবিক নিয়মে কতকগুলো স্তরে সাজানোরে এক নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকে শ্রেণিবিন্যাস বলে। চিংড়ির শ্রেণিবিন্যাসের ফলে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি শনাক্তকরণ, প্রজাতি বিন্যস্তকরণ ও অন্যান্য প্রাণীর সাথে জাতিগত সম্পর্ক নিরূপণ করা যায়। চিংড়ির প্রজাতিগুলোকে সাধারণত দুভাবে ভাগ করা যায়, যথা- পিনাইড (Penaeid) ও পিনাইড বহির্ভূত (Non-pernaeid)। এই দুদলভুক্ত চিংড়িকে সহজেই শনাক্ত করা যায়। পিনাইড বহির্ভূত চিংড়ির বহিঃকঙ্কাল-এর ২য় প্লিউরা ১ম ও ৩য় বিউরাকে আংশিক ঢেকে রাখে। কিন্তু পিনাইড দলভুক্ত চিংড়িতে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। তাছাড়া পিনাইড চিংড়ির ১ম তিনটি বক্ষ উপাঙ্গ এবং পিনাইড বহির্ভূত চিংড়ির ১ম দুইটি বক্ষ উপাঙ্গা চিলেটে রূপান্তরিত হয়। পিনাইড পুরুষ চিংড়িতে জননাঙ্গ পেটাসমা এবং স্ত্রী চিংড়িতে জননাঙ্গ থেলিকাম বিদ্যমান থাকে। পিনাইড বহির্ভূত স্ত্রী চিংড়িগুলো গুচ্ছাকারে ডিমগুলো প্লিওপডদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বহন করে থাকে কিন্তু স্ত্রী পিনাইড চিংড়ি ডিম সরাসরি পানিতে ছাড়ে।

চিংড়ি আর্থোপোডা পর্বের ক্রাস্টেসিয়া শ্রেণির ডেকাপোডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। এই বর্গের কিছু চিংড়ি মিঠা পানিতে এবং কিছু চিংড়ি লোনা পানিতে বাস করে। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ চিংড়িকে সাধারণত পিনাইডি, পেলিমনিডি, প্যানডেলিডি, হিপোলিটিডি, এলফিডি ও সারগেস্টিডি এই ৬টি গোত্রে ভাগ করা যায়।

বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাগদা ও গলদা চিংড়ির শ্রেণিবিন্যাস হলো

পর্ব (Phylum): আর্থোপোডা (Arthropoda)

শ্রেণি (Class): ক্রাস্টেসিয়া (Crustacea) বর্গ

(Order): ১. পিনাইডি (Penaeidae)

২. পেলিমনিডি (Palaemonidae)

গন (Genus): ১. পিনিয়াস (Penaeus)

২. ম্যাক্রোবেকিয়াম (Macrobrachium)

প্রজাতি (Species): ১. বাগদা (Penaeus monodon)।

২. গলদা (Macrobrachium rosenbergii)

মিঠা ও লোনা পানির অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন কয়েকটি চিংড়ির স্থানীয় ও বৈজ্ঞানিক নাম নিচে দেওয়া হলো:

স্থানীয়/বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
গলদা চিংড়ি, বড় ইচা, গলদা ইচা	Fresh water giant prawn	*Macrobrachium rosenbergii*
ছটকা চিংড়ি, ছোট গলদা, বঁটি গলদা	Monsoon river prawn	*Macrobrachium malcolmsonii*
ডিমুয়া চিংড়ি, কাঠালিয়া ইচা	Dimua river prawn	*Macrobrachium villosimanus*
শুল চিংড়ি, ঠেঙ্গুয়া চিংড়ি, নজরী ইচা	Birma river prawn	*Macrobrachium birmanicus*
গোদা চিংড়ি, পাইটা চিংড়ি	Fresh water giant prawn	*Macrobrachium rude*
গেদা চিংড়ি, ব্রাম্মনী চিংড়ি	Fresh water giant prawn	*Macrobrachium dolichodactylus*
লটিয়া চিংড়ি, লইটা ইচা	Shortleg river prawn	*Macrobrachium mirabile*
কুঞ্চ চিংড়ি, গুড়া ইচা,	Kuncho river prawn	*Macrobrachium lamarrei*
বাগদা চিংড়ি, বাগদা ইচা	Giant/Jumbo tiger prawn	*Penaeus monodon*
চাকা চিংড়ি, চাপদা চিংড়ি, চামা চিংড়ি, সাদা ইচা	Indian white shrimp	*Penaeus indicus*
বাগতারা চিংড়ি, হেড়ে বাগদা	Green tiger prawn	*Penaeus semisulcatus*
ডারোকাটা চিংড়ি, খুরমা চিংড়ি, জাপানি চিংড়ি	Kuruma prawn	*Penaeus japonicus*
চাপদা চিংড়ি, বড় চামা চিংড়ি	White shrimp	*Penaeus orientalis*
বাগা চামা চিংড়ি, কোরা চিংড়ি	Banana shrimp	*Penaeus merguiensis*
লাল চামা ইচা, চামা ইচা	Red tail prawn	*Penaeus penicillatus*
হরিণা চিংড়ি, খরখরিয়া চিংড়ি	Pickles/ Ginger shrimp	*Metapenaeus monoceros*
হন্নি চিংড়ি, সাগা চিংড়ি	Yellow shrimp	*Metapenaeus brevicornis*
লানো চিংড়ি, গোসা চিংড়ি	Kadal shrimp	Metapenaeus dobsonii
লালিয়া চিংড়ি	Brown shrimp	*Metapenaeus spinulatus*
কেরাণী চিংড়ি	Indian brown shrimp/ Pink / Ginga shrimp	Metapenaeus affinis shrimp
কুচো চিংড়ি	Bird shrimp	*Metapenaeus lysianassa*

গলদা ও বাগদা চিংড়ির শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

গলদা চিংড়ি	বাগদা চিংড়ি
বহিঃকঙ্কালের দ্বিতীয় উদর খণ্ডকের পিউরা ১ম ও ৩য় উদর খণ্ডকের পিউরাকে আংশিক আবৃত করে।	বহিঃকঙ্কালের দ্বিতীয় উদর খণ্ডকের পিউরা শুধুমাত্র ৩য় উদর খণ্ডকের পিউরাকে আংশিক আবৃত করে।
১ম দুইটি বক্ষ উপাঙ্গ চিলেটে রূপান্তরিত হয় এবং ২য় চিলেট উপাঙ্গটি তুলনামূলকভাবে বড় হয়	১ম তিনটি বক্ষ উপাঙ্গ চিলেটে রূপান্তরিত হয়।
শুক্রকীট স্থানান্তরের জন্য পুংজননাঙ্গ পেটাসমা বা স্ত্রী জননাঙ্গ থেলিকাম থাকে না	শুক্রকীট স্থানান্তরের জন্য পুংজননাঙ্গ পেটাসমা বা স্ত্রী জননাঙ্গ থেলিকাম থাকে
স্ত্রী চিংড়ি ডিমগুলো গুচ্ছাকারে পিপডগুলোর মাঝখানে বহন করে	স্ত্রী চিংড়ি পিওপডে ডিম বহন করে না বরং সরাসরি পানিতে ছাড়ে।
মাথা দেহের ওজনের প্রায় অর্ধেক	মাথা দেহের ওজনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ।
রাস্ট্রোমের নিচাংশে দাঁতের সংখ্যা বেশি।	রাস্ট্রোমের নিচাংশে দাঁতের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।
এদের আবাসস্থল মিঠা পানিতে, তবে প্রজননের সময় কিছু প্রজাতি ঈষৎ লবণাক্ত পানিতে চলে আসে।	এদের আবাসস্থল সমুদ্রে এবং ঈষৎ লবণাক্ত পানিতে। প্রজননের সময় অধিকাংশ প্রজাতি সমুদ্রের লোনা পানিতে চলে যায় এবং লার্ভা অবস্থায় উপকূলীয় পানিতে চলে আসে।
স্ত্রী গলদার চেয়ে পুরুষ গলদা আকারে বড় ও ওজনে বেশি হয়।	পুরুষের চেয়ে স্ত্রী বাগদা আকারে বড় হয় ও বেশি হয়।
গলদা চিংড়ি মেরুদণ্ড-হীন মিঠা পানির বড় চিংড়ি	বাগদা চিংড়ি মেরুদণ্ড-হীন লোনা পানির বড় চিংড়ি।

বাগদা চিংড়ির বাহ্যিক গঠন

এদের দেহ দ্বিপার্শ্বীয়, লম্বাকৃতি, প্রতিসম ও খণ্ডিত। দেহ মস্তক ও উদরে বিভক্ত। চিংড়ির মাথাকে দেহ থেকে আলাদা করা যায় না বলে মাথা ও বুককে একসঙ্গে বলা হয় শিরোবক্ষ বা সেফালোথোরাক্স (Cephalothorax)।

উদর (Abdomen) ক্রমান্বয়ে পিছনের দিকে সরু হয়ে লেজ (Telson)-এর সাথে মিশেছে। শিরোবক্ষে ১৩টি ও উদরে ৬টি উপাঙ্গ আছে। চিংড়ির দেহ কাইটিন নামক খোলস দিয়ে আবৃত, যা ক্যালসিয়াম উপাদান দিয়ে গঠিত। মস্তকের সম্মুখভাগে করাতের ন্যায় কাইটিন আবরণকে রোস্ট্রাম (Rostrum) বলে।

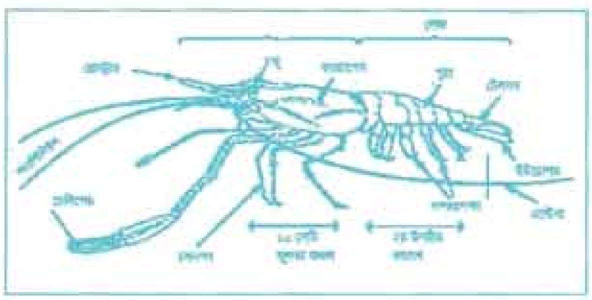

চিত্রঃ বাগদা চিংড়ির বাহ্যিক গঠন।

চিংড়ির খোলস দেহের প্রতিটি অংশকে ঘিরে রাখে এবং একটি খোলস অপর খোলসের সাথে সন্ধিস পর্দা (Arthrodial membrane) দিয়ে সংযোগ রক্ষা করে, যার ফলে খোসাগুলো সহজে নড়াচড়া এবং প্রয়োজনে লম্বা হয়ে যেতে পারে।

১. রোস্ট্রাম	২. রাস্ট্রোল কাটা	৩. পোস্ট অর্বিটাল কাটা	৪. হেপাটিক কাটা
৫. কেরাপাস	৬. প্রথম উদর উপাঙ্গ	৭. ষষ্ঠ উদর উপাঙ্গ	৮. টেলসন
৯. ইউরোপডড	১০. পিওপড়	১১. পঞ্চম পেরিওপড	১২. প্রথম পেরিওপড
১৩. এন্টেনা	১৪. এ্যান্টেনাল কাটা	১৫. এন্টেনাল বেন্ড	১৬. এ্যান্টেনাল ফাজেলা

চিত্রঃ বাগদা চিংড়ির বহিরাকৃতি

বাগদা চিংড়ির অভ্যন্তরীণ গঠন ও অঙ্গসমূহ

দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্রের কার্যকারিতার ফলে বাগদা চিংড়ি জীবন ধারণ করে থাকে। বাগদা চিংড়ির অভ্যন্তরীণ অঙ্গসংস্থান প্রধানত পরিপাকতন্ত্র,রেচনতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, রক্ত সংবহনতন্ত্র ও প্রজননতন্ত্র নিয়ে গঠিত।

ক.পরিপাকতন্ত্র

বাগদা চিংড়ি সর্বভুক ও নিশাচর প্রাণী। এরা সাধারণত রাতের বেলায় খাদ্য গ্রহণ করে। দিনের বেলায় কাদার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। বাগদা চিংড়ি চিমটাযুক্ত পা দিয়ে খাদ্যকণা মুখের ভিতরে নিক্ষেপ করে। অতঃপর খাদ্যকণা ম্যাক্সিলিপেডের দিকে অগ্রসর হয় এবং মুখের অভ্যন্তরের বিভিন্ন উপাঙ্গের সাহায্যে খাদ্যকণা আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাতে পরিণত হয়ে খাদ্যনালিতে প্রবেশ করে। বাগদা চিংড়ির পরিপাকতন্ত্র মূলত পরিপাকনালি ও হেপাটোপ্যানক্রিয়াস গ্রন্থি সমন্বয়ে গঠিত। পরিপাকনালি মুখগহ্বর থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত।

চিত্রঃ বাগদা চিংড়ির পরিপাকতন্ত্র

১. অন্ননালী	২. পাকস্থলী	৩. হেপাটোপ্যানক্রিয়াস	৪. হেপাটিক ডাক্টের ছিদ্র
৫. পরিপাক নালি	(ক, অগ্র পরিপাক নালি	খ. মধ্য পরিপাক নালি ও	গ. পশ্চাৎ পরিপাক নালি)।

অগ্র পরিপাকনালি ও পশ্চাৎ পরিপাকনালি থেকে সহজেই মধ্য পরিপাকনালিকে আলাদা করা যায়। কারণ অগ্র ও পশ্চাৎ পরিপাকনালিতে কাইটিনের সারি বিদ্যমান কিন্তু মধ্য পরিপাকনালিতে এ ধরনের কোন কাইটিন সারি থাকে না।

খ. রেচনতন্ত্র

অধিকাংশ প্রাণির ক্ষেত্রে রেচনতন্ত্রের মাধ্যমে প্রধানত দুটি কাজ সম্পাদন হয়ে থাকে। প্রথমত রেচনতন্ত্র বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত বর্জ্য পদার্থ বা দূষিত পদার্থ দেহ থেকে নিষ্কাশন করে থাকে এবং দ্বিতীয়ত দেহ অভ্যন্তরস্থ লবণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। চিংড়ির ক্ষেত্রে প্রধান নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ হচ্ছে অ্যামোনিয়া। প্রস্রাব হিসেবে এই অ্যামোনিয়া ম্যাক্সিলারি গ্রন্থির মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত হয়। এই গ্রন্থিটি ম্যাক্সিলার গোড়ায় অবস্থিত। বাগদা চিংড়ির এই অঙ্গটি তেমন একটা উন্নত নয় এবং কিছু কিছু অ্যামোনিয়া বা নাইট্রোজেনঘটিত দূষিত পদার্থ ফুলকার সাহায্যে নির্গত হয়। বাগদা চিংড়ির ক্ষেত্রে ম্যাক্সিলারি গ্রন্থি অসমোরেগুলেশন প্রক্রিয়ায় তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না। ক্রাস্টেসিয়ার অন্তর্গত অধিকাংশ প্রাণী যে বর্জ্য পদার্থ উৎপাদন করে থাকে তার ঘনত্ব ও রক্তের ঘনত্ব একই থাকে। তথাপি এই গ্রন্থি পটাসিয়াম এবং ক্যালসিয়াম সংরক্ষণে সম্পৃক্ত থাকে এবং অতিরিক্ত ম্যাগনেসিয়াম সালফেট নির্গমনে সহায়তা করে। সাধারণত চিংড়ির ক্ষেত্রে লবণের ভারসাম্য রক্ষার জন্য ফুলকা-ই এর প্রধান অঙ্গ। যে সকল প্রাণীর রক্তের লবণের ঘনত্ব এবং এদের চতুর্পার্শ্বের পানির লবণের ঘনত্ব বিভিন্ন রকম তাদেরকে অসমোরেগুলেটর বলা হয় এবং যাদের ঘনত্ব একই রকম তাদেরকে অসমোকনফরমারস বলে।

গ. শ্বসনতন্ত্র

চিংড়ির শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে ফুলকা। এই ফুলকার সাহায্যে চিংড়ি অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে থাকে। পেরিওপডের কক্সা থেকে থলের ন্যায় এই ফুলকার উৎপত্তি হয় অর্থাৎ এপিপোডাইটের উন্নত অবস্থাই ফুলকা হিসেবে পরিচিত। বক্ষের উভয় পার্শ্বের ব্রাঙ্কিওল প্রকোষ্ঠের সাথে ফুলকা সংযুক্ত থাকে। ব্রাঙ্কিওল প্রকোষ্ঠে পানি প্রবাহিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অঙ্গ আছে কিন্তু মূলত ক্যাফোগন্যাথাইটের সাহায্যে এই কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে। ম্যাক্সিলার এক্সোপোডকেই ক্যাফোগনাইট বলা হয়। এবং এই ক্যাফোগনাইট পানিকে প্রকোষ্ঠে প্রবাহিত করে থাকে। চিংড়ির রক্তের শ্বাস রঞ্জককে হেমোসায়ানিন বলে। চিংড়ির রক্ত সাদা বা বর্ণহীন হয়ে থাকে। তবে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত দেখতে কিছুটা নীলাভ

ঘ. স্নায়ুতন্ত্র

চিংড়ির স্নায়ুতন্ত্র যথেষ্ট উন্নত। বিভিন্ন স্নায়ু অঙ্গ এবং উপাঙ্গের সাথে সেরিব্রাল গ্যাংলিয়ন সংযুক্ত থাকে। চক্ষু স্ট্যাটোসিস্টস, প্রাপ্রোওরিসিপ্টরস , ট্যাকটাইল রিসিপ্টর এবং কেমোরিসিপ্টরস চিংড়িরস্নায়ু অঙ্গ হিসেবে কাজ করে থাকে। চিংড়ির কন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে সুপ্রা-ইসোফেজিয়াল গ্যাংলিয়ন বা মস্তিষ্ক বলে। অগ্রবর্তী মস্তক উপাঙ্গের গোড়ার পশ্চাৎ দিকে কেন্দ্রীয়স্নায়ুতন্ত্র অবস্থিত। কেন্দ্রীয়স্নায়ুতন্ত্র ৩টি অংশে

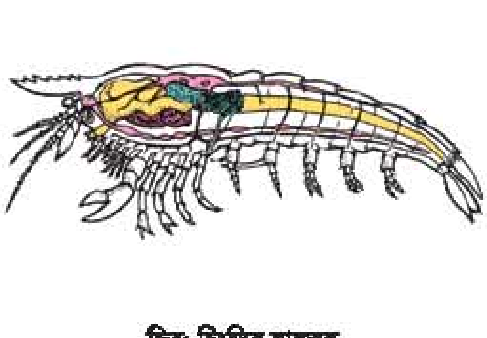

চিত্রঃ চিংড়ির স্নায়ুতন্ত্র

বিভক্ত, যথা- ১. অগ্রবর্তী প্রোটোসেরিব্রাম, ২. মধ্য ডিউটোসেরিব্রাম এবং ৩. পশ্চাৎবর্তী ট্রাইটোসেরিব্রাম।

১. সেরিব্রাল গ্যাংলিয়ন	২. অপটিকস্নায়ু	৩. অধঃ গ্যাংলিয়ন
৪. সারকাম ওসোফেজিয়াল কমিশার	৫. ওসোফেজিয়াল গ্যাংলিয়ন	৬. পেডাল স্নায়ু
৭. অঙ্কীয় গ্যাংলিয়ন	৮. সংবেদনস্নায়ু	৯. পৃষ্ঠ-পার্শ্বীয়স্নায়ু

চিত্র: বাগদা চিংড়ির স্নায়ুতন্ত্র

ঙ. রক্ত সংবহনতন্ত্র

চিংড়ির হৃৎপিণ্ড দেখতে অনেকটা সাধারণ থলির মত। হৃৎপিণ্ড-টি চিংড়ির বুকের পৃষ্ঠদেশীয় অঞ্চল বরাবর পরিপাকনালির উপরে এবং পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসের সাথে সংযুক্ত থাকে। চিংড়ির রক্ত সংবহনে প্রণালির প্রধান অঙ্গ অগ্রবর্তী একটা হৃৎপিণ্ড থেকে মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত। চিংড়িতে কোনো শিরা থাকে না। অনেকগুলো সাইনাসের মধ্য দিয়ে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। ধমনি এবং সাইনাসের জন্য রক্তকে পিছনের দিকে প্রবাহিত হতে বাধা দেয়। চিংড়ির রক্তে দু'ধরনের কোষ থাকে, যথা- ছোট হায়ালিন এবং বড় দানাদার গ্র্যানিউলোসাইট। মস্তক বক্ষ অঞ্চলের স্ট্রায়েটেড পেশী এবং অঙ্কীয়স্নায়ু কর্ডের মধ্যবর্তী অংশে সাইনাস অবস্থিত। প্রতিটি দেহ খণ্ডকের সাথে প্রত্যেকটি গ্যাংলিয়নকে সংযুক্ত দেখা যায়।

চ. প্রজননতন্ত্র

পুং জননতন্ত্র: সাধারণত একই বয়সের পুরুষ চিংড়ি, স্ত্রী চিংড়ি অপেক্ষা আকারে ছোট। পুরুষ চিংড়ির প্রথম জোড়া সন্তরণ পদে একজোড়া পেটাসমা এবং পঞ্চম জোড়া চলন পদের গোড়ায় এক জোড়া পুং জননেন্দ্রিয়ের ছিদ্র থাকে। চিংড়ির দ্বিতীয় পর্যায়ের বা গৌণ যৌনাঙ্গ সঙ্গমে সহায়তা করে। দ্বিতীয় সন্তরণ পদে এপেনডিক্স ম্যাসকুলিনা থাকে। পেটাসমা এবং এপেনডিক্স ম্যাসকুলিনা স্পার্মাটোফোর বা বীর্য স্থানান্তরে সহায়তা করে থাকে। চিংড়ির পুং জননতন্ত্র এক জোড়া টেস্টিস, ভাস ডিফারেন্সিয়া এবং এক জোড়া প্রান্তিক বীর্য থলে দ্বারা গঠিত। বীর্য থলে পুং জননেন্দ্রিয়ের ছিদ্র পথে বের হয়ে আসে। পেটাসমা স্ত্রী চিংড়ির থেলিকামে বীর্য থলে স্থানান্তরের কাজ করে থাকে।

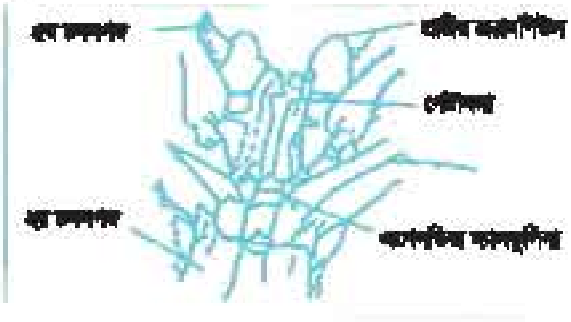

চিত্র: পুরুষ চিংড়ির জননেন্দ্রিয়ের বহিঃস্থ অংশ

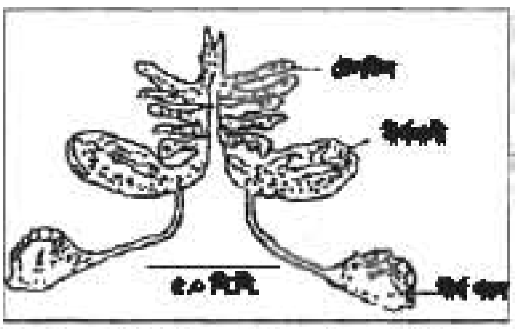

চিত্র: পুরুষ চিংড়ির জননেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরীণ অংশ

১. অণ্ডকোষ
২. ভাস ডিফারেন্সের অগ্র ও পশ্চাৎ অঞ্চল
৩. টার্মিনাল অ্যাম্পুল

চিত্রঃ বাগদা চিংড়ির পুং জননতন্ত্র

স্ত্রী প্রজননতন্ত্রঃ

স্ত্রী চিংড়ির জননেন্দ্রিয় একজোড়া ডিম্বাশয় ও ডিম্বনালির দ্বারা গঠিত। পরিপক্ক চিংড়ির ডিম্বাশয় লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। ডিম্বনালী তৃতীয় জোড়া চলন পদের গোড়ায় উন্মুক্ত হয়। স্ত্রী চিংড়ির ৪র্থ ও ৫ম জোড়া চলন পদের মধ্যবর্তী স্থানে থেলিকাম ও ৩য় জোড়া চলন পদের গোড়ায় এক জোড়া স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের ছিদ্র থাকে।

স্ত্রী চিংড়ি সঙ্গমকালে পুরুষ চিংড়ির বীর্য হলে থেলিকামের মধ্যে ধারণ করে রাখে এবং ডিম ছাড়ার সময় পানিতে এ বীর্য ছেড়ে দেয়। স্ত্রী চিংড়ির থেলিকামের রন্ধ্র বা ছিদ্র সাধারণ অবস্থায় বন্ধ থাকে। তবে খোলস বদলানোর পর খোসা শক্ত হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত এ ছিদ্র খোলা থাকে। তাই স্ত্রী চিংড়ি খোলস বদলানোর পর পরই পুরুষ চিংড়ির সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। পুরুষ চিংড়ি বদ্ধ জলাশয়ে পরিপক্কতা লাভ করে কিন্তু স্ত্রী চিংড়ি বদ্ধ জলাশয়ে পরিপক্কতা লাভ করে না।

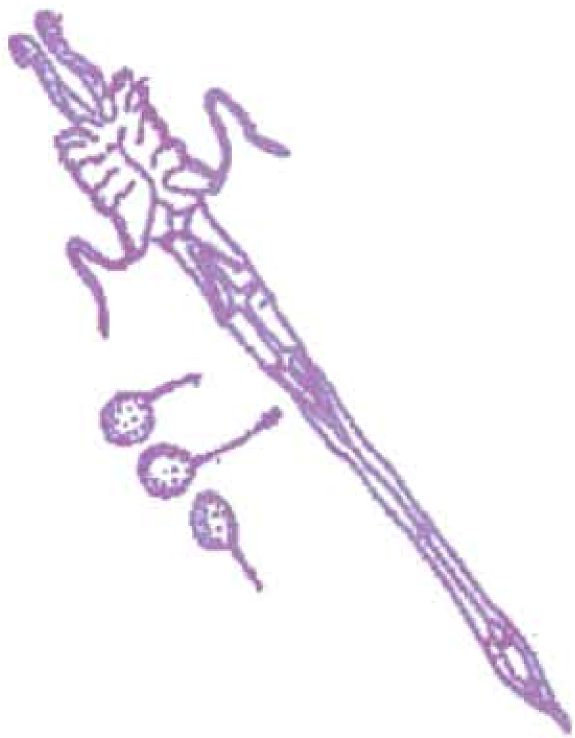

চিত্রঃ (ক) স্ত্রী চিংড়ির জননেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরীণ অংশ

২০২২

স্ত্রী চিংড়ির চোখের বাটোয় এক্স অঙ্গ ও সাইনাস গ্রন্থি থাকে। এক্স অঙ্গ ডিম্বাশয় পরিপক্বতা লাভ রোধের হরমোন উৎপাদন করে এবং সাইনাস গ্রন্থি তা মজুদ রাখে। প্রাকৃতিক পরিবেশে এই হরমোন উৎপাদিত হলেও পরিবেশগত কারণেই উৎপাদিত হরমোনের পরিমাণ কমে যায় এবং স্ত্রী চিংড়ি পরিপক্বতা লাভ করে। কিন্তু বদ্ধ জলাশয়ে উৎপাদিত হরমোন চিংড়ির শরীরেই থেকে যায় ফলে ডিম্বাশয় পরিপক্বতা লাভ করে না। তাই হ্যাচারিতে স্ত্রী চিংড়ির ডান অথবা বাম চোখের বাটো কেটে বা অন্য কোন পদ্ধতিতে উক্ত চোখের বাটোর কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দিলে হরমোন উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়। এবং ডিম্বাশয় পরিপক্বতা লাভ করে। স্ত্রী চিংড়ির চোখের বাটোর কার্যক্ষমতা নষ্ট করার পদ্ধতিকে Eye stalk ablation বলে।

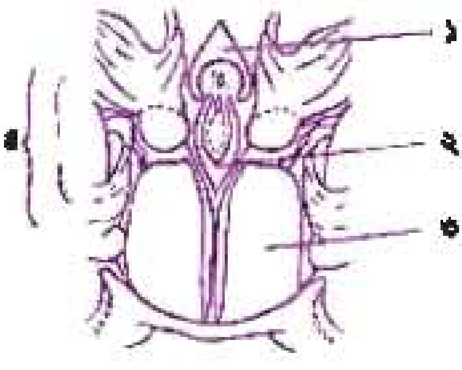

চিত্র: চিংড়ি জননেন্দ্রিয়ের বহিঃস্থ অংশ

বাগদা চিংড়ির জীবন-বৃত্তান্ত

গভীর সমুদ্র থেকে উপকূলীয় অঞ্চলের খাল বা বিল সংলগ্ন জলাশয় পর্যন্ত বাগদা চিংড়ির জীবনচক্র বিস্তৃত। বাগদা চিংড়ির জীবনের কিছু পর্যায় গভীর সমুদ্রে এবং কিছু পর্যায় লোনা অঞ্চলের নদীসমূহে সমাপ্ত হয়। বাগদা চিংড়ির জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো:

ক. ডিম

প্রাকৃতিক পরিবেশে স্ত্রী বাগদা চিংড়ি সাগরের ১৮-৩৬ মিটার গভীরতায় ডিম পাড়ে। ডিমগুলো আকারে খুব ছোট এবং এদের বর্ণ সবুজ হলুদাভ বা বাদামী বর্ণের হয়ে থাকে। ডিম পাড়ার কালেই অন্তর্দীপ্তিদ্বারা ডিমগুলো নিষিক্ত হয় এবং এই নিষিক্তকরণ চিংড়ির দেহের বাইরে ঘটে থাকে। ডিম ফোটার ঠিক আগে পরিণত নপ্লিয়াসকে ডিমের মধ্যে নড়াচড়া করতে দেখা যায়। ডিমের ভ্রূণ বিভাজন শুরু হয়। প্রথমে ২ কোষ, পরে ৪ কোষ, মরুলা এবং শেষে নপ্লিয়াস ধাপে পৌঁছায়। ডিম পাড়ার আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে নিষিক্ত ডিমের মধ্যে ভ্রূণ দেখা যায়। ২ কোষ, ৪ কোষ, মরুলা এবং শেষে নপ্লিয়াস ধাপে আসতে সময় লাগে যথাক্রমে প্রায় ০.৫, ১০, ১.৮ এবং ১১.০ ঘণ্টা।

ক. প্রথম নির্গমন ডিম
খ. চার কোষ ধাপ (নিষিক্ত হওয়ার ১ ঘণ্টা পর)
গ. মরুলা ধাপ (নিষিক্ত হওয়ার পর প্রায় ২ ঘণ্টা পর)
ঘ. ভ্রূণ পিণ্ডায়নের প্রাথমিক অবস্থা
ঙ. ভ্রূণ পিণ্ডায়নের পূর্ণাঙ্গ অবস্থা
চ.ডিম ফুটার আগে ভ্রূণ নপ্লিয়াসের অবস্থা

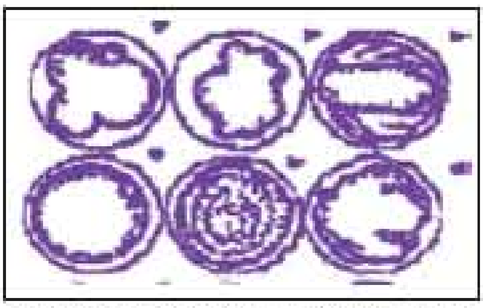
চিত্র: বাগদা চিংড়ির ডিমের পরিস্ফুটনের ধাপ

খ. লার্ভা

লার্ভা অবস্থার প্রথম দশাকে নাপ্লিয়াস বলে। এই নাপ্লিয়াস দশার ৬ টি অন্তর্দশা সম্পূর্ণ হতে মাত্র ৩৬ থেকে ৪৮ ঘন্টা সময় লাগে। পিয়াসের পরের দশাকে প্রটোজুইয়া বলে। এই দশার ৩টি অন্তর্দশা সম্পূর্ণ হতে ৫ দিন সময় লাগে। প্রটোস্যুইয়ার পরের দশাকে মাইসিস বলে। এই দশার ৩ টি অন্তর্দশা সম্পূর্ণ হতে ৪ থেকে ৫ দিন সময় লাগে। মাইসিস-এর পরবর্তী দশাকে মেগালোপা বলে। মেগালাপের ৩ থেকে ৪ টি অন্তর্দশা পরিলক্ষিত হয়। এই অন্তর্দশা সম্পূর্ণ হতে ৬ থেকে ১৫ দিন সময় লাগে। মেগালোপা পর্যায়ে দেহ স্বচ্ছ বর্ণের হয়ে থাকে এবং শুঙ্গের শুঙ্গের গোড়া থেকে টেলসনের প্রান্ত পর্যন্ত একটি গাঢ় বাদামী লম্বা টানা রেখার মত দাগ থাকে।

গ. জুভেনাইল (পোস্ট লার্ভা)

এই ধাপের প্রথম পর্যায়ে দেহ স্বচ্ছ বর্ণের হয়ে থাকে এবং অঙ্কীয় দেশে মেগালোপা ধাপের মত গাঢ় বাদামী দাগ থাকে। এই পর্যায়ের ধাপকে প্রাথমিক পর্যায়ে পোস্ট লার্ভা বলে এবং শেষ পর্যায়ের ধাপকে আলীপোনা বলা হয়। উদর খণ্ড শিরোবক্ষ খণ্ডের চেয়ে ছোট হয়। এই সময় দেহ, রোস্ট্রামের দাঁত ও ফুলকার আবির্ভাব ঘটে। শিরোবক্ষের খোলস ২.৭ মিমি লম্বা হলে এদের দেহ কালো বর্ণ ধারণ করে এবং খোলস ২.২-২১.০ মিমি লম্বা হলে রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৭টি এবং নিচে ৩টি দাঁত থাকে। এই পর্যায়ে চিংড়ি হামাগুড়ি ও সাঁতার দিতে শুরু করে।

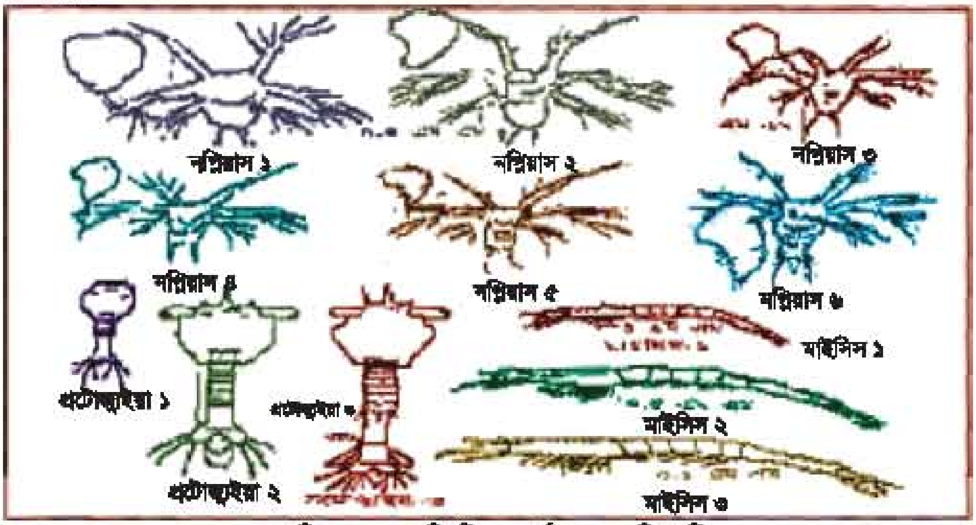

চিত্রঃ বাগদা চিংড়ির লার্ভার ক্রমবৃদ্ধির চিত্র

প্রথম ধাপ- নপ্লিয়াস ১-৬, দ্বিতীয় ধাপ- প্রটোজুইয়া ১-৩ এবং তৃতীয় ধাপ- মাইসিস ১-৩

ঘ. কিশোর চিংড়ি

এই পর্যায়ে চিংড়ির দেহের আকৃতি প্রায় পূর্ণাঙ্গ চিংড়ির মতো কিংবা কিছুটা বড় হয়। শিরোবক্ষের দৈর্ঘ্য ১১ মিমি হলে এদের জননেন্দ্রিয় শনাক্ত করা যায়। কিশোর চিংড়ির শিরোবক্ষের দৈর্ঘ্য ১১ থেকে ৩৪ মি.মি. পর্যন্ত হয়ে

থাকে। পুরুষ চিংড়ির শিরোবক্ষের দৈর্ঘ্য ৩০ মিমি হলে এরা পুরুষ জননাঙ্গ যুক্ত পেটাসমা ধারণ করে এবং স্ত্রী চিংড়ির শিরোবক্ষের দৈর্ঘ্য ৩৭ মিমি হলে স্ত্রী জননাঙ্গো থেলিকাম দেখা যায়।

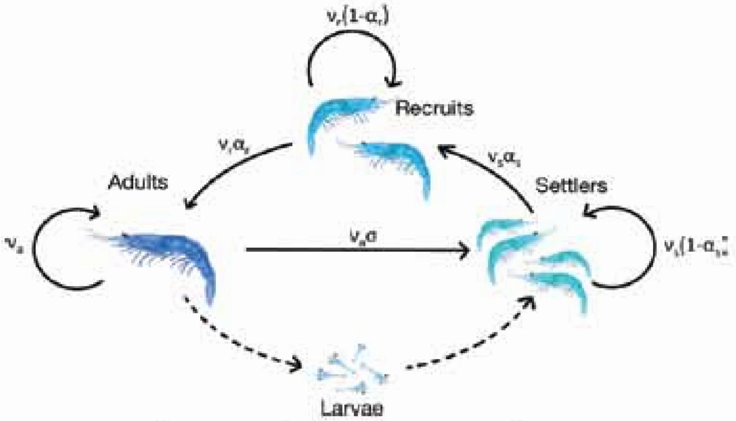

চিত্রঃ বাগদা চিংড়ির জীবন চক্রের বিভিন্ন ধাপ

ঘ. তরুণ চিংড়ি

চিংড়ি এই পর্যায়ে পরিপক্কতা লাভ করে। শিরোবক্ষের দৈর্ঘ্য ৩০ মিমি হলে পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়ির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে এবং এই পর্যায়ে স্ত্রী চিংড়ির আকার পুরুষ চিংড়ির চেয়ে বড় হয়ে থাকে। এই সময় তরুণ চিংড়ি মোহনা থেকে গভীর সমুদ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে। পুরুষ চিংড়ি ও স্ত্রী চিংড়ির শিরোবক্ষের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৩৭ মিমি ও ৪৭ মিমি এ পৌছালে এরা প্রথম যৌন মিলন ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। এই মিলনক্রিয়া সাধারণত সমুদ্রে যাওয়ার পূর্বে মোহনা অঞ্চলে সংঘটিত হয়ে থাকে।

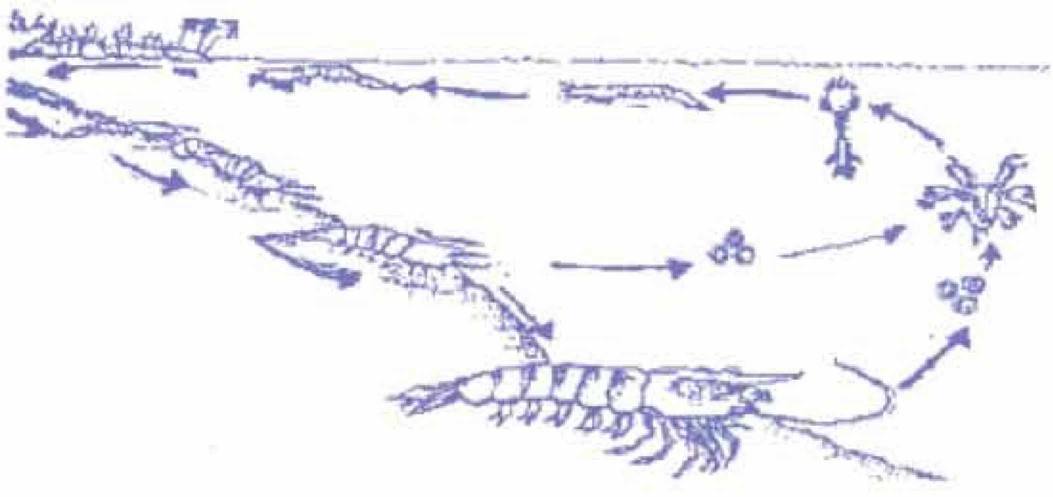

চিত্রঃ বিচরণ এলাকাভেদে বাগদা চিংড়ির জীবন চক্রের বিভিন্ন ধাপ

চ. পূর্ণাঙ্গ চিংড়ি

এই পর্যায়ে চিংড়ি যৌন পরিপক্কতা (Sexual maturity) লাভ করে। স্ত্রী চিংড়ি ডিম ছাড়ার জন্য সমুদ্রে চলে যায়। সমুদ্রের ১৬০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত এদের বিচরণক্ষেত্র। পরিপক্ক পুরুষ চিংড়ির পঞ্চম চলনপদের গোড়ায় পুংজনন ছিদ্রে শুক্রকীটের মোড়ক (Spermatophores) দেখা যায়। পরিপক্ক স্ত্রী চিংড়ির ডিম্বকোষের উন্নতি বাইরে থেকে দেখা যায়। স্ত্রী চিংড়ির ডিম্বাশয়ের আকার ও রং এবং ডিম্বাণুর মাপের ওপর নির্ভর করে ডিম্বাশয়ের পূর্ণতা। পরিপক্ক স্ত্রী চিংড়ির ডিম্বাশয়কে ৫টি দশায় ভাগ করা যায়, যথা

প্রথম দশা (Immature stage): এই অবস্থায় ডিম্বাশয় খুব পাতলা, স্বচ্ছ এবং পিঠের খোলসের ভিতর দিয়ে দেখা যায় না। এই সময় ডিম্বাণু খুব ছোট থাকে এবং ফলিকল সেল (Follicle cell)- এর স্তরে ঢাকা থাকে।

দ্বিতীয় দশা (Early developing stage): এই অবস্থায় ডিম্বাশয়ের কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ডিম্বাশয় ঢলঢলে এবং সাদা থেকে ফিকে জলপাই রঙের একটি লম্বা ফিতার মতো পৃষ্ঠদেশে খোলসের নিচে দেখা যায়।

তৃতীয় দশা (Nearly ripe stage): বর্ধিত ও হালকা নীল বর্ণের ডিম্বাশয় সহজেই দেখা যায়। এ সময় উদর অঞ্চলের ১ম ভাগে ডিম্বাশয়ের দুই পার্শ্ব একটু বেড়ে কিছুটা ডায়মন্ড বা প্রজাপতির আকার ধারণ করে।

চিত্র: স্ত্রী চিংড়ির ডিম্বাশয়ের পরিপক্কতার বিভিন্ন পর্যায়

চতুর্থ দশা (Ripe stage: গাঢ় সবুজ জলপাই রঙের পরিপক্ক ডিম্বাশয় পরিষ্কার দেখা যায়। এ সময় উদর অঞ্চলের ১ম ডিম্বাশয় পরিপূর্ণ ডায়মন্ড বা প্রজাপতির আকার ধারণ করে।

পঞ্চম দশা (Spent stage): এই অবস্থায় ডিম ছাড়ার পর ডিম্বাশয় প্রায় প্রথম দশার মতো দেখায়। তবে আংশিক ডিম ছাড়লে দ্বিতীয় দশার মতো দেখায়। একটি পরিপক্ক স্ত্রী চিংড়ি বছরে প্রায় ৩.০-৭.৭৫ লাখ ডিম ধারণ করে থাকে। বাগদা চিংড়ির প্রজনন গভীর সমুদ্রে ঘটে থাকে। এদের প্রজনন ক্রিয়া সাধারণত রাত্রি কালেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। বাগদা চিংড়ির মিলন কাল ৩ থেকে ৪ মিনিট স্থায়ী হয়। প্রথমে পুরুষ চিংড়ির উপর সমান্তরালভাবে স্ত্রী চিংড়ি অবস্থান গ্রহণ করে। এরপর পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়ি একে অপরকে অঙ্কীয় দেশে আকড়িয়ে ধরে এবং পুরুষ চিংড়ি স্ত্রী চিংড়ির দেহের নিচে সমান্তরাল ভাবে অবস্থান করে। অবশেষে পুরুষ চিংড়ি দেহের উদরের অংশে বাঁকিয়ে স্ত্রী চিংড়ির দেহের মাঝখানে 'ট' আকৃতির বেষ্টনী তৈরি করে।

(ক) প্রথম ধাপ   খ) দ্বিতীয় ধাপ   (গ+ঘ) তৃতীয় ধাপ   ঙ) স্পনিং

চিত্র: বাগদা চিংড়ির সঙ্গম ক্রিয়া

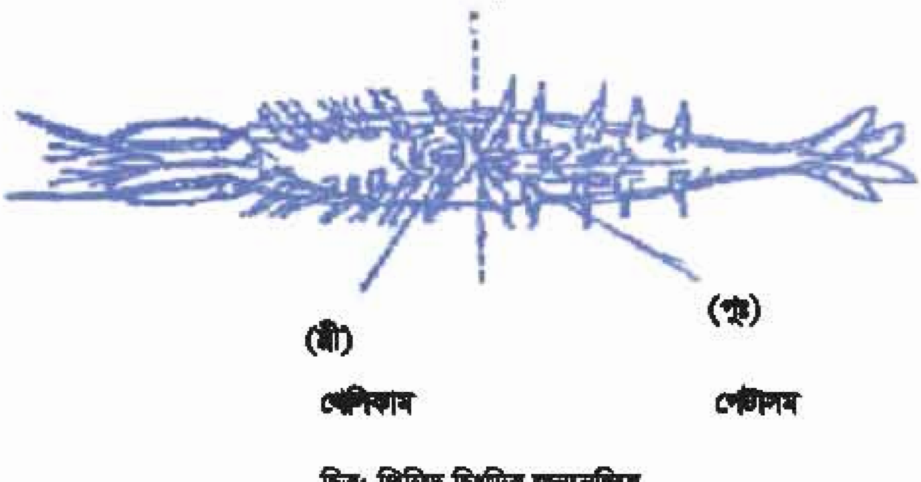

চিত্র: পিনিড চিংড়ির জননেন্দ্রিয়

বাগদা চিংড়ির জীবন চক্রের বিভিন্ন ধাপসমূহ নিচের সারণিতে দেখানো হলো:

সারণি: বাগদা চিংড়ির জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপের বৈশিষ্ট্যসমূহ

পর্যায়	শুরু হয়	সময়কাল	শিরোবক্ষ খোলসের দৈর্ঘ্য (মিমি) পুরুষ	শিরোবক্ষ খোলসের দৈর্ঘ্য (মিমি) স্ত্রী	খাদ্যাভ্যাস	আবাসস্থল
ডিম (ভ্রূ ণ)	নিষিক্তকরণ	১২ ঘন্টা	-	০.২৯	-	সাগরের তলদেশ
লার্ভা	ডিম থেকে ফোটা	২০ দিন	-	০.৫-২.২	পঙ্কটনিক	সাগরের তলদেশ
জুভেনাইল	ফুলকা অঙ্গের পূর্ণাঙ্গতা	১৫দিন	-	২.২-১১	বেনথিক	মোহনা
কিশোর চিংড়ি	জননেন্দ্রিয়ের উপস্থিতি	৪ মাস	১১.৩	১১.৩৭	বেনথিক	মোহনা
তোরুন চিংড়ি	জননেন্দ্রিয়ের পূর্ণতা এবং প্রথম সঙ্গম	৪ মাস	৩০.৩৭	৩৭.৪৭	বেনথিক	অভ্যন্তরীণ ও বাইরের লিটোরাল এলাকা
পূর্ণাঙ্গ চিংড়ি	দেহের সব অঙ্গের উপস্থিতি ও পূর্ণাঙ্গ বৃদ্ধি	১০মাস	৩৭.৭১	৪৭.৮১	বেনথিক	বাইরের লিটোরাল এলাকা

বাগদা চিংড়ির জীবদ্দশায় বিভিন্ন ধাপে খাদ্যাভ্যাস নিচে উল্লেখ করা হলো:

ধাপ	খাদ্য
ডিম থেকে নপিয়াস পর্যন্ত ৬ টি ধাপ	দেহে সঞ্চিত কুসুম থলি থেকে খাদ্য যাগোয়
জুইয়া	ডায়াটম জাতীয় উদ্ভিদ কণা, কেলেটোনমা, নিটসিয়া, কিটোরাসে ইত্যাদি খাদ্য
মাইসিস	রটিফার, কপিপড, আর্টিমিয়া ও উদ্ভিদ কণা জাতীয় খাদ্য
পাস্টে লার্ভা	রটিফার, কপিপড, আর্টিমিয়া ও উদ্ভিদ কণা জাতীয় খাদ্য
পূর্ণাঙ্গ চিংড়ি	ছত্রাক ও শৈবাল, গলিত জৈব পদার্থ, ছোট ছোট কুচো চিংড়ি, মশার লার্ভা, শামুকের ডিম, ক্রস্টোসিয়ানস ইত্যাদি খাদ্য

পুরুষ ও স্ত্রী বাগদা চিংড়ির মধ্যে শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

পুরুষ বাগদা	স্ত্রী বাগদা
পুরুষ বাগদায় পেটাসমা নামক জননেন্দ্রিয় বিদ্যমান।	স্ত্রী বাগদায় থেলিকাম নামক জননেন্দ্রিয় বিদ্যমান
প্রথম জোড়া সন্তরণ পদের মধ্যবর্তী স্থানে পেটাসমা অবস্থিত	চতুর্থ ও পঞ্চম জোড়া সন্তরণ পদের মধ্যবর্তী স্থানে থেলিকাম অবস্থিত
পুরুষ বাগদার শেষ দুই জোড়া চলন পদ বড় এবং ডেকটাইলাম সুচালো	স্ত্রী বাগদার শেষ দুই জোড়া চলন পদ ছোট এবং ডেকটাইলামও সুচালো নয়।

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. বাগদা চিংড়ির ডিম পরিস্ফুটনের জন্য কত পিপিটি লবণাক্তার প্রয়োজন হয়?

২. চিংড়ির শিরোবক্ষ পৃষ্ঠদেশের আবরণ কি নামে পরিচিত?

৩. বাগদা চিংড়ির দেহে সর্বমোট কয় জোড়া উপাঙ্গ রয়েছে?

৪. পরিপাকনালি কয়টি অংশে বিভক্ত?

৫. চিংড়ির রক্তের রং কি?

৬. চিংড়ির রক্তসংবহন প্রণালির প্রধান অঙ্গের নাম কি?

৭. কোন অঙ্গের মধ্য দিয়ে রক্ত হৃৎপিন্ডে ফিরে আসে?

৮. বাগদা চিংড়ির ডিম ফুটতে মোট কত সময় লাগে?

৯. লার্ভা থেকে পোস্ট লার্ভা অবস্থায় পৌছাতে বাগদা চিংড়ির কতদিন সময় লাগে?

১০.স্ত্রী বাগদা চিংড়ির ডিম ধারণ ক্ষমতা কত?।

১১. বাগদা চিংড়ির বৈজ্ঞানিক নাম কি?

১২. একই বয়সের পুরুষ ও স্ত্রী বাগদা চিংড়ির মধ্যে কোনটি বড় হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাগদা চিংড়ির অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহের নাম লেখ।

২. পরিপক্ক স্ত্রী চিংড়ির ডিম পরিস্ফুটনের বিভিন্ন ধাপের নাম লেখ।

৩. বাগদা চিংড়ির শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য লেখ।

৪. বাগদা চিংড়ির শ্রেণিবিন্যাস লেখ।

৫. অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন ৫ টি লোনা পানির চিংড়ির বাংলা ও ইংরেজি নাম লেখ।

৬. পুরুষ ও স্ত্রী বাগদা চিংড়ির মধ্যে শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাগদা চিংড়ির পরিপাকতন্ত্র ও রেচনতন্ত্র বর্ণনা কর।

২. বাগদা চিংড়ির প্রজননতন্ত্র বর্ণনা কর।

৩. বাগদা চিংড়ির জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপসমূহ বর্ণনা কর।

৪. গলদা ও বাগদা চিংড়ির শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

২০২৫

তৃতীয় অধ্যায়
বাগদা চিংড়ির চাষ

বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের ইতিহাস শতাব্দী প্রাচীন। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে সুন্দরবন এলাকায় সনাতন পদ্ধতিতে ১৮২৯ সাল থেকে চিংড়ি চাষ শুরু হয়। শতাব্দীকাল হতে বৃহত্তর খুলনা জেলার উপকূলীয় অঞ্চলে ধান চাষের সঙ্গে পর্যায়ক্রমিকভাবে লবণ পানির বাগদা চিংড়ি ও মিঠা পানির গলদা চিংড়ি "ভেড়ি চাষ পদ্ধতিতে চাষ করা হতো, যেন অনেকটা অযত্নে অবহেলায় বেড়ে উঠা বনের বৃক্ষরাজির মতো। এই ভেড়ী চাষ পদ্ধতিতে উপকূলীয় এলাকার লবণের মাঠ, ধানক্ষেত বা খালি জায়গায় মাছ চাষের জন্য জোয়ারের পানি প্রবেশ করানো। এই পানিতে মাছের পোনার সাথে চিংড়ির পানাও প্রবেশ করত এবং মাছসহ চিংড়ির এই পোনাকে ৩-৪ মাস খামারে আটকিয়ে রেখে বড় হলে মাছের সাথে অতিরিক্ত ফসল হিসেবে চিংড়ি আহরণ করা হতো। স্বাধীনতা উত্তরকালে বা সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আমাদের দেশে চিংড়ি চাষের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই সময় থেকেই বাংলাদেশ চিংড়ি রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাথমিক অবস্থায় সম্পূর্ণ সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হতো। সময়ের বিবর্তনে কালের চাহিদা মেটাতে চিংড়ি চাষ পদ্ধতিরও ক্রমবিকাশ ঘটে সময়ের তালে তালে। তাই আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে সনাতন পদ্ধতির উৎকর্ষতা সাধন করে উন্নত সনাতন পদ্ধতির প্রবর্তণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে খামারে জোয়ারের পানির সাথে আসা চিংড়ি পোনার সাথে বাইরে থেকে সংগ্রহ করা চিংড়ির পোনা মজুদ করা শুরু হয়। জোয়ারের পানির সাথে যাতে অবাঞ্ছিত চিংড়ি ও রাক্ষুসে মাছ খামারে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই চাষ পদ্ধতি প্রবর্তণের ফলে প্রতি হেক্টরে উৎপাদন ৭৫-১০০ কেজি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫০-৩০০ কেজিতে উন্নীত হয়। পরবর্তীতে নব্বই দশকের গোড়ার দিকে কক্সবাজার, খুলনা ও সাতক্ষীরা এলাকায় আধানিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের ব্যাপকতা লাভ করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিংড়ির উৎপাদন দাঁড়ায় হেক্টর প্রতি ৩০০০-৫০০০ কেজি। প্রাপ্ত তথ্য মতে ১৯৮৫-৮৬ সালে উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষের জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ৮৭ হাজার হেক্টর এবং ১৯৯৭-৯৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে চিংড়ি চাষের জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার হেক্টর। ১৯৮৫ সালে চিংড়ির বার্ষিক গড় উৎপাদন ছিল হেক্টর প্রতি ৮০-৯০ কেজি। চাষ পদ্ধতির উন্নয়নের সাথে সাথে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে হেক্টর প্রতি প্রায় ৯০০ কেজি।

চাষযোগ্য প্রজাতিসমূহ

বাংলাদেশের বিভিন্ন জলাশয়ে বিভিন্ন ধরনের চিংড়ি পাওয়া যায়। এর মধ্যে মিঠা পানির গলদা চিংড়ি এবং লোনা পানির বাগদা, চাকা, হরিণা, ডোরাকাটা ও বাগতারা চিংড়ির চাষ লাভজনক হিসেবে পরিগনিত হয়েছে।

ক. গলদা চিংড়ি (Macrobrachium rosenbergii)

চিত্র: গলদা চিংড়ি

প্রাপ্তিস্থান: বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র বিশেষ করে কুমিল্লা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, চাঁদপুর, চট্টগ্রামের হালদা নদী ও ভালো জেলায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য: গলদা চিংড়ি দেখতে সাধারণত হালকা নীল কিংবা সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে। উদর খোলসের সংযোগে স্থলে নীল বন্ধনী থাকে। এই চিংড়ির ক্যারাপেসের খালেসে

২-৫টি কালচে আড়াআড়ি লম্বা দাগ দেখা যায়। রোস্ট্রাম লম্বা ও বাঁকানো। রোস্ট্রামের উপরিভাগে ১১-১৪টি এবং নিচের অংশে ৮-১৪টি খাঁজ বা দাঁত থাকে। অন্যান্য চিংড়ির তুলনায় গলদা চিংড়ির শিরোবক্ষ (Cephalothorax) অংশ বেশ বড়। এই চিংড়ির দ্বিতীয় চলন পদ তুলনামূলকভাবে বড় এবং নীল ও কিছুটা কালচে রঙের হয়ে থাকে। গলদা চিংড়ির উদরের দ্বিতীয় বিউরা প্রথম ও তৃতীয় বিউরাকে আংশিকভাবে আবৃত করে রাখে। ব্রাঙ্কিওস্টিগেল কাঁটা নেই, তবে যকৃত কাঁটা আছে।

খ. বাগদা চিংড়ি (Penaeus monodon)

প্রাপ্তিস্থান: বাংলাদেশের উপকূলীয় ও মোহনা অঞ্চল, বাগেরহাটের উধ্ব মোহনা, চালনা মোহনা, খুলনার পশুর নদীর মুখে নিম্ন মোহনা, পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালি ও খেপুপাড়া মোহনা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও বঙ্গোপসাগর এলাকা। তাছাড়া ভোলা জেলার লালমোহন ও চরফ্যাশন উপজেলা সংলগ্ন মেঘনা নদী ও বুড়গৌরাঙ্গ নদী মোহনায় বাগদা পাওয়া যায়।

চিত্র: বাগদা চিংড়ি

দৈহিক বৈশিষ্ট্য: বাগদা চিংড়ি দেখতে বাদামি থেকে সবুজ রঙের হয়ে থাকে। এদের গায়ে বাঘের মত কালচে ডোরাকাটা দাগ থাকে বলে এদেরকে জায়ান্ট টাইগার প্রণ (Giant:iger prawn) বলা হয়। এই চিংড়ির ইউরোপডড়ে দুইটি ঘন নীল বর্ণের ডোরাকাটা দাগ থাকে। বাগদা চিংড়ির খোলার দেহের সম্মুখভাগ থেকে পশ্চাদ্ভাগ পর্যন্ত লাল রেখা দেখা যায়। রোস্ট্রাম বাকা ও প্রশস্ত এবং দেখতে অনেকটা তরবারির মত। রোস্ট্রামের উপরের দিকে ৭-৮টি ও নিচের দিকে ৩-৪টি দাঁত থাকে। টেলসন খাঁজযুক্ত, যকৃত দেশীয় কেরিনা সোজা আকৃতির এবং যে পেরিওপডে এক্সোপড়াইট নেই।

গ. চাকা চিংড়ি (Penaeus indicus)

প্রাপ্তিস্থান: লোনা পানির এই চিংড়ি পটুয়াখালী, খুলনা, বাগেরহাট, কক্সবাজার ও সাতক্ষীরা জেলা এবং বঙ্গোপ-সাগরে পাওয়া যায়।

চিত্র: চাকা চিংড়ি

দৈহিক বৈশিষ্ট্য: চাকা চিংড়ির দেহে হালকা বাদামী রঙের ফোটা ফোটা দাগ থাকে। এর রোস্ট্রাম খাড়া ও বাঁকা। রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৮-১০টি এবং নিচের দিকে ৪-৬টি দাঁত থাকে। শুঙ্গ বাদামি বর্ণের হয়ে থাকে। পা কখনও কখনও লালচে বর্ণের হয়ে থাকে।

ঘ. হরিণা চিংড়ি *(Metapenaeus monoceros)*

প্রাপ্তিস্থানঃ হরিণা চিংড়ি লোনা পানিতে বাস করে। সাধারণত সমুদ্রের ১০-৩০ মিটার। গভীরে এদের বিচরণক্ষেত্র। এই চিংড়ি বাগেরহাট (পশুর নদীর নিম্ন মোহনা), খুলনা, সাতক্ষীরা ও চট্টগ্রাম জেলা এবং বঙ্গোপসাগরে এদের বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়।

চিত্রঃ হরিণা চিংড়ি

দৈহিক বৈশিষ্ট্যঃ এই চিংড়ির রোস্ট্রাম সোজা এবং তক বাদামি রঙের হয়ে থাকে। রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৮-১২টি খাঁজ থাকে এবং নিচের ভাগে কোনো খাজ থাকে না। ফ্লাজেলা উজ্জ্বল লাল রঙের এ কারণে এদেরকে হরিণা চিংড়ি বলে। ইউরোপড হালকা লাল বর্ণের হয়ে থাকে।

ঙ. বাগতারা চিংড়ি *(Penaeus semisulcutus)*

প্রাপ্তিস্থানঃ বাংলাদেশের খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার সুন্দরবন সংলগ্ন মোহনা অঞ্চল এবং পটুয়াখালী জেলায় এই চিংড়ি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

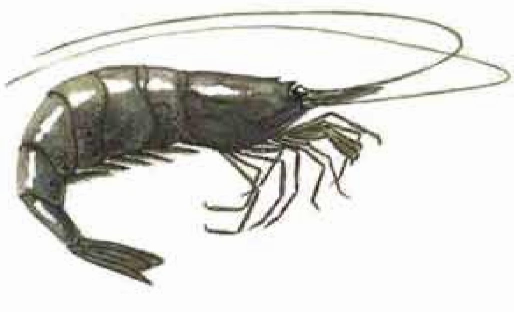

চিত্রঃ বাগতারা চিংড়ি

দৈহিক বৈশিষ্ট্যঃ এই চিংড়ি দেখতে অনেকটা হালকা সবুজ বর্ণের এবং এদের দেহে অসংখ্য বাদামি রঙের ফোঁটা দাগ থাকে। রোস্ট্রামের দুই পাশে খাঁজ দেখা যায়। রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৫-৮টি এবং নিচের দিকে ৩টি দাঁত থাকে। এদের পঞ্চম চলন পদে ছোট এক্সোপড়াইট বর্তমান।

গলদা, বাগদা, চাকা, হরিণা ও বাগতারা চিংড়ি ছাড়াও বাংলাদেশে অনেক প্রজাতির চিংড়ি আছে যাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বসম্পন্ন আরও কয়েকটি প্রজাতির চিংড়ির প্রাপ্তিস্থানঃ দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিচে বর্ণনা করা হলোঃ

ক. হন্নি চিংড়ি *(Metapenaeus brevicornis)*

প্রাপ্তিস্থানঃ এই চিংড়ি লোনা পানিতে বাস করে। বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট ও চট্টগ্রামের মোহনা অঞ্চলে এই চিংড়ি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

২০২২

দৈহিক বৈশিষ্ট্য: আঁশযুক্ত দেহের উপরিভাগে বাদামি ফেঁটা ফোটা দাগ থাকে এবং এই ফোঁটা দাগ লেজের দিকে বেশি থাকে। রোস্ট্রামের পেছনের অংশে উঁচু শৃঙ্গ বা ঝুঁটি থাকে। রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৫-৭টি দাঁত থাকে কিন্তু নিচের দিকে কোনো দাঁত থাকে না।

খ. ডোরাকাটা চিংড়ি *(Penaeus japonics)*

প্রাপ্তিস্থান: লোনা পানির ডোরাকাটা চিংড়ি গভীর সাগরে পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরে ০-৯০ মিটার গভীরতায় এই চিংড়ি পাওয়া যায়।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য: এই চিংড়ির দেহে ডোরাকাটা দাগ থাকে। রোস্ট্রাম সোজা ও রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৯ ১০টি এবং নিচের দিকে ১টি দাত থাকে। স্ত্রী চিংড়ির থেলিকামের সম্মুখ অংশের মাথা গোলাকার।

গ. লালিয়া চিংড়ি *(Metapenaeus spinulatus)*

প্রাপ্তিস্থান: লোনা পানির এই চিংড়ি বাংলাদেশের খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সুন্দরবন সংলগ্ন উপকূলীয় এলাকা, পটুয়াখালী জেলার রাঙাবালি ও খেপুপাড়া মোহনা এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় অঞ্চলসহ বঙ্গোপসাগরে পাওয়া যায়।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য: এই চিংড়ির রোস্ট্রাম উত্তল ও অগ্রভাগ সূঁচালো। রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৫-৬টি পাঁত থাকে। এন্টিনাল পাইন হেপাটিক স্পাইনের চেয়ে ছোট আকৃতির এবং টেলসনের পার্শ্বে দুই জোড়া পাইন থাকে। এই চিংড়ির এন্টিনিউলার ফ্লাজেলা ক্যারাপেসের চেয়ে লম্বা হয়ে থাকে।

ঘ. বাঘাতারা চিংড়ি *(Parapenaeopsis stylifera)*

প্রাপ্তিস্থান: বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলাধীন মহেশখালী এলাকা এবং সুন্দরবন সংলগ্ন নিম্ন মোহনায় এই চিংড়ি পাওয়া যায়।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য: এই চিংড়ির রোস্ট্রাম ও উদর খণ্ডে ছাই রঙের আড়াআড়ি দাগ বিদ্যমান। টেলসন ও লেজে পাখনা এবং বক্ষ ও সতরণ পদ লাল রঙের হয়ে থাকে। খাটো রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৭-৯টি দাঁত থাকে।

ঙ. বাগাচামা চিংড়ি *(Penaeus merguiensis)*

প্রাপ্তিস্থান: বৃহত্তর খুলনা ও কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় অঞ্চলের নিম্ন মোহনা এবং বঙ্গোপসাগরে বাঘাচামা চিংড়ি পাওয়া যায়।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য: এই চিংড়ির গায়ের রং সাদাটে। রোস্ট্রাম শৃঙ্গ ত্রিকোণাকৃতির। রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৬ ৭টি এবং নিচের দিকে ২-৪টি পাত থাকে।

চ. ছটকা চিংড়ি *(Macrobrachium malcolmsonii)*

প্রাপ্তিস্থান: বাংলদেশের প্রায় সর্বত্র বিশেষ করে ময়মনসিংহ, গাজিপুর, নরসিংদী, ফরিদপুর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী ও চট্টগ্রাম জেলায় এই চিংড়ি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য: এই চিংড়ির পৃষ্ঠদেশ ও তলদেশ হালকা নীল কিংবা সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে। দেহে বাদামি কিংবা কমলা বর্ণের ফ্যাকাশে হালকা টান টান দাগ থাকে। রোস্ট্রামের গোড়া উত্তল এবং রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৯-১৪টি ও নিচের দিকে ৫-৯টি সঁত থাকে। দ্বিতীয় চলন পদের কারপাস চিলার চেয়ে ছোট।

ছ. ডিমুয়া চিংড়ি *(Macrobrachium villosimanus)*

প্রাপ্তিস্থান: বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই বিশেষ করে কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলাসহ ডাকাতিয়া, মেঘনা, কর্ণফুলী ও হালদা নদীতে প্রচুর পরিমাণে এই চিংড়ি পাওয়া যায়।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য: এদের গায়ের রং স্বচ্ছ এবং ফ্লাজেলার অগ্রভাগ বাদামি লালচে রঙের। বাঁকানো ও সুদৃঢ় রোস্ট্রামের উপরিভাগে ১২-১৩টি এবং নিচের দিকে ৮-৯টি দাঁত থাকে।

জ. শুল চিংড়ি *(Macrobrachium birmanicus)*

প্রাপ্তিস্থান: বাংলাদেশে প্রায় সর্বত্রই এই চিংড়ি পাওয়া যায়। বিশেষ করে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও সিলেট অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে শুল চিংড়ি পাওয়া যায়।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য: মিঠা পানির এই চিংড়ির গায়ের রং হলদে সবুজ, বক্ষ হালকা নীলাভ রঙের এবং সন্তরণ পদ নীলাভ রঙের হয়ে থাকে। ছোট ও উত্তল রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৮-১৪টি এবং নিচের অংশে ৪-৬টি দাঁত থাকে।

চিংড়ির চাষযোগ্য এলাকা

বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বসম্পন্ন বাগদা ও গলদা চিংড়ি এদেশের নদ-নদী, খাল-বিল, ডোবা-পুকুর, ধানক্ষেত ও বিস্তীর্ণ। উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই কম বেশি চাষ হয়ে থাকে। কোথাও চাষ হচ্ছে সনাতন পদ্ধতিতে, আবার কোথাও হচ্ছে উন্নত পদ্ধতিতে। বাংলাদেশে চিংড়ি চাষযোগ্য জলাশয়ের আয়তন প্রায় ১.৪০ লক্ষ হেক্টর। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল জুড়ে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন অবস্থিত, যা বিভিন্ন প্রজাতি বিশেষ করে বাগদা চিংড়ির প্রাকৃতিক আবাসস্থল হিসেবে সমধিক পরিচিত। বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ ভূমি উপকূলীয় অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত। এই উপকূলীয় এলাকায় কমপক্ষে ৫ পিপিটি পর্যত লবণাক্ত পানি পাওয়া যায়। তাই এই অঞ্চল বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। বর্তমানে বাংলাদেশের চাষযোগ্য উপকূলীয় ভূমির মাত্র শতকরা ৫ ভাগ এলাকায় চিংড়ি চাষ করা হচ্ছে। ১৯৭৫ সনে চাষ ক্ষেত্র থেকে মোট ৪ হাজার মে. টন (মাথাসহ) চিংড়ি উৎপাদিত হয়। ১৯৭৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে পড়ায় ১৫ হাজার মে টনে এবং বর্তমানে উৎপাদিত চিংড়ির পরিমাণ প্রায় ৫ হাজার মে টন। বাংলাদেশে চাষ ক্ষেত্র থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ির প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ রপ্তানি হয়ে থাকে এবং অবশিষ্ট ২০-৩০ শতাংশ অভ্যন্তরীণ বাজারে ব্যবহৃত হয়।

ঘেরে চাষকৃত চিংড়ি ও মাছের প্রজাতি

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় চাষকৃত চিংড়ির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই বাগদা চিংড়ি। তাছাড়া বাগদা চিংড়ির সাথে হরিণা, চাকা ও হন্নি চিংড়িসহ মিঠাপানির গলদা চিংড়ি চাষ হয়ে থাকে। ঘেরে চিংড়ির সাথে ভেটকি, টেংরা, পারসে, পোয়া, পাঙ্গাস ও গিফট তেলাপিয়া চাষ হয়ে থাকে। এছাড়া ধানের সাথে চিংড়ি ও রুই জাতীয় মাছও চাষ হয়ে থাকে। ২০২২

চাষ ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে চিংড়ি চাষের প্রকারভেদ নিম্নরূপ:

বৈশিষ্ট্য	প্রথাগত চাষ	আধানিবিড় চাষ	নিবিড় চাষ	অতি নিবিড় চাষ
উৎপাদন (মে. টন/হে./বছর)	০.১-০.৩	০.৫-২.৫	৫-১৫	৩০-৫০
পানোর উৎস	প্রাকৃতিক উৎস	প্রাকৃতিক উৎস /হ্যাচারি	হ্যাচারি	হ্যাচারি
মজুদ ঘনত্ব (সংখ্যা/মি)	০.১-১.০	৩-১০	১৫-৪০	>১০০
সর্বোচ্চ শস্য (গ্রাম/মি)	<২৫	২৫-১৫০	২৫০-১০০০	১৫০০-৪৫০০
শস্য/বছর	১-২	২-৩	২.৫-৩	>৩
পুকুরের আয়তন (হে.)	>৫	১-২	০.২৫-২.০০	০.২৫
সঞ্চিত শক্তি দরকার (হর্স পাওয়ার/হে.)	০-২	২-৫	১৫-২০	>২৫
পুকুরের আকার	অসমান	অধিক সমান	বর্গাকার বা আয়তকার	সম্পূর্ণ সিমেন্টেড রেসওয়ে
পানির গভীরতা (মিটার)	০.৪-১	০.৭-১.৫	১.৫-২.০	বিভীন্ন গভীরতা
খাদ্য	প্রাকৃতিক	প্রাকৃতিক/সম্পূরক	প্রতুতকৃত	প্রতুতকৃত
খাদ্য খাদ্য রূপান্তর হার কেজি খাদ্য/কেজি বাগদা)	০	<১-১.৫	১.৫-২.০	>২.০
ব্যবস্থাপনা	অল্প ব্যবস্থাপনা	নিয়মিত ব্যবস্থাপনা	নিয়মিত ব্যবস্থাপনা	নিয়মিত ব্যবস্থাপনা দক্ষ শ্রমিক সহকারে
পানি পরিবর্তন হার	জোয়ার/পাম্প	পাম্প	পাম্প	পাম্প
বায়ু প্রবাহ	প্রাকৃতিকভাবে পরিবর্তন	পানি পরিবর্তন	এয়ারেটর এবং অক্সিজেন প্রবাহ	বায়ু প্রবাহ এবং পানির পরিবর্তন
মিশ্র চাষ	স্বাভাবিক	কম	খুব কম	খুব কম
অবাঞ্ছিত প্রজাতি	প্রচুর	স্বাভাবিক	খুব কম	খুব কম
বঁচার হার	<৬০	৬০-৮০	৮০-৯০	৮০-৯০
শ্রমিক দরকার	০.১৫	০.১-০.২৫	০.৫-১	>১
রোগ সমস্যা	কম	স্বাভাবিকভাবে সমস্যা হয় না	খুব সমস্যা হয়	খুব সমস্যা হয়
সর্বোচ্চ আয়	খুব কম	অধিক	সর্বোচ্চ	সর্বাধিক উচ্চ

ঘেরে উন্নত পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ কৌশল

বাংলাদেশে সত্তরের দশক থেকে চিংড়ি চাষ শুরু হলেও অদ্যাবধি চাষ পদ্ধতির তেমন উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয় নি। সময়ের ব্যবধানে গতানুগতিক চাষ পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন হলেও মূলত চাষ কৌশল এখনও বিজ্ঞানসম্মত পর্যায়ে পৌছেনি। তাই ঘেরের সার্বিক পরিবেশ থাকে বিপর্যস্ত, আক্রমণ হয় নানা রোগ-জীবাণুর এবং সর্বোপরি একক এলাকায় উৎপাদন হয় অনেক কম। ঘেরের অবকাঠামোগত প্রস্তুতি থেকে শুরু করে পোনা মজুদ, পানি ও মাটি ব্যবস্থাপনা, সার, চুন ও খাদ্য প্রয়োগ বা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের অভাবই মূলত চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। ঘের প্রস্তুতি ও মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে একক এলাকায় উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

উন্নত চাষ পদ্ধতি

চিংড়ি চাষের উষালগ্ন থেকেই গতানুগতিক পদ্ধতিতে চাষ করা হয়ে থাকে। চিংড়ি চাষে ঘের প্রস্তুতি থেকে শুরু করে পোনা মজুদকরণ, খামারের উৎপাদনশীলতা ও মজুদ ঘনত্ব সম্পর্কে ধারণা না থাকা, খাদ্য প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে অসচেতনতা ও উদাসীনতার কারণে একক এলাকায় উৎপাদন অত্যন্ত কম। বাস্তব ক্ষেত্রে এ সকল বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনার প্রয়োগই হচ্ছে উন্নত পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ। উন্নত পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

ক) ঘেরে বিদ্যমান অবকাঠামোর সামান্য উন্নয়ন করে গতানুগতিক পদ্ধতির চেয়ে প্রতি একক এলাকায় উৎপাদন বাড়ানো।

খ) ঘেরের মাটি ও পানির ধারণক্ষমতার উপর ভিত্তি করে মজুদ ঘনত্ব ও চাষ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করে একটি মাঝারি ধরনের উৎপাদন নিশ্চিতকরণ।

গ) নিবিড় ও আধা-নিবিড় পদ্ধতির মত চাষ পদ্ধতির উৎপাদন ঝুঁকি ও উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে পরিবেশ বান্ধব ও স্থিতিশীল উৎপাদন ও অধিক মুনাফা অর্জন।

আদর্শ ঘেরের বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক) জোয়ারের পানিদ্বারা সরাসরি ও সহজে পানি পরিবর্তন করা যায় এমন ঘের নির্বাচন করতে হবে।

খ) পানি উঠানামা করানোর জন্য অন্য ঘেরের উপর নির্ভরশীল না হয়ে স্বতন্ত্র পানি ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে।

গ) ঘেরের আয়তন ০.৫ থেকে ১.০ হেক্টর হলে ব্যবস্থাপনা সহজ হবে।

ঘ) ঘেরে পানির গড় স্থির গভীরতা ১.০ থেকে ১.২ মিটার হলে ভালো হয়।

ঙ) ঘেরের তলদেশ সমান করতে হবে।

চ) ঘেরের পাড় যথেষ্ট মজবুত ও চওড়া হতে হবে, যাতে পানি চুঁইয়ে বের হয়ে না যায়।

ক. ঘের মেরামত ও গভীরতা নির্ধারণ

উন্নত পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পূর্বশর্ত হচ্ছে ঘের মেরামত ও উপযুক্ত গভীরতা নির্ধারণ। তাই ঘের নির্বাচন, মেরামত ও গভীরতা নির্ধারণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা অত্যাবশ্যকঃ

ক) ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঘেরের পানি শুকিয়ে তলদেশে পর্যাপ্ত সূর্যকিরণ লাগাতে হবে।

খ) ঘেরে পানির উপযুক্ত গভীরতা ধরে রাখার জন্য পাড় যথাসম্ভব উঁচু (১.২-১.৫ মিটার) ও মজবুত (চওড়া) করতে হবে।

গ) তলদেশ ও পাড় ভালোভাবে মেরামত করতে হবে, যাতে পানি চুইয়ে না যায় বা অন্য ঘেরের পানি প্রবেশ করতে না পারে ।

ঘ) পানি উত্তোলন গেটে বাশের পাটা ও নাইলনের মশারি নেট দিয়ে স্ক্রিন তৈরি করতে হবে । যাতে পানি উত্তোলনের সময় অবাধে অবাঞ্চিত ও রাক্ষুসে মাছ বা প্রাণি প্রবেশ করতে না পারে ।

খ. ঘেরে নার্সারি তৈরি

পোনার বেঁচে থাকার হার বৃদ্ধির জন্য ঘেরে নার্সারি ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি । তাই ঘেরে স্বল্পকালীন নার্সারি তৈরি করে পোনা লালন-পালন করা হলে পোনার বেঁচে থাকার হার অনেকাংশে বাড়ানো সম্ভব । এ লক্ষ্যে

ক) ঘেরের যে কোনো এক পাশে মাটির বাঁধ দিয়ে বা বাঁশের চটা ও মশারির নাইলন নেট দিয়ে ঘিরে ঘেরের আয়তনের ১০-১৫ ভাগ আকারের নার্সারি তৈরি করতে হবে ।

খ) বাশের চটা ও মশারির নাইলন নেট দিয়ে নার্সারি তৈরি করলে খেয়াল রাখতে হবে যাতে নেট ছিদ্র না থাকে । নেট ছিদ্র থাকলে পোনা বের হয়ে লালন পুকুরে চলে যাবে ।

গ) পোনার প্রাথমিক অবস্থায় আশ্রয়ের জন্য নার্সারিতে পরিমিত পরিমাণ বাঁশের কঞ্চি বা শুকনো নারিকেল বা খেজুর পাতা পুঁতে দিতে হবে । এতে একদিকে যেমন পোনার আশ্রয় হবে তেমনি এতে জমানো পেরিফাইটন ও ব্যাকটেরিয়াল ফিল্ম পোনার প্রাথমিক দশায় খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হবে ।

গ. ঘের ও নার্সারি প্রস্তুতি

প্রস্তুতি পর্বে ঘের ও নার্সারি কমপক্ষে ৫-৬টি স্থানের মাটির পিএইচ পরিমাপ করতে হবে । মাটির পিএইচ এর উপর ভিত্তি করে নার্সারি ও ঘেরে পরিমিত হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে । চুন প্রয়োগের পরিমাণ হলোঃ

ক) ঘের ও নার্সারি প্রস্তুতকালীন সময়ে তলদেশ ও পাড়ের উপরের অংশ পর্যন্ত শতকে ১ কেজি হারে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এর মিশ্রণ প্রয়োগ করা যেতে পারে; অথবা

খ) পাথুরে চুন ও ক্যালসিয়াম অক্সাইড এর মিশ্রণ ১ঃ১ অনুপাতে প্রয়োগ করা যেতে পারে; কিংবা

গ) শুধুমাত্র ডলোমাইট বা পাথুরে চুন উল্লিখিত হারে ছিটিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে ।

ঘ. ঘেরে পানি উত্তোলন এবং রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দমন

চুন প্রয়োগের ৩-৭ দিন পরে স্ক্রিনিং করে ঘের ও নার্সারিতে ৫০-৬০ সেমি জোয়ারের পানি ঢুকাতে হবে, যাতে অবাঞ্চিত ও রাক্ষুসে মাছ ঘেরে প্রবেশ করতে না পারে । তদুপরি জোয়ারের পানির সাথে কদাচিৎ কিছু কিছু রাক্ষুসে মাছ বা অবাঞ্চিত প্রাণি ঘেরে ঢুকে পড়তে পারে । এদের ধ্বংস করার জন্য

ক) উপযুক্ত পানি উত্তোলনের পর ১ কেজি/শতক/ফুট গভীরতা হারে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করা যেতে পারে; অথবা ।

খ) ফসটক্সিন ট্যাবলেট ১ টি/শতক/ফুট গভীরতা হিসেবে প্রয়োগ করা যেতে পারে । এতে অবাঞ্চিত ও অন্যান্য রাক্ষুসে মাছ ও প্রাণি মারা যাবে এবং খরচও অনেক কম হবে । ফলে পোনার বেঁচে থাকার হার বৃদ্ধি পাবে ।

ঙ. সার প্রয়োগ

চিংড়ি পোনা মজুদের উপযুক্ত প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ঘেরে সার প্রয়োগ জরুরি । এ লক্ষ্যে ঘেরে ব্লিচিং পাউডার বা ফসটক্সিন ট্যাবলেট প্রয়োগের ৩-৫ দিন পরে—

২০২২

ক) ঘের ও নার্সারির পানিতে ২০০ গ্রাম/শতক হারে ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম/শতক হারে টিএসপি, ৫০ গ্রাম/শতক হারে পটাশ সার এবং ১২৫ গ্রাম/শতক হারে চিটাগুড় প্রয়োগ করা যেতে পারে ।

খ) সার প্রয়োগের ৫-৭ দিনের মধ্যে ঘেরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য (প্ল্যাংকটন) উৎপন্ন হবে বলে আশা করা যায় । যদি প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা কম হয় তাহলে পুনরায় প্রথম ডোজের অর্ধেক পরিমাণ সার প্রয়োগ করা যেতে পারে । সার প্রয়োগের ৩-৫ দিনের মধ্যে ঘেরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য (প্ল্যাংকটন) উৎপন্ন হবে । এমতাবস্থায় ঘের পোনা মজুদের জন্য প্রস্তুত বলে মনে করা যেতে পারে ।

চ. পোনা মজুদকরণ

সার প্রয়োগের ৭ দিন পরে ঘেরের পানিতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য (প্ল্যাংকটন) উৎপন্ন হবে বলে আশা করা যায় । তখন এই পদ্ধতিতে ঘেরের জন্য ২০০ টি/শতকে সুস্থ-সবল বাগদা চিংড়ির পোনা পরিমিত অভ্যস্তকরণ করে নার্সারিতে মজুদ করতে হবে ।

ছ. খাদ্য প্রয়োগ ব্যবস্থাপনা

বাগদার আশানুরূপ উৎপাদন পেতে হলে প্রয়োজনীয় খাবার প্রয়োগ করতে হবে । তাই

ক) পোনা মজুদের পরের দিন হতে নিচের সারণি মোতাবেক তৈরি খাবার সকাল-সন্ধ্যায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে ।

খ) নার্সারিতে পোনা মজুদের সর্বোচ্চ ১৪-২১ দিনের মধ্যে নার্সারি উন্মুক্ত করে আঙ্গুলীপোনা লালন পুকুরে । অবমুক্ত করতে হবে ।

গ) প্রতি ৭ দিন অন্তর কিছু জীবন্ত চিংড়ি ধরে ওজন নিতে হবে এবং ঘেরে মোট চিংড়ির ওজন (বায়োমাস) । হিসেব করতে হবে । সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় খাবার কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রয়োগ করতে হবে । খাবার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে খাবার বেশি না হয় ।

ঘ) খাবার বেশি হলে তা পচে ঘেরের পানি নষ্ট হবে, দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যেতে পারে বা অনাকাঙ্ক্ষিত গ্যাস যেমন- হাইড্রোজেন সালফাইড ও অ্যামোনিয়ার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে ।

ঙ) খাবারের ট্রে ব্যবহার করে মাঝে মাঝে খাবার গ্রহণের মাত্রা লক্ষ্য করতে হবে এবং প্রয়োজনে খাবার কম বা বেশি করা যেতে পারে ।

সারণি: চিংড়ির খাবার সরবরাহের পরিমাণ

সপ্তাহ	দৈনিক খাবারের পরিমাণ (দৈহিক ওজনের)	খাবারের প্রকার/ধরন
১ম সপ্তাহ	১০০%	নার্সারি খাদ্য
২য় সপ্তাহ	৬০%	নার্সারি খাদ্য (স্টার্টার-১)
৩য় সপ্তাহ	৩০%	নার্সারি খাদ্য (স্টার্টার-১, ২)
৪র্থ সপ্তাহ	১০%	নার্সারি খাদ্য (স্টার্টার-২)
৫ম সপ্তাহ হতে আহরণ পর্যন্ত	২-২.৫%	পিলেট খাদ্য (স্টার্টার-৩)

জ. ঘেরের পানি ব্যবস্থাপনা

চিংড়ির উপযুক্ত দৈহিক বৃদ্ধি ও পানির গুণগতমান সহনশীল পর্যায়ে রাখার জন্য পানি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি । তাই চিংড়ির বয়স এক মাস হলে পরিশ্রুত পানি উত্তোলন করে পানির গভীরতা এক মিটার করতে

হবে। ঘেরের পানি প্রতি ৭ দিন অন্তর পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং যে কোনো ধরনের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে। সেজন্য

ক) পানির পিএইচ ৭.৫ এর নিচে নামলে বা সকাল সন্ধ্যার মধ্যে পানির পিএইচ এর পার্থক্য ০.৫ এর বেশি। হলে ঘেরের পানিতে ১ কেজি/শতক হারে পাথুরে চুন পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

খ) কোনো কারণে পানির পিএইচ বেড়ে ৯.০ এর ওপরে গেলে পরিমিত পরিশ্রত পানি যাগে করতে হবে।

গ) পানিতে প্রাকৃতিক খাবার অপর্যাপ্ত হলে বা পানির স্বচ্ছতা ৩৫ সেমি এর ওপরে হলে ৫০ গ্রাম/শতক হারে টিএসপি এবং প্রয়োজনে ৫০ গ্রাম/শতক হারে পটাশ সার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ঘ) এই পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষে ঘেরে প্রথম এক থেকে দুই মাস সার প্রয়োগ করতে হবে। পরবর্তীতে আর সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। কারণ অবশিষ্ট খাদ্য ও চিংড়ির খোলস এবং মল পচনের মাধ্যমে পরবর্তীতে পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবে।

ঙ) পানির স্বচ্ছতা যদি কমে যায় তাহলে পরিশ্রত পানি যাগে করতে হবে। ঘেরের পানি সূর্যালোকে যে পরিমাণ কমবে তা প্রতি অমাবস্যা-পূর্ণিমায় জোয়ারের পরিশ্রুত পানি দ্বারা পূরণ করতে হবে।

চ) পানিতে যদি দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা দীর্ঘ সময় ৩.৫ এর নিচে থাকে তাহলে পরিশ্রুত পানি সংযোজন করতে হবে বা বাতাস সঞ্চালনের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘেরের পানিতে কোন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হলে পরিশ্রত পানি যাগে করা প্রয়োজন। পানি সংযোজনের পর এবং বৃষ্টির পরে প্রয়োজনে ৬-৮ পিপিএম (এক হেক্টর ঘেরে এক মিটার পানির জন্য ৬০-৮০ কেজি) হারে ডলো চুন পানিতে গুলে প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ঝ. চিংড়ির স্বাস্থ্য পরিচর্যা

চিংড়ির স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য প্রতি ৭ দিন অন্তর চিংড়ি ধরে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে চিংড়ির খোলস ও সন্তরণ পাখনায় অ্যালজি ও জুথামনিয়াম দেখা যেতে পারে। পর্যায়ক্রমিকভাবে ১ কেজি/শতক হারে চুন প্রয়োগ এবং পরিশ্রত পানি সংযোজনের মাধ্যমে এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। এছাড়াও অন্যান্য যেকোন রোগের লক্ষণ দেখা মাত্র একজন চিংড়ি রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

ঞ. বাগদা আহরণ

উল্লিখিত পদ্ধতিতে পরিচর্যা করা হলে ৯০ দিনের মধ্যে বাগদা চিংড়ির গড় ওজন ২২.৫-২৫০ গ্রাম হবে। একই সময়ে কিছু চিংড়ি দ্রুত বর্ধনের মাধ্যমে ২৫০-৩০০ গ্রাম হতে পারে, যা বাজারজাতকরণের উপযোগী। এমতাবস্থায়

ক) প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমার জোয়ারের সময় ঘেরে ট্র্যাপ (চারু) দিয়ে বা ঝাকি জাল ফেলে বড় চিংড়ি আহরণ করে ঘেরের অবশিষ্ট ছোট চিংড়িকে বড় হওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে।

খ) প্রায় ১২০-১৩০ দিন চাষের পর ঘের শুকানোর মাধ্যমে সম্পূর্ণ চিংড়ি আহরণ করা যেতে পারে।

উৎপাদন

উল্লিখিত পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হলে এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা করলে চিংড়ির বেঁচে থাকার হার ৬০-৭০ শতাংশ হবে বলে আশা করা যায়। যা থেকে প্রতি হেক্টর ঘের থেকে ৮০০-৯০০ কেজি বাগদা চিংড়ির উৎপাদন পাওয়া সম্ভব।

২০২২

আয়-ব্যয়

উল্লিখিত উন্নত পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি চাষ গবেষণায় দেখা যায়, এক হেক্টর পরিমাণ ঘেরে একক ফসলে বাগদা চিংড়ি উৎপাদনে সর্বসাকুল্যে প্রায় ১.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় এবং ৮৫০ কেজি চিংড়ি উৎপাদন করা যায়। প্রতি কেজি ৪০০.০০ টাকা হিসেবে উৎপাদিত চিংড়ির বাজার মূল্য প্রায় ৩.২০ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে প্রকৃত মুনাফা আসে ১.৭০ লক্ষ টাকা। আর যদি এক মৌসুমে দুইটি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব করা যায় তাহলে প্রকৃত মুনাফা দ্বিগুণ করা সম্ভব।

সতর্কতা:

> ঘের পর্যায়ে নাইলন মশারী নেট দিয়ে নার্সারি তৈরির পরিবর্তে মাটির বাঁধ দিয়ে নার্সারি করলে বেশি . নিরাপদ হবে। এত্রে কাকড়ার নেট কেটে দেয়ার ভয় কম থাকে।

> ঘেরের পানির উপযুক্ত গুণাগুণ সংরক্ষণের জন্য পরিমিত গভীরতা পর্যন্ত পানি অবশ্যই ধরে রাখতে হবে। তা নাহলে অধিক তাপমাত্রার সময় দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যেতে পারে এবং চিংড়ির মড়ক দেখা দিতে পারে।

> ঘেরের পানি চুইয়ে যাওয়া বা অন্য ঘের হতে পানি আগমন অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। সেটা করা সম্ভব না হলে একদিকে যেমন পানির উপযুক্ত গুণাগুণ ধরে রাখা সম্ভব হবে না, তেমনি অন্যদিকে রোগের সংক্রমণ

> হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। চিংড়ির জন্য নিয়মিত পরিমাণমত সুষম খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। খাদ্য প্রয়োগ বেশি হলে পানি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার খাদ্য কম হলে চিংড়ির বৃদ্ধি আশানুরূপ হবে না এবং চিংড়ি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে।

রূপান্তরিত আবদ্ধ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ

সত্তর দশক থেকে শুরু করে নব্বই দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত দেশের চিংড়ি চাষ পদ্ধতির একটি ক্রমবিকাশ পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯৪ সাল পরবর্তী সময়ে ভাইরাসজনিত রোগের কারণে চিংড়ি চাষ বিশেষভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং এতে চিংড়ি শিল্পে চরম ক্ষতি সাধিত হয়েছে। চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই ক্ষতির কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবন একান্ত প্রয়োজন।

আবদ্ধ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ কি?

রোগের সংক্রমণ প্রতিহত করার জন্য গতানুগতিক পদ্ধতির ন্যায় ঘেরের পানি পরিবর্তন না করে পানিকে ঘেরে আবদ্ধ রেখে উক্ত পানিতে চিংড়ি চাষের পদ্ধতিকে আবদ্ধ পদ্ধতিকে চিংড়ি চাষ নামে অভিহিত করা হয়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোনো কোনো দেশে আবদ্ধ পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি চাষের প্রচলন রয়েছে। এই পদ্ধতিতে গতানুগতিক আধানিবিড় চিংড়ি চাষ পদ্ধতির সাথে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ সংযোজন করে চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে।

ক) কোনো পানি পরিবর্তন না করা। প্রয়োজনে জলাধার হতে পরিশোধিত পানি ব্যবহার করা।

খ) পানির গভীরতা ১.০-১.২ মি রাখা।

গ) ঘেরে জমাকৃত জৈব পদার্থের বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার জন্য পর্যাপ্ত বাতাস সরবরাহ করা।

ঘ) ঘেরের পানির বাফার ক্ষমতা, পিএইচ ও অ্যালকালিনিটিসহ অন্যান্য ভৌত-রাসায়নিক সূচকসমূহ স্থিতিশীল রাখার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী চুন ও সার প্রয়োগ করা।

২০২২

ঙ) পানিতে চাষকালীন সময়ে পর্যাপ্ত প্ল্যাংকটনের উপস্থিতি নিশ্চিত করা ।

চ) খাদ্য সীমিত আকারে প্রয়োগ করা, যাতে অতিরিক্ত জৈব পদার্থ না জমে ।

রূপান্তরিত আবদ্ধ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের বৈশিষ্ট্য

আবদ্ধ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের আলোকে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট চিংড়ি চাষের ওপর গবেষণা পরিচালনা করে এবং কিছু বৈশিষ্ট্য সংযোজনের মাধ্যমে পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করে । উন্নত পদ্ধতিকেই রূপান্তরিত আবদ্ধ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে । গবেষণায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ হলোঃ

ক) দেখা যায় চিংড়ি ছাড়াও অন্য অনেক প্রাণি ভাইরোগর সম্ভাব্য বাহক হতে পারে । আবদ্ধ পদ্ধতিতে এসব প্রাণী নিধনের কোন ব্যবস্থা ছিল না । তাই রূপান্তরিত পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ এবং চিংড়ি মজুদের কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন ছাড়া সব প্রাণি ধ্বংস করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ।

খ) আবদ্ধ পদ্ধতিতে ঘেরের পানির গভীরতা ১.০-১.২ মিটার রাখার কথা বলা হয়েছে । এতে বাইরের জোয়ারের পানি এবং পানির সাথে বাহক প্রাণী ঘেরে ঢুকে যেতে পারে । তাই রুপান্তরিত পদ্ধতিতে পানির গভীরতা কমপক্ষে ১.৫-২.০ মিটার কিংবা যাতে বাইরের জোয়ারের পানি ঢুকতে না পারে, সেই উচ্চতার উপরে পানি রাখতে হবে ।

গ) অতিরিক্ত জৈব পদার্থ ক্ষতিকর গ্যাস সৃষ্টি করে । এজন্য রূপান্তরিত পদ্ধতিতে কোনো জৈব সার ব্যবহার করা হয় না ।

ঘ) চিংড়ি কোনো কারণে পীড়িত হলে স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে এবং পরবর্তীতে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে । তাই চিংড়িকে পীড়নমুক্ত রাখার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

রূপান্তরিত আবদ্ধ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের কারণ

ক) মজুদকৃত পোনা যদি ভাইরাস মুক্ত থাকে, তাহলে এই পদ্ধতিতে একটি নিশ্চিত উৎপাদন পাওয়ার আশা করা যায় ।

খ) এই পদ্ধতিতে বাইরের পানিতে দ্রবীভূত বর্জ্য ও অণুজীবসহ অন্যান্য রোগের জীবাণুর আক্রমণ হতে ঘেরের চিংড়িকে রক্ষা করা যায় ।

গ) ঘেরে নিজস্ব দূষণ ও রোগ জীবাণু বাইরে ছড়িয়ে পড়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না । আবদ্ধ পদ্ধতিতে কৃত্রিম খাবার প্রয়োগের ফলে পানি দূষণের সম্ভাবনা থাকে । কিন্তু রূপান্তরিত আবদ্ধ পদ্ধতিতে পানির গভীরতা বেশি থাকার ফলে দূষণের সম্ভাবনা কমে যায় এবং তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকে ।

ঘ) চিংড়ির বসবাস উপযোগী স্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ।

ঙ) সূর্যালাকে মাটিতে পৌছাতে পারে না বিধায় কোনো জলজ আগাছা জন্মাতে পারে না ।

চ) পানির তাপমাত্রাসহ অন্যান্য ভৌত-রাসায়নিক সূচকসমূহ স্থিতিশীল থাকার ফলে চিংড়ি পীড়নমুক্ত থাকে ।

রূপান্তরিত আবদ্ধ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ পদ্ধতি

ক. ঘের প্রস্তুতি

ক) ঘেরের পাড় নির্মাণঃ ঘেরের পাড় শক্ত ও উঁচু হতে হবে যাতে ১.৫-২.০ মিটার উচ্চতায় পানি ধরে রাখা যায় । পাড়ে কাকড়া বা ইঁদুরের গর্ত থাকলে তা ভালভাবে বন্ধ করতে হবে ।

খ) জলাধার নির্মাণ: মোট চাষ এলাকার ১৫-২০ শতাংশ এলাকায় একটি জলাধার নির্মাণ করতে হবে, যাতে প্রয়োজনে জলাধার হতে পরিশোধিত পানি সহজে চাষের ঘেরে সরবরাহ করা যায় ।

গ) ঘের শুকানো: সমস্ত জলজ আগাছা পরিষ্কার করে ঘের এমনভাবে শুকাতে হবে, যাতে ঘেরের মাটি ফেটে না যায় এবং যে কেউ ঘেরের উপর দিয়ে হাঁটলে পায়ের হালকা ছাপ মাটিতে পড়ে ।

ঘ) তলায় মাটি সরানো: মাটির উপরে জমাকৃত ৬-৮ ইঞ্চির অতিরিক্ত তলানি সরিয়ে ফেলতে হবে ।

ঙ) চুন প্রয়োগ: শতকে ১ কেজি হারে পাথুরে চুন খুব সকালে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে । পুকুরের তলা হতে পাড়ের উপরিভাগ পর্যনত ছিটাতে হবে ।

চ) মাটি চাষ: ঘেরের উপরের ৬-৮ ইঞ্চি মাটি চাষ করে চুন ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে ।

ছ) খাবার ট্রে স্ট্যান্ড স্থাপন: খাবার ট্রে ঝুলানো এবং চিংড়ি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সুবিধার্থে এক একরের । একটি ঘেরের চার পাশের পাড়ে চারটি ট্রে স্ট্যান্ড স্থাপন করতে হবে ।

জ) পানি সরবরাহ: পার্শ্ববর্তী নদী বা খাল থেকে প্রয়োজনীয় লবণাক্ত পানি (১.৫-২.০ মিটার) ঘেরে প্রবেশ করাতে হবে ।

ঝ) প্রাণীকূল নিধন: প্রতি ২০ ঘন মিটার পানিতে ১টি ফসটক্সিন ট্যাবলেট ব্যবহার করে পুকুর হতে সমুদয় প্রাণীকূল । নিধন করা যেতে পারে । নিধনকৃত সব প্রাণী যথাশীঘ্র পানি হতে তুলে ফেলতে হবে ।

ঞ) সার প্রয়োগ: প্রাণীকূল নিধনের ৪-৫ দিন পর পানির স্বচ্ছতা যদি ৩০-৩৫ সেমি-এর বেশি হয় তাহলে ইউরিয়া ২.০-৩.০ পিপিএম; টিএসপি ৩.০-৩.৫ পিপিএম এবং পটাশ ০.৬-০.৮ পিপিএম হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে । ইউরিয়া ও পটাশ ছিটিয়ে এবং টিএসপি অবশ্যই পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে ।

ট) পেডেল তুইল স্থাপন: ঘেরের চারপার্শ্বে পাড় হতে ২.৫-৩.০ মিটার দূরত্বে একটি করে পেডেল হুইল স্থাপন করতে হবে ।

খ. পোনা মজুদ

ক) প্রতি শতকে ২৪০-২৯০ টি সুস্থ-সবল পোনা মজুদ করা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বেশি লাভজনক এবং পরিবেশ টেকসই ।

খ) এই ঘনত্বে চিংড়ি দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ১২০ দিনে বাজারজাত উপযোগী হয় ।

গ) পোনা মজুদের পূর্বে পোনার সুস্থতা ও সবলতা পরীক্ষা এবং ঘেরের পানিতে গানোকে খাপ খাইয়ে নেয়া বিশেষ প্রয়োজন ।

গ. খাবার সরবরাহ

পোনা মজুদের দিন হতে আনুমানিক দৈনিক চার বার খাবার সরবরাহ করতে হবে । পিএল ২০-৩৬ এর ক্ষেত্রে ৫০০ গ্রাম/লক্ষ পোনা/দিন এবং পিএল ৩৬-৪২ এর ক্ষেত্রে ৮০০ গ্রাম/লক্ষ পোনা/দিন খাবার দিতে হবে । চিংড়ির ওজন অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

সারণি: চিংড়ির ওজন অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ

চিংড়ির ওজন (গ্রাম)	খাবারের পরিমাণ (চিংড়ির মোট ওজনের শতকরা হার)	মোট খাবার (কেজি/লক্ষ পোনা/দিন)
২	৬-৬.৫	১২-১৩
৫	৫.৫	১৭.৫
১০	৪.৫	৪৫
১৫	৩.৮	৫৭

২০	৩.৫	৭০
২৫	৩.২	৮০
৩০	২.৮	৮৪
৩৫	২.৫	৮৭

এছাড়াও খাবার ট্রেতে চিংড়ির খাদ্য গ্রহণের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে খাবার সরবরাহের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

সতর্কতা

> খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনভাবেই ঘেরে অতিরিক্ত জৈব পদার্থ না জমে।

> পরিমিত খাবার ঘেরে সরবরাহ করতে হবে, যাতে কোন খাবার অবশিষ্ট না থাকে। এতে চাষের ব্যয়ও কমে যাবে এবং ঘেরের পানি দূষণেরও সম্ভাবনা থাকবে না।

> খাদ্য প্রয়োগের পর থেকে আনুমানিক এক ঘণ্টা প্যাডেল হুইল চালানো যাবে না।

> বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক থাকলে ১-২ ঘণ্টা প্যাডেল তুইল চালানোর পর খাবার সরবরাহ করতে হবে।

ঘ. বাতাস/অক্সিজেন সরবরাহ

ক) ঘেরে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা ৩ পিপিএম এ নেমে এলে প্যাডেল তুইল চালিয়ে বাতাস সরবরাহ করতে হবে।

খ) জমাকৃত জৈব পদার্থসমূহ যাতে না পচে তাড়াতাড়ি প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করতে পারে, সেজন্য অতত দিনে একবার কয়েক ঘণ্টা পেডেল তুইল চালাতে হবে।

গ) পানিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহের ফলে অ্যামোনিয়াসহ অন্যান্য উদ্বায়ী গ্যাসসমূহ দূরীভূত হবে।

ঙ. পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন

ক) পানি সরবরাহের প্রয়োজন হলে জলাধারের পানি ফসটক্সিন দিয়ে ট্রিটমেন্ট করে ৩-৪ দিন পর ঘেরে সরবরাহ করতে হবে।

খ) ঘেরের পানি পরিবর্তন করা যাবে না।

গ) আবদ্ধ পদ্ধতিতে প্রবল বৃষ্টিপাতের সময় ঘেরের পানি উপচিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে এবং ঘেরের লবণাক্ততাও হ্রাস পেতে পারে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চতার কয়েক ইঞ্চি উপরে পাড়ের মাঝে আড়াআড়িভাবে কয়েকটি পিভিসি পাইপ বসিয়ে রাখতে হবে, যাতে বৃষ্টির কম লবণাক্ত পানি সহজেই পাইপের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে।

চ. চুন ও সার প্রয়োগ

ক) আবদ্ধ পদ্ধতিতে পানির পিএইচ এবং অ্যালকালিনিটি স্থিতিশীল রাখা অত্যন্ত জরুরি।

খ) পিএইচ ৭.৫ এর নিচে নেমে গেলে কিংবা সকাল ও বিকালের পিএইচ-এর পার্থক্য ০.৫ এর বেশি হলে অবশ্যই চুন প্রয়োগ করতে হবে। এ পর্যায়ে ১ কেজি/শতক হারে পাথুরে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

গ) পানির স্বচ্ছতা ৩৫ সেমি এর বেশি হলে ১০০ গ্রাম/শতক ইউরিয়া, ৫০ গ্রাম/শতক টিএসপি এবং ২৫ গ্রাম/শতক পটাশ প্রয়োগ করা যেতে পারে ।

ছ. চিংড়ির বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা

ক) চাষকালীন সময়ে সপ্তাহে একবার চিংড়ির বৃদ্ধি পরীক্ষা এবং দৈনিক অন্তত একবার চিংড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন ।

খ) খাবার প্রয়োগের এক ঘণ্টার পর চেক ট্রে চিংড়ির ওজন স্বাভাবিক আছে কিনা এবং চিংড়ির খাদ্যনালিতে পর্যাপ্ত খাদ্য আছে কিনা তা পরীক্ষা করা যেতে পারে ।

গ) এ সময়ে চিংড়ির গায়ে কোনো রোগের চিহ্ন আছে কিনা তাও পরীক্ষা করা যেতে পারে ।

ঘ) কোনো চিংড়ি পাড়ের কাছাকাছি স্থিরভাবে বসে থাকলে বুঝতে হবে ঘেরে কোন অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে । এমতাবস্থায়, অবস্থা স্বাভাবিক করার জন্য তড়িৎ পদক্ষেপ নিতে হবে এবং পাড়ে বসে থাকা চিংড়িটি ধরে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে ।

ঙ) রোগ প্রতিরোধের স্বার্থে পরিশোধন ব্যতীত কোনোক্রমেই এক ঘেরে ব্যবহৃত কোনো জিনিষপত্র অন্য ঘেরে ব্যবহার করা উচিত হবে না ।

জ. চিংড়ি আহরণ

ক) এই পদ্ধতির চাষকে পরিবেশ সহনীয় ও টেকসই পর্যায়ে রাখার নিমিত্ত চিংড়ি আহরণের জন্য ঘেরের পানি কোনোভাবেই বাইরে ছাড়া উচিত হবে না । যথাসম্ভব বেড় জাল ও ঝাঁকি জাল দিয়ে ঘেরের চিংড়ি আহরণ করতে হবে ।

খ) এই পদ্ধতিতে ১২০ দিন লালন করার পর প্রতিটি চিংড়ির গড় ওজন ৩০ গ্রাম এবং বাঁচার হার ৭৫% । হিসেবে প্রতি একরে মোট প্রায় ১৬০০ কেজি চিংড়ির উৎপাদন পাওয়া যাবে । শতকরা ২০ ভাগ জলাধারের আয়তন বিবেচনা করলে একর প্রতি উৎপাদন দাঁড়াবে প্রায় ১৫০ কেজি ।

ঝ. আয় ও ব্যয়

ক) প্রতি কেজি (প্রতিটি ৩০ গ্রাম) চিংড়ির বাজার মূল্য ৩৭৫-৪০০ টাকা হিসেবে উৎপাদিত চিংড়ির মোট মূল্য হবে প্রায় ৫.১০ লক্ষ টাকা ।

খ) প্রতি একরে সম্ভাব্য মোট উৎপাদন খরচ ২.১০ লক্ষ টাকা বাদ দিলে নিট মুনাফা হবে প্রায় ৩.০০ লক্ষ টাকা ।

রূপান্তরিত আবদ্ধ পদ্ধতির সুবিধা

ক) চাষের সময় চিংড়িতে ভাইরাস আক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকে । মজুদকৃত পোনার শরীরে ভাইরাসের অনুপস্থিতি নিশ্চিত হতে পারলে এই পদ্ধতিতে ভাইরাসমুক্ত চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব ।

খ) পানির গভীরতা বেশি থাকার ফলে তাপমাত্রা স্থিতিশীল থাকে, দ্রবীভূত অক্সিজেন বেশি থাকে, পানি দূষণ কম হয় ও চিংড়ির বসবাসের উপযোগী স্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ।

গ) কোনো কারণে চিংড়ি রোগাক্রান্ত হলে তা বাইরে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ থাকে না ।

ঘ) কোনো পানি পরিবর্তন না করার ফলে চিংড়ি তুলনামূলকভাবে কম পীড়নমুক্ত থাকে ।

রূপান্তরিত আবদ্ধ পদ্ধতির অসুবিধা

ক) অধিক অম্লযুক্ত মাটিতে এই পদ্ধতিতে চাষ করা যুক্তিযুক্ত হবে না ।

খ) দীর্ঘ সময় প্যাডেল হুইল ব্যবহারের ফলে খরচ কিছুটা বেশি হয় ।

গ) চুন ও রাসায়নিক সার তুলনামূলকভাবে বেশি লাগে ।

ঘ) চিংড়ির পোনার সাথে ভাইরাস থাকলে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয় না ।

পরামর্শ

- চিংড়ি আহরণের পর ঘেরের জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ পানি ও তলায় পুঞ্জিভূত জৈব পদার্থ বাইরে বের না করে পুকুরেই রিসাইকিং করার জন্য ফসলচক্রভিত্তিক চাষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে । এজন্য দ্বিতীয় ফসলে আবর্জনা ও উদ্ভিদভাজী মাছ চাষ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে ।
- অর্থনৈতিক দৃষ্টকোণ থেকে ফসলচক্রভিত্তিক চাষ ততটা লাভজনক না হলেও পরিবেশ সহনীয় ও টেকসই প্রযুক্তি হিসেবে রূপান্তরিত আবদ্ধ পদ্ধতির চাষে ফসলচক্রের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

ফসলচক্রভিত্তিক বাগদা ও গলদা চিংড়ি চাষ

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের ঘেরসমূহে পানির লবণাক্ততা ফেব্রুয়ারি হতে মে মাস পর্যন্ত বাড়তে থাকে । পক্ষান্তরে জুন হতে কমতে থাকে এবং আগস্ট হতে জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় স্বাদুপানি বিরাজ করে । পানির লবণাক্ততার উপর ভিত্তি করে ঘেরসমূহে ফেব্রুয়ারি হতে জুন-জুলাই মাস পর্যন্ত বাগদা চিংড়ি চাষ এবং পরবর্তীতে ধান চাষ করা হয় বা পতিত থাকে । এমতাবস্থায় বাগদা চাষের পর পরই একই ঘেরে ধান/সাদা মাছ বা গলদা চিংড়ি চাষ করা যায় । এইভাবে একই ঘেরে একটি ফসলের পরে অপর জাতের অন্য একটি ফসলের চাষ করাই হচ্ছে । ফসলচক্রভিত্তিক চাষ ব্যবস্থা । এক্ষেত্রে উপকূলীয় অঞ্চলের সম্পদের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহারের ফলে একক এলাকায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং ঘেরের পরিবেশ সমুন্নত থাকে । কৃষি ক্ষেত্রে ফসলচক্রের ভিত্তিতে চাষ পদ্ধতি একটি প্রতিষ্ঠিত কৌশল ।

ফসলচক্রের উদ্দেশ্য

ফসলচক্র ঘেরে চাষ করলে সারা বছর ঘের মাছ চাষে ব্যবহার করা যায় । ফসলচক্রের কারণে এক ফসলের রোগ ও পরজীবী অন্য ফসলে আক্রমণ করে না বলে ঘেরের পরিবেশ সমুন্নত থাকে এবং রোগের প্রাদুর্ভাব কমে যায় । ফসলচক্র মোতাবেক চিংড়ি চাষ করলে একক এলাকায় উৎপাদন তথা মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় । ফসলচক্র অনুযায়ী চাষ করলে আর্থিকভাবে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায় ।

ফসলচক্রের প্রয়োজনীয়তা

ঘেরে ফসলচক্র অনুযায়ী চাষ করলে এক ফসলের রোগ ও পরজীবী উপযুক্ত বাহক না পাওয়ার কারণে মারা যায় এবং তাদের জীবনচক্র ব্যাহত হয় । ফসলচক্র অনুযায়ী চাষ করলে এক ফসলের বর্জ্য পদার্থ অন্য ফসলদ্বারা কমে আসে । আবার এক ফসলের বর্জ্য অন্য ফসলের খাবার পুষ্টি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে । মাটিতে আটকে পড়া পুষ্টি উপাদান সহজে বিমুক্ত হয় এবং মাটিতে জমানো দূষিত গ্যাস ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় পদার্থ মুক্ত হয়, ফলে মাটি ও পানির প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় । আর মাটি ও পানির অবস্থা (পরিবেশ) ভাল থাকে বলে মাছ/চিংড়ির বাস্থ্য ভালো থাকে । তাই একটি ভালো উৎপাদন পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায় ।

২০২২

উপকূলীয় অঞ্চলে ফসলচক্রের সম্ভাব্য ধরন

উপকূলীয় অঞ্চলের ঘের/পুকুরসমূহে কোন ধরনের ফসলচক্র করতে হবে তা নির্ভর করে সার্বিকভাবে ঐ ঘেরের অবস্থান, উপযুক্ত পানির প্রাপ্যতা এবং ঘের/পুকুরের অবকাঠামোগত অবস্থার উপর। উপরোক্ত বিষয়াদি বিবেচনায় রেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন ধরনের ফসলচক্র অধিক উপযুক্ত। ফসলচক্র অনুযায়ী বাগদা ও গলদা চাষ পদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হলো।

ক. ঘের নির্বাচন

উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততার উপর নির্ভর করে ফসলচক্র অনুযায়ী বাগদা ও গলদা চিংড়ি চাষ একটি সময়াপযোগী, কার্যকর ও অপরিহার্য চাষ পদ্ধতি। এক্ষেত্রে, জোয়ারের পানিদ্বারা সহজে পানি পরিবর্তন করা যায় এমন ঘের নির্বাচন করতে হবে। ঘেরের আয়তন ০.৫-১.০ হেক্টর হলে ব্যবস্থাপনা সহজ হবে। ঘেরের গড় গভীরতা ১.০-১.২ মিটার হলে ভালো হয় এবং ঘেরের তলদেশ সমান এবং পাড় উঁচু ও মজবুত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

খ. ঘের শুকানো ও মেরামত

ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঘেরের পানি শুকিয়ে তলদেশে পর্যাপ্ত সূর্যকিরণ লাগাতে হবে। ঘেরের পাড় ও তলদেশ ভালোভাবে মেরামত করতে হবে যাতে পানি চুঁইয়ে না যায়। ঘেরের যে কোনো একপাশে বাঁশের চটা ও নাইলন নেট দিয়ে বা মাটির বাঁধ দিয়ে ঘেরের আয়তনের ১০-১৫ ভাগ আকারের নার্সারি তৈরি করতে হবে।

গ. ঘের প্রস্তুতি

মাটির পিএইচ-এর উপর ভিত্তি করে ঘেরে পরিমিত হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। মাটির পিএইচ ও চুনের প্রয়োগ মাত্রা নিচে উল্লেখ করা হলো।

মাটির পিএইচ মাত্রা	চুন প্রয়োগ মাত্রা (কেজি/শতাংশ)
৬.৮-৬.৫	১-২
৬.৫-৬.৪	২-৪
৬.৪-৬.০	৪-৫

ঘের প্রস্তুতকালীন সময়ে ঘেরের তলদেশে উপরের ছক মোতাবেক বা শতকে ১ কেজি হারে পাথুরে চুন ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগের ৩-৭ দিন পরে ঘন মশারি নেট দিয়ে স্ক্রিনিং করে ঘেরে জোয়ারের পানি ঢুকাতে হবে, যাতে অবাঞ্ছিত ও রাক্ষুসে মাছ ঘেরে প্রবেশ করতে না পারে। অতঃপর প্রতি শতকে ১০০ গ্রাম হারে ইউরিয়া, ৫০ গ্রাম হারে টিএসপি এবং ২৫ গ্রাম হারে পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের ৫-৭ দিনের মধ্যে ঘেরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য (প্ল্যাংকটন) উৎপন্ন হবে। যদি ৫-৭ দিনের মধ্যে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন না হয় তাহলে পুনরায় অর্ধেক মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে।

ঙ. বাগদা পোনা মজুদ ও ব্যবস্থাপনা

সার প্রয়োগের ৭ দিন পরে মজুদ পুকুরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতি শতকে ১৬০-২০০টি বাগদা পোনা পরিমিত অভ্যস্তকরণ করে নার্সারিতে মজুদ করতে হবে। পোনা মজুদের পরের দিন হতে নিচের সারণি মোতাবেক খাবার

সকাল-সন্ধ্যায় প্রয়োগ করতে হবে। নার্সারিতে পোনা মজুদের ১৪-২১ দিন পরে নার্সারি উন্মুক্ত করে আঙ্গুলীপোনা লালন পুকুরে অবমুক্ত করতে হবে। ঘেরে পানি ও চিংড়ির স্বাস্থ্য প্রতি ৭ দিন অন্তর পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং কোনো সমস্যা হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে হবে। পানির পিএইচ ৭.৫ এর নিচে নামলে বা সকাল সন্ধ্যার মধ্যে পানির পিএইচ এর পার্থক্য ০.৫ এর বেশি হলে প্রতি হেক্টরে ৮০-৯০ কেজি ডলো চুন পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। পানিতে প্রাকৃতিক খাবার অপর্যাপ্ত হলে বা পানির স্বচ্ছতা ৩৫ সেমি এর উপরে হলে প্রতি হেক্টরে ১২-১৫ কেজি ইউরিয়া, ১৫-১৮ কেজি টিএসপি এবং ৩-৪ কেজি পটাশ সার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি অমাবস্যা-পূর্ণিমায় জোয়ারের পরিশ্রুত পানিদ্বারা ৩০% পানি পরিবর্তন করতে হবে। পানি পরিবর্তনের পরে প্রয়োজনে প্রতি হেক্টরে ৭৫-৮০ কেজি ডলো চুন পানিতে গুলে প্রয়োগ করতে হবে।

চ. বাগদার খাবার প্রয়োগ ও আহরণ

বাগদার আশানুরূপ উৎপাদন পেতে হলে প্রয়োজনীয় খাবার প্রয়োগ করতে হবে। নিচের সারণি মোতাবেক প্রয়োজনীয় উপাদান মিশিয়ে খাবার তৈরি করে সকাল ও সন্ধ্যায় প্রয়োগ করলে ভালো ফলাফল আশা করা যায়। খাবার তৈরির উপাদান এবং সকাল ও সন্ধ্যায় প্রয়োগমাত্রা নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো।

সারণি: বাগদা চিংড়ির খাবার ও প্রয়োগমাত্রা

সপ্তাহ	খাবারের পরিমাণ (দৈহিক ওজনের)	খাবারে প্রকার/ধরন	তৈরিকৃত খাবারের উপাদানের অনুপাত
১ম সপ্তাহ	১০০%	চিংড়ি নার্সারি খাবার	-
২য় ,,	৬০%	চিংড়ি নার্সারি খাবার	-
৩য় ,,	৩০%	চিংড়ি নার্সারি খাবার	-
৪র্থ সপ্তাহ হতে আহরণ পর্যন্ত	৩-৫%	তৈরিকৃত খাবার (৩০% প্রোটিন)	৩০% অটোকুঁড়া ৪০% ফিসমিল ১৫% সরিষার খৈল ৫% শুকানো রক্ত ৫% গমের ভুষি ও ৫% আটা

প্রয়োজনীয় খৈল আগের দিন বেশি পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরের দিন খৈল এর উপরের পানি ফেলে দিয়ে তার সাথে অন্যান্য উপাদান মিশাতে হবে। অতঃপর খাবার রোদ্রে শুকিয়ে দানা তৈরি করে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে বা ম- তৈরি করে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রয়োগ করতে হবে। খাবার প্রয়োগে সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে খাবার বেশি না হয়। খাবার বেশি হলে তা পচে ঘেরের পানি নষ্ট হয়। তাই খাবারের ট্রে ব্যবহার করে মাঝে মাঝে খাবার গ্রহণের মাত্রা লক্ষ্য করতে হবে। উল্লিখিত পদ্ধতিতে পরিচর্যা করলে ৯০-১০০ দিনের মধ্যে বাগদা চিংড়ি বাজারজাতকরণের উপযোগী হবে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার জোয়ারের সময় ঘেরে ট্র্যাপ দিয়ে বা ঝাকি জাল ফেলে বড় চিংড়ি আহরণ (সিলেকটিভ হার্ভেস্টিং) করতে হবে।

২০২২

ছ. গলদার পোনা মজুদ ও ব্যবস্থাপনা

বাগদা চিংড়ি আহরণের পাশাপাশি ঘেরের নার্সারি পুনঃস্থাপন করতে হবে। জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে প্রতি শতকের জন্য প্রয়োজনীয় ১০০-১২০ টি গলদার পোনা নার্সারিতে মজুদ করে ২১-৩০ দিন নার্সারিতে লালন করতে হবে এবং পরিমিত খাবার দিতে হবে। যখন বাগদা চিংড়ি সম্পূর্ণ আহরণ শেষ হবে তখন নার্সারি উন্মুক্ত করে গলদার আঙুলী পোনা লালন পুকুরে অবমুক্ত করতে হবে। বাগদা চিংড়ির ন্যায় গলদা চিংড়িতেও যথারীতি খাবার প্রয়োগ করতে হবে। গলদার স্বাস্থ্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি ঘের শুকিয়ে গলদা চিংড়ি আহরণ করতে হবে।

জ. সম্ভাব্য আয়-ব্যয়

এই পদ্ধতিতে ফসল চক্রের ভিত্তিতে বাগদা ও গলদা চিংড়ি চাষ করলে প্রতি হেক্টরে ৪৫০-৫০০ কেজি বাগদা ও ৪০০-৪৫০ কেজি গলদা চিংড়ির উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। এখানে মোট উৎপাদন খরচ হবে প্রায় ১.৯৫ লক্ষ টাকা। এবং বাগদা ও গলদা চিংড়ি বিক্রয় থেকে আয় হবে প্রায় ৩.৪৫ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে প্রকৃত মুনাফা হবে প্রায় ১.৫০ লক্ষ টাকা।

ঘেরে বাগদা চিংড়ি ও মাছের মিশ্র চাষ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তৃত লোনাপানি এলাকায় বিভিন্ন মৌসুমে ব্যাপক লবণাক্ততার পার্থক্য দেখা দেয়। এই লবণাক্ততার তারতম্য এলাকা ভেদে ২৪-১৮ পিপিটি হতে ০ (শূন্য) পিপিটিতে চলে আসে, যা বছরের প্রায় ৩-৭ মাস পর্যন্ত বিরাজমান থাকে। চিংড়ি ঘের/খামারসমূহে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে সকল স্থানে লবণাক্ততা ১২ পিপিটির নিচে দীর্ঘদিন বিরাজ করে সেই সকল স্থানে বাগদা চিংড়ির সংগে নির্বাচিত লোনা ও মিঠা পানির মাছের মিশ্র চাষ একটি আদর্শ পদ্ধতি হতে পারে। বর্তমানে এতদঞ্চলের খামারগুলোতে সনাতন পদ্ধতিতে চাষের জন্য শুধুমাত্র বাগদা এবং গলদা চিংড়ির পোনা ব্যাপকভাবে মজুদ করা হয়। খামারগুলোতে পানি প্রবেশ অথবা পরিবর্তনের সময় অপ্রত্যাশিত অনুপ্রবেশের কারণে অন্যান্য প্রজাতির চিংড়ি এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন মাছও একই সংঙ্গে খামারে প্রবেশ করে। ফলে এ সমস্ত মাছ। ও চিংড়ির মিশ্রচাষে অনেক সময় ভালো উৎপাদন পাওয়া যায়। অনুপ্রবেশকৃত প্রজাতিগুলো হলো

চিংড়ি: *Peneaus indicus, P. Merguiensis, Metapenaeus monoceros, M. Brevicornis,* ইত্যাদি।

মাছ: *Liza parsia, L.tade, L. Macrocephalus, Mugil cephalus, Rhinomugil corsula, Oreochromis spp, Scatophagus argus,*ইত্যাদি।

মাছ/চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর প্রজাতিসমূহ হলো

Lates calcarifer, Mystus:engra, Pomdasys hasta, ইত্যাদি।

মিশ্রচাষ পদ্ধতিসমূহ

ক) বাগদা চিংড়ি ও পারসে মাছের মিশ্রচাষ পদ্ধতি, এবং

খ) বাগদা চিংড়ির ঘেরে পানির লবণাক্ততা কমার সাথে সাথে থাই পাঙ্গাস ও গিফট তেলাপিয়া মাছের মিশ্রচাষ একটি নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি হিসেবে নির্বাচন করা যেতে পারে।

২০২২

মিশ্রচাষের বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক) পারসে মাছ দ্রুত সাঁতার দিতে সক্ষম হওয়ায় পানি আলোড়ন সৃষ্টির মাধ্যমে পুঞ্জিভূত পুষ্টি উপাদান ভালোভাবে মিশ্রিত হয়ে পর্যাপ্ত প্ল্যাংকটনিক খাবার তৈরিতে সহায়তা করে।

খ) থাই পাঙ্গাস ও গিফট তেলাপিয়া ২৪ পিপিটি পর্যন্ত লবণাক্ততা সহজেই সহ্য করতে পারে এবং ১০ পিপিটিতে দেহ বর্ধন অক্ষুন্ন থাকে।

গ) থাই পাঙ্গাস পর্যাপ্ত খাবার সরবরাহ থাকলে চিংড়ির সংঙ্গে খাবার নিয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকে। উপরলতু থাই পাঙ্গাস পচনশীল খাবার খেয়ে তলদেশের মাটির উন্নয়ন ঘটায়।

ঘ) মিশ্রচাষের মাধ্যমে খামারের পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থানগত অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে রোগ-বালাইয়ের প্রার্দুভাব প্রতরোধ করা সম্ভব হয়।

পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতপ্রণালি

ক) জোয়ারের পানি উঠানামা করে এমন ঘের নির্বাচন করতে হবে।

খ) ঘেরের আকার অবশ্যই ১-৪ হেক্টরের মধ্যে হওয়া উচিত।

গ) জোয়ারের পানি হেঁকে প্রবেশ করাতে হবে। পানির গড় গভীরতা ১ মিটার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ঘ) সূর্যের কিরণে ঘেরের তলদেশের মাটি শুকিয়ে নিতে হবে।

ঙ) মাটির পিএইচ পরীক্ষা করে সে অনুযায়ী নির্ধারিত মাত্রায় পাথুরে চুন অথবা ডলো চুন প্রয়োগ করতে হবে। যেমন:- পিএইচ মান ৬.০ হলে শতকে ১.৫ কেজি হারে এবং পিএইচ মান ৬.৫ এর ক্ষেত্রে শতকে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

চ) মাটির জৈব উপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে প্রয়োজনবাধে প্রতি শতকে ২ কেজি সরিষার খৈল পচা গোবর জৈব সার হিসেবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ সময় রাসায়নিক সার প্রতি শতকে ২৫-৩০ গ্রাম হারে ইউরিয়া ও ৩০--৩৫ গ্রাম হারে টিএসপি অথবা ৯০ গ্রাম হারে ডিএপি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ছ) সাত দিনের মধ্যে ঘেরের পানিতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাকৃতিক খাবার তৈরি হলে পোনা মজুদ করতে হবে।

পোনা সংগ্রহ

ক) নার্সারিতে প্রতিপালনের জন্য হ্যাচারি উৎপাদিত সুস্থ ও সবল বাগদা চিংড়ির পোস্ট লার্ভা বা পিএল (গড়। দৈর্ঘ্য ১.৫ সেমি ও গড় ওজন ০.০০৫ গ্রাম) নির্বাচন করা যেতে পারে।

খ) থাই পাঙ্গাসের বড় পোনা (গড় দৈর্ঘ্য ৫.৫ সেমি ও গড় ওজন ৪.০ গ্রাম) মজুদে ভালো বর্ধন পাওয়া যাবে।

গ) গিফট তেলাপিয়ার পোনা (গড় দৈর্ঘ্য ৫-৭ সেমি ও গড় ওজন ৪.০ গ্রাম) নির্ভরযোগ্য হ্যাচারি হতে সংগ্রহ করে মজুদ করলে কাঙ্খিত বাচার হার ও ভালো উৎপাদন পাওয়া যেতে পারে।

চিংড়ির পোনার নার্সারি প্রতিপালন

ক) ঘের/খামারের পরিচ্ছন্ন স্থানে ঘের প্রস্তুতির সময়েই নাইলনের সূক্ষ্ম মেসের জাল দিয়ে ৪০ বর্গমিটার (এক শতাংশ) এলাকা ঘিরে নিয়ে একটি নার্সারি তৈরি করতে হবে।

খ) পানি মজুদ উপযোগী হলে, প্রতি বর্গমিটারে ৬০০ টি (২৪০০০ টি/শতক) বা এর কম সংখ্যক পোনা মজুদ করতে হবে।

২০২২

গ) চিংড়ি পোনা ছাড়ার পরদিন থেকে প্রথম সপ্তাহে মোট দেহ ওজনের ১০০% ভাগ হারে বাণিজ্যিক চিংড়ি খাদ্য স্টার্টার-১ দিতে হবে এবং পরবর্তী সপ্তাহে ক্রমাগত কমিয়ে ৫০% ও ৩০% হারে একমাস প্রয়োগ করতে হবে।

ঘ) পোনা প্রতিপালন ২১ দিন হলে ঘেরে ছেড়ে দিতে হবে।

সুবিধা

ক) নার্সারির মধ্যে খাবার প্রয়োগে পোনা সহজেই খাবার খেতে পারে।

খ) বিভিন্ন কারণে পোনা নষ্ট হওয়া বা মৃত্যুর হতে রক্ষা পেয়ে থাকে।

চাষ ব্যবস্থাপনা

চিংড়ি অত্যন্ত সংবেদনশীল প্রাণী হওয়ায় এর মিশ্রচাষ যথাযথ নিয়মে করা বাঞ্ছনীয়। মজুদকরণ থেকে আহরণ করা পর্যত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পোনা মজুদকরণ

ক) প্রতি হেক্টরে নার্সারিতে ২১ দিনের প্রতিপালিত বাগদা চিংড়ির পোনা (০.২-০.৪ গ্রাম) ২০,০০০ টি (শতকে ৮০ টি)-র সাথে পারসে পোনা (১.০ গ্রাম) ৫,০০০ টি (শতকে ২০ টি) ছাড়া যেতে পারে।

খ) প্রতি হেক্টরে নার্সারিতে প্রতিপালিত ২১ দিনের বাগদা চিংড়ির পোনা (০.২-০.৪ গ্রাম), থাই পাঙ্গাসের পোনা (৪.০-৫.০ গ্রাম) ও গিফট তেলাপিয়ার পোনা (০.৫-১.০ গ্রাম) সমপরিমাণে (১৪১ঃ১ অনুপাতে) শতকে ৬০ টি হিসেবে প্রতি হেক্টরে মোট ১৫,০০০ টি পোনা মজুদ করা যেতে পারে।

খাদ্য প্রয়োগ ও পরিচর্যা

ক) মজুদ পুকুরে/ঘেরে স্থানান্তরের পর স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত খাদ্য উপাদানসমূহ, যেমনঃ ফিসমিল- ৩০%, সরিষার খৈল- ২৫% ও চালের কুঁড়া- ৪৫% দিয়ে খাবার তৈরি করে চিংড়ি ও মাছের মোট দেহ ওজনের ৩ ৫% হারে প্রয়োগ করতে হবে।

খ) খাবার প্রতিদিন ভারে এবং সন্ধ্যায় দু বারে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি সপ্তাহে ঝাকি জালের সাহায্যে চিংড়ি ও মাছের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

পানি ব্যবস্থাপনা

ক) প্রয়োজন সাপেক্ষে অমাবস্যা-পূর্ণিমার সময় ৩০ শতাংশ পানি প্রবেশ বা পরিবর্তন করে নিতে হবে। এতে করে খামারে পানির গুণগতমান সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

খ) পানির স্বচ্ছতা ৩৫ সেমি এর বেশি হলে, প্রতি হেক্টরে ৩০ কেজি ইউরিয়া ও টিএসপি (৩ঃ১ অনুপাতে) প্রয়োগ করা যেতে পারে।

গ) এছাড়াও পানির লবণাক্ততা, পিএইচ ও তাপমাত্রা নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রেখে কোনো ব্যতিক্রম ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঘ) নিয়মিত জলজ আগাছা এবং শেওলা পরিষ্কার করতে হবে।

চিংড়ির আহরণ

ক) তিন-চার মাস লালনের পর অথবা বাজারজাত উপযোগী হলেই চিংড়ি আহরণ শুরু করতে হবে।

খ) সাধারণত গিফ্ট তেলাপিয়া ৪ মাসে এবং পারসে ও পাঙ্গাস মাছ ১০ মাস বা ততাধিক সময়ে বিক্রয়যোগ্য হয়।

গ) এ সময়ে ঘের শুকিয়ে সমুদয় মাছ আহরণ করা বাঞ্ছনীয়।

কোনো স্থানের লবণাক্ততার উপর নির্ভর করে চিংড়ির দ্বিতীয় ফসল চাষ করা যেতে পারে। উপযুক্ত লবণাক্ততা থাকলে, দ্বিতীয় দফায় সমান সংখ্যক বাগদা চিংড়ির পোনা মজুদ করতে হবে এবং প্রথমবারের মতই ঘের ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

উৎপাদন

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উন্নত মিশ্রচাষ পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ির বাঁচার হার ৬০-৭০% এবং গড় ওজন ৪৫-৬০ গ্রাম হলে হেক্টর প্রতি মোট ১৩৫-২১০ কেজি চিংড়ি আহরণ করা সম্ভব। আহরণের সময় একই সঙ্গে প্রতি হেক্টরে পারসে, থাই পাঙ্গাস ও গিফট তেলাপিয়া যথাক্রমে ৩০০, ১৫০০ . ও ৫০০ কেজি মাছ উৎপাদন পাওয়া সম্ভব।

সমস্যা

ক) চিংড়ির জন্য পরিমিত খাবার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। অতিরিক্ত খাবার পানি দূষণের কারণ হতে পারে।

খ) থাই পাঙ্গাস মাছের জন্য পর্যাপ্ত খাবার নিশ্চিত করতে হবে। খাবার ঘাটতি হলে থাই পাঙ্গাসের উৎপাদন ব্যহত হবে।

গ) অতি খরায় অথবা গভীরতা কম থাকলে, পানি অস্বাভাবিক গরম এবং অতিবর্ষণে পানির লবণাক্ততা দ্রুত কমে যেতে পারে।

ঘ) চিংড়ি ও মাছের রোগ দেখা দিতে পারে।

পরামর্শ

- অবশ্যই নিয়মিতভাবে পরিমাণ অনুযায়ী খাবার দিতে হবে।
- প্রয়োজনে পানি পরিবর্তন করতে হবে এবং ঘেরের পানির গভীরতা বজায় রাখতে হবে।
- চিংড়ি এবং মাছের স্বাস্থ্য নিয়মিত পর্যবেণ করতে হবে।
- চিংড়ি বাজারজাতকরণ উপযোগী হওয়া মাত্র সেগুলো আহরণ করতে হবে।

সম্ভাব্য আয়-ব্যয়

বাগদা চিংড়ি ও পারসে মাছের মিশ্রচাষ এবং বাগদা চিংড়ি ও অন্যান্য মাছের মিশ্রচাষের ফলে হেক্টর প্রতি আয়, ব্যয় ও মুনাফা নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

মিশ্রচাষ পদ্ধতি	ব্যয় (টাকা)	আয় (টাকা)	মুনাফা (টাকা)	অনুপাত
বাগদা চিংড়ি ও পারসে মাছ	৯২,৬০০/-	৩,২৮,৫০০/-	২,৩৫,৯০০/-	১ ঃ ২.৫৫
বাগদা চিংড়ি, থাই পাঙ্গাস ও গিফট তেলাপিয়া	৮৪,১০০/-	১,৯০,৩৭৫/-	১,০৬,২৭৫/-	১ ঃ ২.৫৬

ধান ক্ষেতে চিংড়ি চাষ

ধান ক্ষেতে চিংড়ি চাষের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) একই সময়ে একই জমিতে দুটি ফসল পাওয়া যায় ।

খ) অল্প শ্রম ও অল্প খরচ হওয়ার ফলে আয় বেশি হয় ।

গ) চিংড়ি ধান ক্ষেতের ছোট ছোট আগাছা খেয়ে আগাছা দমনে সহায়তা করে ।

ঘ) চিংড়ির মল ধানের সার হিসেবে কাজ করে ।

ঙ) চিংড়ি ধানের অনেক পোকা খেয়ে কীটনাশক প্রয়োগর ব্যয় কমায় ও পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখে ।

চ) ধানের ফলন শতকরা প্রায় ১০ ভাগ বৃদ্ধি পায় ।

ছ) চিংড়িকে সম্পূরক খাদ্য না দিলেও চলে ।

ক. জমি নির্বাচন

সব ধরনের জমিতে ধানের সাথে চিংড়ি চাষ লাভজনক নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে–

ক) জমিতে অন্তত ৩-৪ মাস সব সময় ১০-১৫ সেমি (৪-৮ ইঞ্চি) পানি থাকতে হবে ।

চিত্র : জমি নির্বাচন

খ) এঁটেল বা দোআঁশ মাটি সবচেয়ে ভালো, কারণ এর পানি ধারণক্ষমতা সবচেয়ে বেশি ।

গ) জমিটি বন্যামুক্ত হতে হবে ।

ঘ) জমির অবস্থান বাড়ির কাছাকাছি হলে ভালো হয় । কারণ এতে ব্যবস্থাপনায় অনেক সুবিধ বধা হয় ।

ঙ) আইল উঁচু করে বাধার কারণে পানি চলাচল বন্ধ হয়ে অন্য কৃষকের সমস্যা সৃষ্টি হবে কিনা তা বিবেচ-নায় আনতে হবে ।

চ) ২/৩ জন কৃষক মিলে এক সাথে ধানক্ষেতে মাছ চাষ করার ক্ষেত্রে শুরুতেই একটি চুক্তি করে নেয়া উচিত ।

চিত্র: ধানক্ষেত

২০২২

খ. জমি প্রস্তুতকরণ

ধান ক্ষেতে চিংড়ি চাষের জন্য জমির প্রস্তুতি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জমির প্রস্তুতি যত ভালো হবে, তত বেশি ধান ও চিংড়ি উৎপাদন হবে। জমির প্রস্তুতির সময় যে বিষয়গুলো মনে রাখা প্রয়োজন তা হলো

ক) জমির আয়তন : ধান ক্ষেতে চিংড়ি চাষের জন্য জমির আয়তন ৩০-১০০ শতক হলে ভালো হয়।

চিত্র : ঘেরের পাড় মেরামত

খ) আইল উঁচু : স্থানীয়ভাবে বন্যায় যে পরিমাণ পানি হয় তার চেয়ে ১২-১৮ ইঞ্চি উঁচু করে আইল বাঁধতে হবে। জমির আইল অবশ্যই মজবুত হওয়া প্রয়োজন যাতে পানির চাপে ভেঙে না যায়।

গ. গর্ত ও নালা খনন

ক) জমিতে আগে থেকেই যদি গর্ত না থাকে তবে নতুন করে গর্ত করতে হবে। জমির যে দিকে ঢালু সেদিকে এক কোণে গর্ত করা সুবিধাজনক।

খ) মোট জমির শতকরা ৪-৬ ভাগের বেশি গর্ত হওয়া উচিত নয়। যেমন- ৫০ শতাংশের একটি জমির জন্য ২-৩ শতাংশ গর্ত হলেই যথেষ্ট।

গ) গর্তের গভীরতা ২-৩ ফুটের বেশি হওয়া উচিত নয়। গভীরতা বেশি হলে চিংড়ি গর্ত থেকে ধান ক্ষেতে যাবে না, ফলে চিংড়ির বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে কম হবে।

ঘ) সমস্ত ক্ষেতে চিংড়ি চলাচল করার জন্য এক বা একাধিক নালা করা প্রয়োজন। নালার সাথে গর্তের সরাসরি সংযোগ থাকতে হবে।

ঙ) নালাগুলো ১-১.৫ ফুট চওড়া এবং ১-১.৫ ফুট গভীর হতে হবে।

চিত্র : জমির বাইরে গর্ত খনন

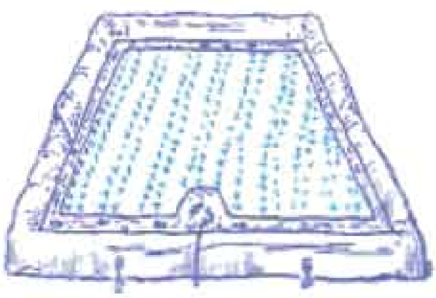

২০২২

চিত্র : জমির চারপাশে গর্ত খনন

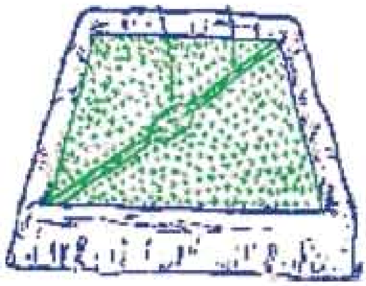

চিত্র: জমির মাঝখানে গর্ত খনন

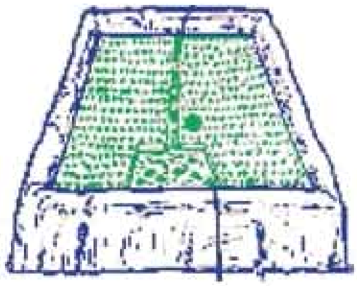

চিত্র: জমির একদিকে গর্ত খনন

জমিতে গর্ত ও নালা করার উদ্দেশ্যসমূহ হলো

ক) ক্ষেতে সব সময় চিংড়ির জন্য পানি ধরে রাখা। কোনো কারণে ক্ষেতে পানি কমে গেলে চিংড়িগুলো নালার সাহায্যে গর্তে এসে আশ্রয় নিতে পারবে।

খ) ক্ষেতের পানি খুব গরম হয়ে গেলে চিংড়ি নালা ও গর্তের ঠান্ডা পানিতে আশ্রয় নিতে পারবে।

গ) ধান ক্ষেতে খুব বেশি পোকার আক্রমণ হলে ক্ষেতের পানি শুকিয়ে মাছগুলোকে গর্তে নিয়ে কীটনাশক প্রয়োগ করা যায়।

ঘ) চিংড়ি ধরার সময় চিংড়িকে একত্রিত করার জন্য নালা ও গর্ত ব্যবহৃত হয়।

খ. ধান ব্যবস্থাপনা

মূলত জমি প্রস্তুতির উপর ধান ও চিংড়ির ফলন নির্ভর করে। ব্যবস্থাপনা যত বেশি কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে, ফলন তত ভালো হবে। সুতরাং ধান ও চিংড়ির ব্যবস্থাপনার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। ধান ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হলো

ক) ধানের জাত নির্বাচন

সব জাতের ধানের সাথে চিংড়ি চাষ করা যায়, তবে উচ্চ ফলনশীল যে সব জাতের ধান মাঝারি ধরনের লম্বা হয়। সে সব জাতের ধান চিংড়ি চাষের জন্য বেশি সুবিধাজনক। ধানের পানি সহ্য ক্ষমতা বেশি থাকতে হবে। কয়েকটি উপযোগী ধানের জাত হলো- আমন মৌসুমে বিআর-১১, বিআর-৩, বিআর-৩০ এবং বোরো মৌসুমে বিআর ১৬, বিআর-১৪ ইত্যাদি।

চিত্র: ধানের চারা রোপণ

খ) জমি আগাছামুক্তকরণ

ধানের ভালো ফলন পাওয়ার জন্য ধান লাগানোর ৪০-৪৫ দিন পর্যন্ত জমি সম্পূর্ণ আগাছামুক্ত রাখতে হবে। চিংড়ি কচি আগাছার পাতা খেয়ে আগাছা দমনে সহায়তা করে থাকে। তথাপি জমিতে বেশি আগাছা জন্মালে তা অবশ্যই তুলে ফেলতে হবে। আগাছা পরিষ্কারের সময় পানি খুব ঘোলা হলে অনেক সময় ছোট ছোট চিংড়ি মারা যেতে পারে। তাই সমস্ত জমির আগাছা ১ দিনে না তুলে ২/৩ দিনে তোলা উচিত।

চিত্রঃ আগাছামুক্ত জমি

গ) ধানের পোকা দমন

ধান ক্ষেতে সবসময় কিছু না কিছু পোকা থাকে। এসব পোকার সবগুলোই ধানের জন্য ক্ষতিকর নয়। এসব পোকার মধ্যে কিছু উপকারী পোকা আছে, যেগুলো ধানের ক্ষতিকর পোকাকে খেয়ে ধানের উপকার করে থাকে। সুতরাং ধান ক্ষেতে কিছু পোকা দেখা মাত্রই কীটনাশক প্রয়োগ করা উচিত নয়। ধানে কি পরিমাণ পোকার আক্রমণ হয়েছে সেটা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। সবসময় চেষ্টা করা উচিত যাতে ধানে ক্ষতিকর পোকার উপস্থিতির পরিমাণ কম থাকে। সেজন্য নিচের ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে

- ধান ক্ষেতে কঞ্চি বা ডাল পুঁতে পাখি বসার ব্যবস্থা করা।
- রাতের বেলা আলোর ফাঁদ পাতা।
- পোকা ধরার জাল বা হাত দিয়ে পোকার ডিম সংগ্রহ করা।
- জমিতে সবসময় পরিমাণ মতো পানি রাখা।
- সুষম ও সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ করা।
- ধান গাছ যখন আইলের চেয়ে ছোট থাকে তখন পানি সেচ দিয়ে ১/২ ঘণ্টার জন্য ধান গাছগুলোকে ডুবিয়ে দিলে ধানের পোকা পানিতে ভেসে উঠবে এবং চিংড়ি সে পোকাগুলো খেতে পারবে।

- যদি পোকার আক্রমণের তীব্রতা খুব বেশি হয় এবং কীটনাশক প্রয়োগ আবশ্যক হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে ক্ষেতের পানি সেচে চিংড়িগুলোকে গর্তে এনে কীটনাশক প্রয়োগ করা যায়। ৫-৬ দিন পর কীটনাশকের বিষক্রিয়া কমে গেলে ক্ষেতে পানি ঢুকিয়ে চিংড়িগুলোকে ক্ষেতে নিতে হবে।

চিত্রঃ পোকামাকড় দমন

ঙ. চিংড়ি ব্যবস্থাপনা

ধান ক্ষেতে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে চিংড়ি ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো

ক) চিংড়ি মজুদ

ধান ক্ষেতে চিংড়ি চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করতে হবে। ধান ক্ষেতে চিংড়ি চাষের জন্য প্রতি বর্গ মিটারে ৩টি করে চিংড়ি মজুদ করা যেতে পারে।

চিত্র : চিংড়ি অভ্যস্তকরণ

চিত্র : চিংড়ি অবমুক্তকরণ

খ) চিংড়ি চাষের সময়

লোনা পানিতে মার্চ থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত চিংড়ি চাষের জন্য সর্বোত্তম সময়।

গ) চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য

ধানক্ষেতে চিংড়ি চাষে কোনো বাড়তি খাবার না দিলেও চিংড়ি উৎপাদিত হতে পারে। চিংড়ি ধান ক্ষেতের শেওলা, পোকা-মাকড় ও পচনশীল দ্রব্যাদি খেয়ে থাকে। তবে কিছু খাবার প্রয়োগ করলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এমনকি খাদ্য প্রয়োগের ফলে চিংড়ির উৎপাদন ২ গুণেরও অধিক করা যেতে পারে। এর জন্য শুরুতে চালের কুঁড়া ও গোবর ১৪৩ অনুপাতে মিশিয়ে বলের আকারে হেক্টর প্রতি ১০ কেজি পরিমাণে প্রতি ৭ দিন অন্তর অন্তর পরিখা ও গর্তে দিতে হবে। চিংড়ি ছাড়ার মাস খানেক পর থেকে মোট চিংড়ির ওজন অনুমান করে ওজনের ৩-৫ শতাংশে হারে খৈল ও ভুষি বা কুঁড়া ১৪১ অনুপাতে মিশিয়ে ১ দিন ভিজিয়ে রেখে গমের ভুষি বা চাউলের কুঁড়ার সাথে মিশিয়ে বল আকারে বিকেল বেলায় কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে দিতে হবে।

ঘ) চিংড়ির রোগ

সাধারণত ধান ক্ষেতে চিংড়ি চাষ করলে চিংড়ির রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তথাপি রোগ দেখা দিলে চিংড়িগুলোকে গর্তে এনে শতকে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

চ. ধান ও চিংড়ি আহরণ

সাধারণত ১০০-১২০ দিনের মধ্যে ধান কাটা যায়। আর এই সময়ের মধ্যে প্রতিটি চিংড়ির ওজন হয় গ্রাম। এই সময় হাত বা জালদ্বারা সাবধানে চিংড়ি আহরণ করা যেতে পারে।

চিত্র : চিংড়ি আহরণ

লবণ উৎপাদন ও চিংড়ি মাছ/ধান চাষ

লবন উৎপাদন ও চিংড়ি মাছ/ধান চাষ প্রথা বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকায় প্রচলিত আছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশের উপকূলীয় ঈষৎ লবণাক্ত পানিতে লবণ ও চিংড়ি মাছ/ধান চাষের বর্ষপঞ্জিকা নিচের চিত্রে দেখানো হলো।

চিত্রঃ বাংলাদেশের উপকূলীয় ঈষৎ লবণাক্ত পানিতে লবণ ও চিংড়ি/মাছ/ধান চাষের বর্ষপঞ্জিকা

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. কোন্ সময় থেকে বাংলাদেশে চিংড়ি চাষ শুরু হয়?

২. বাংলাদেশে বর্তমানে হেক্টর প্রতি বাগদা চিংড়ির গড় উৎপাদন কত?

৩. বাংলাদেশে বর্তমানে মোট কত হেক্টর জমিতে বাগদা চিংড়ি চাষ হচ্ছে?

৪. বাংলাদেশে চাষযোগ্য চিংড়ি প্রজাতি কয়টি?

৫. কোন চিংড়িকে জায়ান্ট টাইগার প্রণ বলে?

৬. বাংলাদেশের মোট ভূমির শতকরা কতভাগ ভূমি উপকূলীয় অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত?

৭. বাংলাদেশে কয়টি পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি চাষ হয়?

৮. পিএল ২০ বলতে কি বোঝ?

৯. বাগদা চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে ৪র্থ সপ্তাহ থেকে দৈহিক ওজনের কত শতাংশ খাবার দিতে হয়?

১০. বাগদা চিংড়ি বাজারজাতকরণের উপযোগী হতে কত সময় লাগে?

১১.নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে প্রতি বর্গমিটারে কয়টি পোনা মজুদ করা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের চিংড়ি চাষ এলাকার পরিমাণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

২. বাংলাদেশে চাষযোগ্য ৫টি চিংড়ির স্থানীয় ও বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।

৩. রপ্তানিযোগ্য ৫টি লোনা পানির চিংড়ির স্থানীয় ও বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।

৪. আদর্শ ঘেরের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

৫. ঘেরে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে সতর্কতাসমূহ উল্লেখ কর।

৬. রূপান্তরিত আবদ্ধ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

৭. রূপান্তরিত আবদ্ধ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ লেখ।

৮. মাছ/চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর প্রজাতিসমূহ উল্লেখ কর।

৯. ধান ও চিংড়ি এক সাথে চাষের ক্ষেত্রে জমি প্রস্তুতকরণ নিয়মগুলো লেখ।

১০.ধানের পোকা দমন করার নিয়মসমূহ উল্লেখ কর।

১১. ধান ক্ষেতে চিংড়ি চাষের সুবিধাসমূহ উল্লেখ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ি সম্পদের ভূমিকা বর্ণনা কর।

২. বাংলাদেশে বাগদা চিংড়ি চাষের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৩. চিংড়ির উন্নত চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা কর।

৪. চাষের ঘেরে খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি ও পরিমাণ বর্ণনা কর।

৫. রূপান্তরিত আবদ্ধ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৬. ফসলচক্রভিত্তিক বাগদা ও গলদা চিংড়ির চাষ বর্ণনা কর।

৭. ফসলচক্রভিত্তিক বাগদা চিংড়ি ও অন্যান্য মাছের মিশ্রচাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়
বাগদা চিংড়ির খামার

স্থান নির্বাচন

বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চিংড়ি চাষের ঘেরের জন্য এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে, যেখানে জোয়ার-ভাটার সময় পানির সরাসরি সংযোগে থাকে। মাটির ধরন হবে দোআঁশ বা এঁটেল দোআঁশ। ঘেরে যোগাযোগের জন্য রাস্তা থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চিংড়ি চাষের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের সময় নিচের বিষয়সমূহ বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

ক. দূষণমুক্ত এলাকা

কলকারখানা ও ট্যানারি হতে বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ পরিশোধন ছাড়া সরাসরি নিক্ষেপের ফলে পানির দূষণ মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চিংড়ির মড়ক দেখা যায়। তাছাড়া মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ পরিবর্তিত হয়ে চিংড়ির জন্য প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি করে। সুতরাং এ সমস্ত এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন না করাই ভালো। বরং দূষণমুক্ত এলাকা চিংড়ি খামারের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

চিত্র : চিংড়ি ঘেরের জন্য নির্বাচিত স্থান

খ. অতি বৃষ্টিজনিত ঢলমুক্ত এলাকা

অতি বৃষ্টিজনিত ঢলের পানি খামারের পানির গুণাগুণ, যেমন- লবণাক্ততা, অক্সিজেন, পিএইচ ইত্যাদির হঠাৎ পরিবর্তন করে দেয়, ফলে চিংড়ি চাষ ব্যাহত হয়। এ সমস্ত স্থানে বাঁধ নির্মাণও ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া বৃষ্টি ধৌত ঢালো পানিতে জৈব ও অজৈব পদার্থের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে যা চিংড়ির ফুলকা পচনসহ অনেক রোগের সৃষ্টি করে। কাজেই অতি বৃষ্টিজনিত এলাকা পরিহার করে ঢলমুক্ত এলাকা চিংড়ি খামারের জন্য নির্বাচিত করতে হবে।

গ. পানির উৎস

বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য লবণাক্ত পানির প্রয়োজন। এছাড়া চিংড়ি চাষের জন্য অন্যান্য যে সব ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলী থাকা প্রয়োজন তা সমুদ্রের পানিতে বিদ্যমান। তাই খামারের জন্য এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে যেখানে চিংড়ি চাষের উপযোগী লবণাক্ত পানি পাওয়া যায়। তাছাড়া চিংড়ি চাষের জন্য যে সব উৎস বা আধার থেকে পানি সরবরাহ করা হবে তা অবশ্যই দূষণমুক্ত হতে হবে। তাছাড়া চিংড়ি খামার থেকে পানির উৎসের দূরত্বের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। দূরত্ব বেশি হলে সার্বক্ষণিকভাবে পানি পাবার বিষয়টি অনিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথে সরবরাহ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

ঘ. জোয়ার-ভাটার বৈশিষ্ট্য

খামারের পানি পরিবর্তন, পানি নিষ্কাশন ও বাঁধের উচ্চতা নির্ধারণের জন্য খামার নির্মাণের স্থানে ভূমির উচ্চতার সাথে জোয়ার-ভাটার হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ জানা দরকার। যেসব স্থানে জোয়ার-ভাটার হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ ২-৩

মিটার, সেসব জায়গা খামার স্থাপনের জন্য অধিক উপযোগী। জোয়ার-ভাটার হ্রাস-বৃদ্ধি ৪ মিটারের বেশি বা ১ মিটারের কম হলে বাঁধ নির্মাণ ও পানি সরবরাহ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে, ফলে চিংড়ি চাষ লাভজনক না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ঙ. মাটির গুণাগুণ

মাটির পানি ধারণক্ষমতা ও ভেদ্যতা, মাটির উর্বরতা প্রভৃতি চিংড়ি চাষ পুকুরের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। মাটির গুণাগুণ ভালো না হলে খামার স্থাপন ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়। মাটি যত ভেদ্য হবে পানি চোয়ানোর হার তত বেশি হবে। খামার স্থাপনে মাটির যে গুণাগুণ থাকা প্রয়োজন তা নিম্নরূপঃ

ক) অভেদ্য মাটি দেখে স্থান নির্বাচন করতে হয়, তা না হলে খামারে পানি ধরে রাখা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

খ) মাটির পিএইচ ৫-৬.৫ থাকতে হয়।

গ) মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ ২.৫-৪.৩ % থাকতে হয়।

ঘ) মাটির ধরন হবে দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ বা এঁটেল দোআঁশ।

ঙ) অধিক অম্লযুক্ত মাটি চিংড়ি চাষের জন্য অনুপযাগেী।

চ) দূষিত গ্যাসমুক্ত মাটি চিংড়ি চাষের জন্য বেশি উপযোগী।

ছ) অপ্রয়োজনীয়/অতিরিক্ত আগাছামুক্ত হতে হবে।

চ. পানির গুণাগুণ

পানির তাপমাত্রা, দ্রবীভূত অক্সিজেন, পানির লবণাক্ততা, পানির স্বচ্ছতা, পিএইচ, অ্যালকালিনিটি, হার্ডনেস, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এসব প্রয়োজনীয় গুণাগুণ সঠিক মাত্রায় না থাকলে চিংড়ির উৎপাদন ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। কাজেই চিংড়ি চাষের জন্য পানির নিম্নোক্ত গুণাগুণসমূহ পার্শ্বে উল্লেখিত মাত্রায় থাকা অপরিহার্য বলে বিভিন্ন গবেষণা তথ্যে পাওয়া যায়

১. পানির লবণাক্ততা	= ১০-২৫ পিপিটি
২. পানির গভীরতা	= ৬০ সেমি এর উর্ধ্বে
৩. পানির রং	= সবুজাভ বা হালকা হলুদাভ-সবুজ
৪.পানির স্বচ্ছতা	= ২৫-৩৫ সেমি
৫. তাপমাত্রা	= ২৫-৩০ সে
৬. দ্রবীভূত অক্সিজেন	= ৫ পিপিএম এর উপরে
৭. পিএইচ	= ৭.৫-৮.৫
৮, অ্যালকালিনিটি	= ১০০ পিপিএম এর কম ক্যালসিয়াম কার্বনেট
৯. মোট হার্ডনেস	= ৪০-১০০ পিপিএম এর কম ক্যালসিয়াম কার্বনেট
১০. হাইড্রোজেন সালফাইড	= ০.০৩ পিপিএম এর কম
১১. আন-আয়ানোইজড অ্যামোনিয়া	= ০.১ পিপিএম এর কম
১২. নাইট্রাইট	= ০.২৫ পিপিএম এর কম
১৩. তামা	= ০.১ পিপিএম এর কম
১৪. লোহা	= ০.০১ পিপিএম এর কম

২০২২

১৫. দস্তা = ০.২৫ পিপিএম এর কম
১৬. পারদ = ০.২৫ পিপিএম এর কম
১৭. জিংক = ০.২৫ পিপিএম
১৮. ক্যাডমিয়াম = ০.১৫ পিপিএম

ছ. ভূ-প্রকৃতি

যেখানে খামার স্থাপন করা হবে সেখানকার ভূ-প্রকৃতি অবশ্যই জানা থাকতে হবে। ভূ-গর্ভস্থ পানির অবস্থানও জানা দরকার। লালচে ও অসিড সালফেটযুক্ত মাটি চিংড়ি চাষের জন্য অনুপযাগেী। স্থানটি খামার স্থাপনের উপযোগী কি-না শুরুতেই যাচাই করে নিতে হবে বিশেষ করে মাটির গঠন।

জ. অবকাঠামোগত সুবিধা

চিংড়ি খামারের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ ও স্থানান্তরের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রয়োজন। রাস্তা-ঘাট ও যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো না হলে চিংড়ি বিক্রির ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিতে পারে। সর্বোপরি বন্যামুক্ত এলাকা চিংড়ি চাষের জন্য উপযোগী। এজন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ আছে এবং পানি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্লুইস গেট আছে এমন এলাকা নির্বাচন করা উচিত।

ঝ. বিদ্যুৎ সরবরাহ

চিংড়ি খামারে বিদ্যুৎ থাকা জরুরি। খামারের স্থান নির্বাচনের সময় বিদ্যুৎ পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকা আবশ্যক। বিদ্যুৎ না থাকলে ডিজেল চালিত পাম্পে জালানি খরচ বেশি লাগবে। পানি অপসারণ বা খামারে পানি প্রবেশের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সবচেয়ে সুবিধাজনক ও সাশ্রয়ী বিধায় বিদ্যুতের নিশ্চয়তা আবশ্যক।

ঞ. দক্ষ জনশক্তি

চিংড়ি খামার লাভজনক করতে হলে দক্ষ জনশক্তির কোনো বিকল্প নেই। খামারের সহনশীল উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও অধিক উৎপাদনের জন্য খামারে দক্ষ জনশক্তি নিয়াগে করতে হবে। তাই দক্ষ জনশক্তির পর্যাপ্ততা বিবেচনা করে চিংড়ি খামার স্থাপন করা উচিত।

ট. উৎপাদন সামগ্রীর প্রাপ্যতা ও সরবরাহ

এমন জায়গায় চিংড়ি খামার স্থাপন করা উচিত যেখানে খুব কাছাকাছি হাট-বাজার আছে, যার ফলে খুব সহজেই খামার স্থাপন ও পরিচালনার জন্য সার, চুন, যন্ত্রপাতি ও মেরামত সামগ্রী সংগ্রহ করা যায়। এছাড়া দূরবর্তী বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হলে প্রয়োজনীয় পরিবহন ব্যবস্থা থাকা উচিত।

ঠ. বিরোধমুক্ত এলাকা

বিরাধেপূর্ণ এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন করা উচিত নয়। এতে সামাজিক ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া চিংড়ি একটি মূল্যবান ফসল হওয়ায় খামারে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করাসহ কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। ২০২২

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. জোয়ার-ভাটার হ্রাস-বৃদ্ধি কত হলে খামার স্থাপন করা যায়?

২. বাগদা চাষের জন্য মাটির পিএইচ কত থাকা উচিত?

৩. বাগদা চাষের জন্য কী ধরনের মাটি উত্তম?

৪. বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কত থাকা দরকার?

৫. চিংড়ি চাষের পুকুরে পানির গভীরতা কত হওয়া উত্তম?

৬. চিংড়ি চাষের পুকুরে পানির পিএইচ কত হওয়া দরকার?

৭. চিংড়ি চাষের পুকুরে পানির তাপমাত্রা কত হওয়া উচিত?

৮. চিংড়ি চাষের পুকুরে পানির স্বচ্ছতা কত হওয়া উচিত?

৯. চিংড়ি চাষের পুকুরে পানির হার্ডনেস কত হওয়া উচিত?

১০. চিংড়ি চাষের পুকুরে পানির অ্যালকালিনিটি কত হওয়া উচিত?

১১. চিংড়ি চাষের পুকুরের পানিতে হাইড্রোজেন সালফাইডের মাত্রা কত হওয়া উচিত?

১২.চিংড়ি চাষের পুকুরের পানিতে নাইট্রাইটের মাত্রা কত হওয়া উচিত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাগদা চিংড়ি খামার স্থাপনের জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ কি কি? ।

২. বাগদা চিংড়ি খামার স্থাপনের ক্ষেত্রে জোয়ার-ভাটার গুরুত্ব উল্লেখ কর ।

৩. বাগদা চিংড়ি খামার স্থাপনের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত সুবিধাসমূহ উল্লেখ কর ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য মাটির গুণাগুণ বর্ণনা কর ।

২. বাগদা চিংড়ির চাষে ব্যবহৃত পানির গুণাগুণ বর্ণনা কর ।

২০২২

পঞ্চম অধ্যায়

বাগদা চিংড়ি খামারের অবকাঠামো নির্মাণ

চিংড়ি চাষের সফলতা মূলত সঠিক ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ, স্থান, নকশা, পুঁজি, অবকাঠামোগত সুবিধা, উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি অনেকগুলো বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সাধারণভাবে আধুনিক চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনাকে আশানুরূপ ফলপ্রসূ পেতে হলে সঠিকভাবে অবকাঠামো নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন। খামারের সঠিক নকশা প্রণয়নপূর্বক খামারে নিম্নোক্ত অবকাঠামোসমূহ নির্মিত হওয়া আবশ্যক।

ক. বেষ্টনী বাঁধ

উন্নত পদ্ধতির বাগদা চিংড়ি চাষে ঘেরের বাঁধ বা পাড় নির্মাণ করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ খেয়াল রাখতে হবে

ক) ঘেরের বাঁধ দৃঢ় এবং মজবুত হতে হবে, যাতে করে পানি ঘের থেকে বেরিয়ে না যায় এবং বাহির থেকে। পানি ভেতরে ঢুকতে না পারে।

খ) বাঁধের উচ্চতা হবে ৮ ফুটের অধিক এবং তলা হবে ১২-১৬ ফুট। উভয় দিকের ঢালের (মাটির ধরন অনুযায়ী) অনুপাত হবে ১৪২-১৪১.৫।

গ) ঘেরের পাড়ের চূড়া অন্তত ২ ফুট প্রশস্ত হবে, পাড়ের উভয় ঢালে ঘাসের চাপ সংগ্রহ করে লাগানো যেতে পারে।

খ. পুকুরের বাঁধ বা অভ্যন্তরীণ বাঁধ

খামারের অভ্যন্তরীণ বাঁধ এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যেন চাষ এলাকায় ১–২ মিটার পানি ধরে রাখা যায় অর্থাৎ বাঁধের উচ্চতা কমপক্ষে ১.৫ মিটার হতে হবে। স্তরে স্তরে মাটি কমপ্যাক্ট করে বাঁধ খুব মজবুতভাবে নির্মাণ করতে হবে, যাতে চাষ এলাকা বা পুকুরের পানি বের হয়ে না যায় এবং বাহিরের পানি পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে। পুকুরের পাড় যাতে ধসে না যায় বা অতিবৃষ্টির ফলে বাঁধের মাটি ধুইয়ে নষ্ট হয়ে না যায় সেজন্য বাঁধের গায়ে দূর্বা জাতীয় ঘাস অথবা পুকুরে ছায়া সৃষ্টি করবে না এ রকম গাছ লাগাতে হবে। একটি বাঁধ নির্মাণ করার সময় বিভিন্ন স্থানের পরিমাপ নিচের চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করা হলোঃ

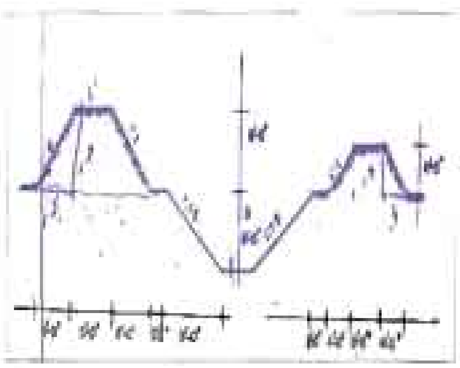

চিত্র : ঘেরের অভ্যন্তরীণ বাঁধসহ বাইরের বাঁধ নির্মাণের নকশা

ধরা যাক ৬ ফুট গভীরতা সম্পন্ন একটি পুকুর, যার ঢাল ১৫১,৫। জমির বাহিরের দিক হতে বকচর পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ২০ ফুট, যেখানে ২ ফুট পর হতে মাটি ফেলা হয়েছে। বাহিরের ঢাল ৯ ফুট, বাঁধের উপরের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট, বাহিরের বাঁধের ভিতরের ঢাল ৬ ফুট ও বকচর ২ ফুটসহ মোট ২০ ফুট। ঘেরের ভিতরের দিকে দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট যার মধ্যে ২ ফুট বকচর, ভিতরের দিকে ঢাল ৩ ফুট, ভিতরের বাঁধের উপরের দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ও ভিতরের বাঁধের বাহিরের ঢাল ৩ ফুট। বাঁধের উচ্চতা নির্ভর করে ঐ স্থানের বন্যার পানির উচ্চতা, মাটির গঠন ও পুকুরের ব্যবস্থাপনা সুবিধার উপর।

গ. নার্সারি পুকুর

চিংড়ি পোনার সুষম বৃদ্ধি ও পানার মৃত্যুহার ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার জন্য নার্সারি পুকুর ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। নার্সারি পুকুর যথাযথভাবে তৈরি করতে হবে। এর ফলে পোনার মজুদকালীন মৃত্যুহারও কমে যাবে এবং পোনা দ্রুত বাড়বে। এক্ষেত্রে পালনীয় কাজগুলো হলো

ক) নার্সারিতে যাতে ৩ থেকে ৪ ফুট পানি থাকে সে অনুপাতে পুকুর খনন করতে হবে।

খ) ঘন মশারির নেট দিয়ে নার্সারি নির্মাণ করতে হবে।

গ) নার্সারির নেট পানির উপরে এক হাত পরিমাণ বাড়তি রাখতে হবে এবং তার মাটিতে কাদার পরিমাণ ৫-৬ ইঞ্চির বেশি হওয়া যাবে না।

ঘ) পুকুরের চার পাড় অবশ্যই উঁচু, মজবুত ও বন্যামুক্ত হতে হবে।

ঙ) ব্যবস্থাপনার সুবিধার জন্য বাড়ির কাছাকাছি হওয়া ভালো।

চ) পুকুরে প্রচুর সূর্যের আলো এবং বাতাস থাকার ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে নার্সারি পুকুরে কমপক্ষে দিনে ৬-৮ ঘণ্টা সূর্যের আলো পড়ে।

চিত্রঃ একটি আদর্শ নার্সারি পুকুরের ডিজাইন

ঘ. পালন পুকুর

উন্নত পদ্ধতির চিংড়ি চাষে পালন পুকুর নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। যথাযথভাবে পালন পুকুরটি নির্মাণ করা হলে রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি বহুলাংশে কমে যায়। পালন পুকুর তৈরিতে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে

ক) পালন পুকুরের সব জায়গায় ৩ ফুটের অধিক পানি থাকতে হবে।

খ) পালন পুকুরের পাড়ে গাছ-পাছালি ও ঝোপ-ঝাড় থাকলে তা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

গ) পুরনো পুকুরের ক্ষেত্রে তলা ভালোভাবে শুকাতে হবে প্রয়োজনে কালো মাটি থাকলে সরিয়ে ফেলতে হবে।

ঘ) পালন পুকুরের তলদেশ সমান হতে হবে।

ঙ) দোআঁশ মাটি হলে পুকরের ঢাল ১৪১.৫ এবং বেলে মাটি হলে পুকরের ঢাল ১৪২.০ হবে।

চ) এই পদ্ধতিতে একটি আদর্শ পালন পুকুরের আয়তন হওয়া উচিত অনধিক এক হেক্টর।

ছ) দিনে কমপক্ষে ৬-৮ ঘণ্টা পর্যাপ্ত সূর্যালোকে থাকতে হবে।

জ) পুকুরের চার পাড় অবশ্যই উঁচু, মজবুত ও বন্যামুক্ত হতে হবে।

চিত্রঃ একটি আদর্শ পালন পুকুরের ডিজাইন

২০২২

ঙ. রিজার্ভার নির্মাণ

চিত্রঃ রিজার্ভার ব্যবস্থাপনা

ক) জরুরি প্রয়োজনে পরিশোধিত পানি সরবরাহের জন্য মূল/পালন পুকুরের পাশে একটি ৫-৬ ফুট গভীর রিজার্ভার নির্মাণ করতে হবে।

খ) রিজার্ভারের আয়তন পালন পুকুরের চার ভাগের এক ভাগ হতে হবে।

গ) রিজার্ভারের চারপাশে জালের বেড়া থাকতে হবে।

চ. স্লুইস গেট নির্মাণ

বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য স্লুইস গেট নির্মাণ অত্যন্ত প্রয়োজন। স্লুইস গেটের মাধ্যমে পুকুরে পানি সরবরাহ ও পুকুর থেকে পানি নিষ্কাশন করা হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিমিত আকারের স্লুইস গেট নির্মাণ করতে হবে। চাষ এলাকায় ঘেরে পানির নিশ্চয়তার জন্য প্রতিটি জোয়ারে ৩০ শতাংশ পানি যাতে সরবরাহ করা যায় এমনভাবে গেট নির্মাণ করতে হবে। পানি সরবরাহ গেট পুকুরের তলা থেকে কিছুটা উপরে এবং নিষ্কাশন গেট পুকুরের তলা থেকে কিছুটা নিচুতে স্থাপন করা দরকার। এতে পুকুরে সঠিকভাবে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন করা যায়। স্লুইস গেট সাধারণত কাঠের, আরসিসি পাইপ বা পিভিসি পাইপ অথবা সিমেন্ট দ্বারা নির্মাণ করা যায়। স্লুইস গেট সাধারণত দুধরনের হয়ে থাকে, যথা- প্রধান স্লুইস গেট ও গৌণ বা অপ্রধান স্লুইস গেট। বেষ্টনী বাঁধের উৎসের নিকট যে গেট নির্মাণ করা হয়। তাকে প্রধান স্লুইস গেট এবং পুকুরের পাড়ে যে গেট নির্মাণ করা হয় তাকে গৌণ স্লুইস গেট বলে। পানি সরবরাহ খালে পানি সরবরাহ করার জন্য সাধারণত প্রধান স্লুইস গেট ব্যবহার করা হয় এবং সরবরাহ খাল থেকে পুকুরে পানি সরবরাহ করার জন্য গৌণ স্লুইস গেট ব্যবহার করা হয়।

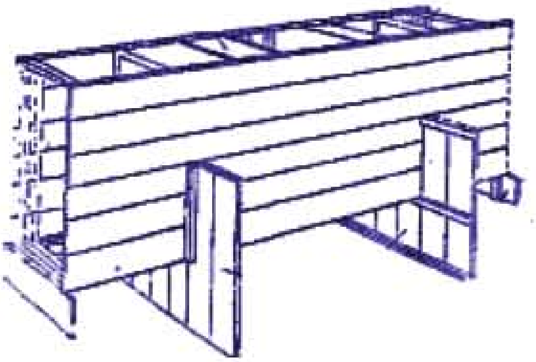

চিত্রঃ একটি কাঠের স্লুইস গেট

একটি কাঠের স্লুইস গেট নির্মাণের সময় নিচের বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে

ক) স্লুইস গেটে বা গেটসমূহের আকার বা সংখ্যা এমন হতে হবে যাতে নির্ধারিত সময়ে খামারে পানি প্রবেশ করানো যায় বা সময়মত খামার থেকে পানি বের করা যায়।

খ) খামারের এমন স্থানে গেট নির্মাণ করতে হবে যাতে খামারের সমস্ত পানি বের করা সম্ভব হয়। গেটে ছোট ছিদ্রযুক্ত জাল, আহরণ জাল ও ফলবোর্ড বসানোরে ব্যবস্থা থাকতে হবে।

গ) গেট পানি নিরোধক হতে হবে যাতে গেটের পার্শ্ব বা তলা দিয়ে পানি প্রবেশ করতে বা পানি বের হয়ে যেতে না পারে।

ঘ) গেটের তলদেশ দিয়ে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ঙ) গেটের উপরিভাগ দিয়ে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

চ) গেটের ডিজাইন এমন হতে হবে যেন সহজে পরিচালনা করা যায়।

পুকুরে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশনের কাজ ৪-৬ ঘণ্টার মধ্যে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা থাকা দরকার। নিষ্কাশন কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায় সেজন্য পুকুরের তলদেশ পানি সরবরাহ করানোর গেটের দিক থেকে পানি নিষ্কাশন গেটের দিকে ঢালু হতে হবে। পানি সরবরাহ স্লুইস গেটের মুখে সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত জাল স্থাপন করে রাক্ষুসে মাছ ও অন্যান্য অবাঞ্চিত জলজ প্রাণীর খামারে প্রবেশ বন্ধ করা যায়। আর নিষ্কাশন স্লুইস গেটের মুখে জাল স্থাপন করে অতি সহজেই চিংড়ি আহরণ করা যায়।

ছ. বাসস্থান ও ভান্ডার

বাসস্থান ও ভা-ার খামার অবকাঠামোর অন্যতম উপাদান। খামারের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি যেমন- চুন, সার, খাদ্য, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি রাখার জন্য উপযুক্ত ভা-ার থাকা দরকার। খামারের ভাণ্ডারটি শুষ্ক স্থানে হওয়া উচিত। এছাড়া খামারের শ্রমিকসহ খামার পরিচালনায় নিয়োজিত অন্যান্য জনবলের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান থাকা একান্ত অপরিহার্য। কর্মরত জনবলের জন্য পর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থাও অত্যন্ত জরুরি।

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. বাগদা চিংড়ি খামারের বেষ্টনী বাঁধের উচ্চতা কত হওয়া উচিত?

২. বাগদা চিংড়ি খামারের বেষ্টনী বাঁধের তলা কত হওয়া উচিত?

৩. বাগদা চিংড়ি খামারের অভ্যন্তরীণ বাঁধের উচ্চতা কত হওয়া উচিত?

৪. নার্সারি পুকুরে পানির গভীরতা কত হওয়া উত্তম?

৫. পালন পুকুরে পাড়ের ঢাল কত হওয়া দরকার?

৬. রিজার্ভারের গভীরতা কত হওয়া উচিত?

৭. স্লুইস গেট কত ধরণের হয়ে থাকে?

৮. কি দিয়ে নার্সারি নির্মাণ করা হয়?

৯. নার্সারি/পালন পুকুরে দিনে কতক্ষণ সূর্যালোকে থাকা উচিত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাগদা চিংড়ি খামারের বেষ্টনী বঁধ নির্মাণের কৌশল বর্ণনা কর।

২. বাগদা চিংড়ি খামারে নার্সারি পুকুর তৈরির ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ কী কী?

৩. বাগদা চিংড়ি খামারে বাসস্থান ও ভাণ্ডারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

৪. রিজার্ভার নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাগদা চিংড়ি খামারের অভ্যন্তরীণ বাঁধ নির্মাণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২. বাগদা চিংড়ি খামারে নার্সারি পুকুর তৈরির কৌশল বর্ণনা কর।

৩. বাগদা চিংড়ি খামারে পালন পুকুর তৈরির কৌশল বর্ণনা কর।

৪. বাগদা চিংড়ি খামারে স্লুইস গেট তৈরির কৌশল বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাগদা চিংড়ির খামার প্রস্তুতকরণ

পুকুর প্রস্তুতির উদ্দেশ্য

চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে পুকুরের ভৌত অবস্থার উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সুষ্ঠু পুকুর প্রস্তুতির মাধ্যমে চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এছাড়াও চিংড়ি সহজেই পুকুরের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। চিংড়ি চাষে পুকুর প্রস্তুতিতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো

ক) পুকুরের তলদেশ জৈব বর্জ্য পদার্থ মুক্ত হওয়ার কারণে পুকুরের তলদেশে অক্সিজেন গ্রহণকারী বিষাক্ত। পদার্থের পরিমাণ হ্রাস পায়।

খ) পুকুরের তলদেশ জীবাণুমুক্ত হয়।

গ) পুকুরের পানিতে খনিজ পদার্থ সহজে মুক্ত হতে পারে।

ঘ) পুকুরের তলদেশের মাটিতে সহজে সূর্যালোকে প্রবেশ করতে পারে। ফলে পুকুরের তলদেশের মাটিতে অণুজীবের ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় ও জৈব পদার্থ সহজেই পচন ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

ঙ) চিংড়ি উৎপাদনে অবাঞ্ছিত ক্ষতিকর শৈবালের ব্যাপকতা হ্রাস পায়।

চ) চিংড়ির জন্য ক্ষতিক মাছের ডিম, কাঁকড়ার লার্ভা ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিকর প্রাণীর উপস্থিতি বা উপদ্রব হ্রাস পায়।

চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে পুকুর প্রস্তুতির মাধ্যমে চিংড়ির খাদ্য ও পুষ্টিকর পদার্থের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে যা পরাক্ষেভাবে চিংড়ি চাষে সম্পূরক খাদ্য সরবরাহের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

চিংড়ি চাষে পুকুর প্রস্তুতির ধাপ

চিংড়ি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুকুরের তলদেশের গভীর কাদার স্তর চিংড়ি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ। চিংড়ি চাষ পদ্ধতি অধিক সম্পূরক খাদ্য নির্ভর হওয়ার কারণে পুকুরের তলদেশে গভীর কাদার সৃষ্টি হয়। এ কারণে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে প্রতিবছর ফসল আহরণের পরপরই বা পুনরায় চিংড়ির পোনা মজুদের পূর্বেই পুকুর প্রস্তুত করে নিতে হয়। চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে অধিক সার, খাদ্যে বর্জ্য পদার্থ ও প্ল্যাংকটন উৎপাদন সমৃদ্ধ পুকুর ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকে ভালো নয়। কেননা এ ধরনের পুকুরের তলদেশে বর্জ্য পদার্থ অধঃক্ষেপনের মাধ্যমে অবায়বীয় গভীর পাকের সৃষ্টি হয়। অধিক অবায়বীয় জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ পুকুর চিংড়ির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উৎপাদনের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলে। কখনও কখনও এ ধরনের অধঃক্ষেপনকৃত পদার্থের কারণে চিংড়ি ও অন্যান্য জীবভরের মৃত্যু ও বিলুপ্তি হতে পারে বা রোগের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। এ কারণেই চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে প্রথমেই পুকুরের মাটির প্রকৃতি, পূর্ববর্তী বছরের উৎপাদনে পরিবেশগত বাধাসমূহ নির্ণয় করে পুকুর প্রস্তুতির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। নিচে পুকুর প্রস্তুতির ধাপসমূহ উল্লেখ করা হলো—

ক. পুকুরের পানি বের করে ফেলা

সাধারণত চিংড়ি আহরণের সময় পুকুরের পানি সম্পূর্ণরূপে বের করে ফেলতে হয়। এ সময় পুকুরের তলদেশ, ঢাল ও নালার অবস্থা, স্লুইস গেট প্রভৃতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে পুকুর প্রস্তুতির কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়, যাতে পুকুরের ভৌত অবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। পুকুরের তলদেশের গভীর পাক বা কালো মাটি পুকুর প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্রধান বাধাস্বরূপ। পুকুরের তলদেশের কালো মাটি তুলে ফেলার ক্ষেত্রে নিচে উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করা যেতে পারে।

১. চিংড়ি আহরণের পরপরই প্রেসার পাইপের মাধ্যমে তীব্র স্রোত বা বেগে পানি বার বার প্রবেশ ও বের করার মাধ্যমে কালো মাটি অপসারণ করা যেতে পারে। এ কাজটি পুকুরের পানি বের করে দেয়ার সাথে সাথে করতে হবে। যাতে পুকুরের মাটি সূর্যালোকে শক্ত হয়ে যেতে না পারে।

২. শ্রম নির্ভর পদ্ধতিতে এ কার্য সম্পাদন করা যেতে পারে।

চিত্রঃ শ্রম নির্ভর পদ্ধতিতে কালো মাটি অপসারণ

খ. পুকুর শুকানো

পুকুরে জলস্রোত দিয়ে বা শ্রম নির্ভর পদ্ধতিতে পুকুরের তলদেশের বর্জ্য পদার্থ সরিয়ে ফেলার পর ১০-১৫ দিন সূর্যালোকে পুকুর এমনভাবে শুকাতে হয়, যাতে পুকুরের তলদেশের মাটিতে ২৫-৩০ সেমি গভীর ফাটলের সৃষ্টি হয়। পুকুরের তলদেশের গভীর অঞ্চল শুকানোর ক্ষেত্রে পানি নিষ্কাশন পাম্প ব্যবহার করা যেতে পারে।

চিত্রঃ পাম্পের মাধ্যমে পানি অপসারণ

গ. মাটি চাষ

পুকুরের মাটি শুকানোর পর ১০-১৫ সেমি গভীর তলদেশের মাটি লম্বালম্বি ও আড়াআড়িভাবে ৩-৫ বার চাষ করতে হয়। এক্ষেত্রে অধিক পরিমাণ বর্জ্য পদার্থ সমৃদ্ধ স্থানসমূহ অধিক গভীর করে চাষ দেয়ার প্রয়োজন হয়। সাধারণত চাষের গভীরতা পুকুরের তলদেশের বর্জ্য পদার্থের গভীরতার উপর নির্ভর করে। পুকুরের তলদেশে চাষের ক্ষেত্রে ট্রাক্টর বা দেশীয় প্রচলিত পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

চিত্রঃ মাটি চাষ

ঘ. পাড় মেরামত

ঘের প্রস্তুত করার পূর্বেই পাড় মেরামত করা প্রয়োজন পাড়ে তত্ত ফেলতে হবে। পাড় ভাঙ্গা থাকলে তা মাটি দিয়ে ভালোভাবে মেরামত করে নিতে হবে। সম্ভব হলে পাড়ে ঘাস লাগানো যেতে পারে। পাড়ের গর্ত বিচ্ছিন্ন। ক্ষতিকর প্রাণীর আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।

চিত্রঃ পাড় মেরামত

ঙ. রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ

দূরীকরণ চিংড়ি চাষ একটি অত্যন্ত লাভজনক কার্যক্রম হলেও বিভিন্ন ভুল সিদ্ধান্তের কারণে অনেক সময় চিংড়ি চাষে সফলতা নাও আসতে পারে। ব্যর্থতার মাঝে যে সমস্ত কারণগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো- পোনা মজুদের পূর্বে সঠিক নিয়মে পুকুর হতে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর না করা। রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ চাষকৃত পুকুরে কী ক্ষতি করতে পারে এ ব্যাপারে অনেকের সুস্পষ্ট ধারণা নেই। নিচে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ কী তা আলোচনা করা হলো:

রাক্ষুসে মাছ: যে সমস্ত মাছ সরাসরি অন্য মাছ বা চিংড়ি ধরে খায় তাদেরকে রাক্ষুসে মাছ বলে, যেমন- ফলি, টেংরা, বোয়াল, ভেটকি, বেলে, শোল, গজার প্রভৃতি। এরা চাষকৃত চিড়ি বা চিংড়ির পিএল সরাসরি খেয়ে ফেলে, ফলে চিংড়ির উৎপাদন কমে যায়। নিচে কতিপয় রাক্ষুসে মাছের ছবিসহ নাম উল্লেখ করা হলো:

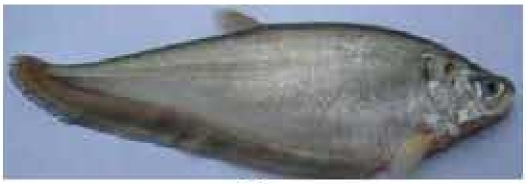

ফলি

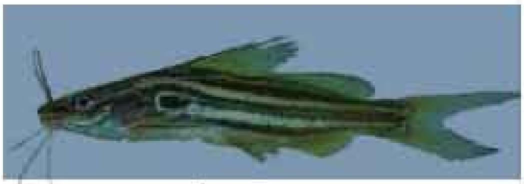

টেংরা

বোয়াল

ভেটকি

বেলে

শোল

চিত্র: প্রধান প্রধান রাক্ষুসে মাছ

অবাঞ্ছিত মাছঃ যে সমস্ত মাছ সরাসরি অন্য মাছকে খায় না কিন্তু চাষকৃত মাছের সাথে অক্সিজেন, খাদ্য ও বাসস্থান নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা করে তাদেরকে অবাঞ্ছিত মাছ বা আমাছা বলে, যেমন- পার্শে, তপসী, চান্দা, তেলাপিয়া, কাকিলা প্রভৃতি অন্যতম। পুকুরে এ ধরনের মাছ থাকলে খাদ্যের অপচয় হয় এবং উৎপাদন অনেক কমে যায়। নিচে কিছু উল্লেখযোগ্য অবাঞ্ছিত মাছের নাম উল্লেখ করা হলোঃ

পার্শে

তপসী

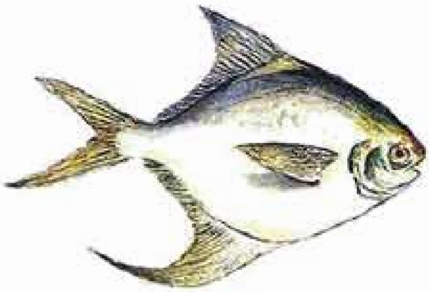

চান্দা

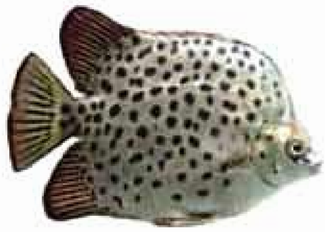

পায়রা

তেলাপিয়া

কাকিলা

চিত্রঃ প্রধান প্রধান অবাঞ্ছিত মাছ

নিম্নলিখিত কারণে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ চিংড়ি চাষের ঘের/পুকুর থেকে দূর করা প্রয়োজন ?

ক) রাক্ষুসে মাছ চাষকৃত মাছের পোনা খেয়ে ফেলে, ফলে উৎপাদন আশানুরূপ হয় না ।

খ) পুকুরে মজুদকৃত চিংড়ির সঠিক রেকর্ড সংরক্ষণে অসুবিধার সৃষ্টি হয় ।

গ) অবাঞ্ছিত মাছ বা আমাছ চাষকৃত চিংড়ির খাদ্যে ভাগ বসায় । তাছাড়া চাষকৃত চিংড়ির সঙ্গে বাসস্থান ও অক্সিজেনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিয়েও প্রতিযোগিতা করে ।

ঘ) উভয় প্রকার মাছই পুকুরে রোগ-জীবাণুর বাহক এবং আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে, কারণ বিভিন্ন প্রকার মাছের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা এক নয় ।

ঙ) উভয় প্রকার মাছের উপস্থিতিতেই চিংড়ির উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে যায়, ফলে লাভের অংশ কমে যায় ।

চ) দেখা গেছে ১ কেজি রাক্ষুসে মাছ বড় হতে প্রায় ১০ কেজি চাষকৃত চিংড়ি খেয়ে ফেলে, আবার ১ কেজি আমাছ ১০ কেজি চাষযোগ্য মাছের খাদ্য খেয়ে ফেলে ।

ঘের/পুকুর হতে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ নিম্নোক্ত উপায়ে দূর করা যায়

ক) পানি শুকিয়ে ,

খ) ঘন ফাঁসের জাল টেনে,

গ) জীবত টোপ ব্যবহার করে,

ঘ) খাবার দেয়ার পর ঝাঁকি জাল ব্যবহার করে, এবং

ঙ) মাছ মারার ঔষধ (বিষ) প্রয়োগ করে ।

ক) পানি শুকিয়ে: পুকুর হতে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণের সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হলো স্যালো মেশিন দ্বারা পানি সেচে পুকুর শুকিয়ে ফেলা । পুকুর শুকানোর পূর্বে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে মৌসুমে পুকুর শুকানো হচ্ছে সে মৌসুম পুকুর শুকানোর জন্য উপযোগী কিনা । কারণ পুকুর শুকানোর পরে কমপক্ষে ১৫ দিন রোদে রাখলে তার তলদেশ রোদে ফেটে যাবে, ফলে বিভিন্ন প্রকার বাজে গ্যাস দূর হয়ে যাবে । তলদেশে কাদার মধ্যে যে সমত রাক্ষুসে মাছ লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা থাকে সে সম্ভাবনাও অনেকটা কমে যায় । এ কাজটি ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে করলে খরচও অনেকটা কম হবে ।

খ) ঘন ফাঁসের জাল টেনে: পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে এবং পুকুরের তলদেশ সমতল হলে সে সমস্ত পুকুরে যতদূর সম্ভব পানি কমিয়ে দিয়ে বার বার ঘন ফাঁসের জাল টেনে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ বহুলাংশে দূর করা যেতে পারে । তবে যত ভালোভাবেই জাল টেনে রাক্ষুসে মাছ দূর করা হাকে না কেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিছু না কিছু মাছ থেকে যেতেই পারে । তাই জাল টেনে রাক্ষুসে মাছ দমন করে যদি পুকুরে পোনা মজুদ করতে হয় তাহলে অবশ্যই বড় সাইজের (৪-৬ ইঞ্চি) পোনা মজুদ করতে হবে ।

চিত্রঃ ঘন ফাসের জাল টেনে মাছ ধরা

গ) জীবন্ত টোপ ব্যবহার করেঃ অনেক সময় জীবন্ত মাছকে বড়শিতে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে রাক্ষুসে মাছ যেমন- শোল, গজার, মাগুর প্রভৃতি মাছ দুর করা হয়। যেহেতু এই জাতীয় মাছ রাক্ষুসে স্বভাবের তাই ছোট মাছ, যেমন- পুঁটি, খলিসা, টেংরা প্রভৃতি মাছকে টোপ হিসেবে বড়শিতে গেথে দিয়ে রাতে পুকুরে দিয়ে রাখলে অনেক সময় এই জাতীয় মাছ তাদের সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী জীবন্ত মাছকে ভক্ষণ করার চেষ্টা করবে, ফলে বড়শিতে আটকে যাবে।

ঘ) খাবার দেওয়ার পর ঝাঁকি জাল ব্যবহার করেঃ এই পদ্ধতিতেও অনেক সময় রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা যেতে পারে। পুকুরের কয়েকটি নির্দিষ্ট অংশে খাদ্য প্রয়োগ করলে মাছ যখন খাদ্য গ্রহণের জন্য খাদ্য প্রয়োগকৃত অঞ্চলে যাবে তখন ঝাঁকি জালের মাধ্যমে খুব সহজেই তাদেরকে ধরে ফেলা যেতে পারে। তবে এই পদ্ধতির ব্যবহার খুবই সীমিত এবং এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণভাবে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা যায় না।

ঙ) মাছ মারার ঔষধ (বিষ) প্রয়োগ করেঃ রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দুর করার ক্ষেত্রে পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে এর পরে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হলো মাছ মারার ঔষধ (বিষ) প্রয়োগ করে তা দূর করা। ঔষধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই বিষের ধরন ও বিষ ক্রিয়ার মেয়াদকালের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। কারণ বাজারে এমন কিছু নিষিদ্ধ ও অননুমোদিত বিষ পাওয়া যায় যা ব্যবহারে আপাত দৃষ্টিতে অর্থ সাশ্রয় মনে হলেও পরিবেশ ও মানব দেহের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর। নিচে বিভিন্ন প্রকার ঔষধের নাম, প্রয়োগ মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি দেয়া হলোঃ

১. রোটেননঃ রোটেনন হচ্ছে ডেরিস নামক গুল্ম জাতীয় এক প্রকার গাছের মূল (শিকড়) থেকে তৈরি এক ধরনের পাউডার জাতীয় পদার্থ যা দেখতে বাদামি বর্ণের। এ গুল্ম সাধারণত দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আমাদের দেশে সাধারণত এ জাতীয় গাছ জন্মায় না। যদিও রোটেনন তরল ও পাউডার এ দুই অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে আমাদের দেশে মূলত পাউডার জাতীয় রোটেনন পাওয়া যায় এবং ব্যবহৃত হয়। রোটেননের শক্তি মাত্রা এর মধ্যে বিদ্যমান মূল কার্যকর উপাদানের উপর নির্ভরশীল। বাজারে দু'ধরনের শক্তি সম্পন্ন রোটেনন পাওয়া যায়, যেমন- ৭% এবং ৯.১% শক্তি সম্পন্ন। তবে ৯.১% শক্তি সম্পন্ন রোটেননই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। তাপমাত্রা বেড়ে গেলে রোটেনন এর মাত্রা কম প্রয়োজন হয়। তাই শীতকালে রোটেনন প্রয়োগের ক্ষেত্রে গরমকালের চেয়ে বেশি পরিমাণে রোটেনন প্রয়োজন পড়ে।

২০২২

চিত্রঃ রোটেনন প্রয়োগ

প্রয়োগ মাত্রাঃ রোটেনন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ মাত্রা প্রজাতি, তাপমাত্রা এবং শক্তি মাত্রার উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশে সচরাচর ৯.১% মাত্রার রোটেনন বেশি ব্যবহৃত হয়। রোটেননের প্রয়োগমাত্রা নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

শক্তি মাত্রা	গ্রাম/শতক/ফুট পানি
৭%	১৬-১৮
৯.১%	১৮-২৫

প্রয়োগ পদ্ধতিঃ পরিমাণমত রোটেনন পাউডার একটি পাত্রে নিয়ে অল্প অল্প করে পানি যোগে করে পেস্টের মত করে কাই তৈরি করতে হবে। অতঃপর উক্ত কাইকে সমান তিন ভাগে ভাগ করে দুই ভাগ গুলে তরল করে এবং এক ভাগ ছোট ছোট বল তৈরি করে সমস্ত রোটেনন পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর জাল টেনে পানি উলট পালট করে দিলে ভালো হয়। ১৫-২০ মিনিট পর মাছ ভাসতে শুরু করলে খুব দ্রুত জাল টেনে মাছ ধরে ফেলতে হবে। কারণ বেশি দেরি হলে মৃত মাছ পুকুরের তলায় ডুবে যাবে ও মাছ জালে উঠবে না। ভোর বেলায় রোটেনন প্রয়োগ করা ভালো, কারণ তখন পানিতে অক্সিজেন কম থাকে। এর ফলে রোটেনন এর বিষক্রিয়া বেশি কার্যকর হয়।

রোটেনন প্রয়োগ করলে পুকুরে নিম্নলিখিত বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়ঃ পুকুরে যখন রোটেনন প্রয়োগ করা হয় তখন ঐ রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ পানি হতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কারণ মাছ যখন পানি হতে অক্সিজেন গ্রহণ করার নিমিত্ত নিঃশ্বাস নিতে থাকে, তখন পানিতে দ্রবীভূত রোটেনন এর বিষক্রিয়াদ্বারা মাছের ফুলকার ল্যামেলি আক্রান্ত হয়। ফুলকায় যে গিল ল্যামেলি আছে সেই গিল ল্যামেলিগুলো ফেটে যায়। ফলে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন রূপে দেহে পরিবাহিত হতে পারে না। অক্সিজেন পরিবহনের সেই মেকানিজম বন্ধ হয়ে যায়, ফলে মাছ অক্সিজেন গ্রহণ করতে না পেরে আস্তে আস্তে মারা যায়।

$$O_2 + Hb = HbO_2$$

(অক্সিজেন + হিমোগ্লোবিন = অক্সিহিমোগ্লোবিন)

এছাড়াও বিষযুক্ত পানি যখন নিঃশ্বাস-এর মাধ্যমে সরাসরি মাছের পাকস্থলীতে প্রবেশ করে তখন অনুরূপ প্রতিক্রিয়ায় মাছের অভ্যন্তরীণ অংশ, যেমন- পরিপাকতন্ত্র, হৃদযন্ত্র, লিভার, ফুসফুস প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত রক্তনালির দ্রুত ক্ষতিসাধন হয়। ফলে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় ও পরিশেষে মাছ মারা যায়।

২. ফসটক্সিন/কুইকফস/সেলফস: এগুলো এক ধরনের কীটনাশক। বাজারে ৩ গ্রাম ওজনের ট্যাবলেট আকারে এগুলো পাওয়া যায়। পুকুরে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণে এগুলো খুবই কার্যকর। তবে মানুষের জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত বিধায় সতর্কতার সাথে এগুলো ব্যবহার করতে হয়।

প্রয়োগ মাত্রা: ১ টি ট্যাবলেট/শতক/ফুট।

প্রয়োগ পদ্ধতি: ট্যাবলেটগুলো সমানভাবে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দেয়ার পর জাল টেনে পানি উলট-পালট করে দিতে হবে। ট্যাবলেট প্রয়োগের ১-২ ঘণ্টা পর মাছ মরে ভাসতে শুরু করলে জাল টেনে মাছ ধরার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিষক্রিয়ার মেয়াদকাল: প্রায় ৭ দিন।

৩. ব্লিচিং পাউডার: যদিও এটা পানি বিশোধনে ব্যবহৃত হয়, তবুও এটাদ্বারা রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা যায়। পুকুরে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা হলে আর চুন প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।

প্রয়োগ মাত্রা: ১ কেজি/শতক/ফুট পানি।

প্রয়োগ পদ্ধতি: পরিমাণমত ব্লিচিং পাউডার সুবিধাজনক কোনো পাত্রে পানি দিয়ে গুলে নিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এ পাউডার সকালে প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। পাউডার প্রয়োগের ২০-৩০ মিনিট পরেই মাছ মরতে শুরু করলে জাল টেনে মাছ ধরতে হবে।

চিত্র: ঘেরে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ

বিষক্রিয়ার মেয়াদকাল: প্রায় ৭ দিন।

৪. চা বীজের খৈলঃ চা বীজের গুঁড়া হতে এটা তৈরি করা হয়। চা বীজের খৈল প্রথমে বিষ এবং পরে সার হিসেবে কাজ করে। এ পাউডারের মধ্যে স্যাপোনিন নামক এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ থাকে, যা পানিতে দ্রবীভূত হয়ে মাছের রক্তের লোহিত কণিকাগুলোকে নষ্ট করে ফেলে, ফলে মাছ মারা যায়। পানির তাপমাত্রা বেশি থাকলে এ বিষক্রিয়া তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। তাপমাত্রা কম হলে এটা ধীরে ধীরে কাজ করে ফলে অনেক সময় ধরে এর কার্যকারিতা থাকে। তাই চা বীজের খৈল তাপমাত্রা বাড়ার আগে সকালের দিকে প্রয়োগ করা ভালো। বিষ প্রয়োগের ৩-৫ ঘন্টার মধ্যেই মাছগুলো ভারসাম্য হারিয়ে ভাসতে শুরু করে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যায়। এটা প্রয়োগে মাছ ছাড়াও চিংড়ি চাষের জন্য ক্ষতিকর ব্যাঙাচি, ছোট শামুক, জোক এবং কিছু কিছু পোকামাকড় মারা যায়। তবে চা বীজের খৈল চিংড়ির জন্য ক্ষতিকারক নয়, যেহেতু চিংড়ির রক্তে লোহিত কণিকা অনুপস্থিত।

প্রয়োগ মাত্রাঃ ১ কেজি/শতক/ফুট পানি।

প্রয়োগ পদ্ধতিঃ পরিমাণমত চা বীজের খৈল প্রথমে অল্প পানিতে গুলে নিয়ে তার সাথে আরও পানি মিশিয়ে পাতলা দ্রবণ তৈরি করে সূর্যালোকিত দিনে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। পাউডার প্রয়োগের ২০-৩০ মিনিট পরেই মাছ মরতে শুরু করলে জাল টেনে মাছ ধরতে হবে।

বিষক্রিয়ার মেয়াদকালঃ প্রায় ৩-৪ দিন।

৫. মহুয়া বীজের খৈলঃ মহুয়া বীজ হতে তেল নিষ্কাশনের পর যে খৈল অবশিষ্ট থাকে তা বিষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এতে স্যাপোনিন (৪-৬%) নামক এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ বিদ্যমান থাকে। আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলে এই গাছ সামান্য পরিমাণে জন্মে। এটাও চা বীজের খৈলের ন্যায় প্রথমে বিষ ও পরে সার হিসেবে কাজ করে। এটা প্রয়োগ করার ২ ঘন্টার মধ্যেই বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এবং মাছ মরে ভারসাম্যহীনভাবে ভাসতে শুরু করে।

প্রয়োগ মাত্রাঃ ৩ কেজি/শতক/ফুট পানি।

প্রয়োগ পদ্ধতিঃ পরিমাণমত মহুয়া বীজের খৈল প্রথমে অল্প পানিতে গুলে নিয়ে তার সাথে আরও পানি মিশিয়ে পাতলা দ্রবণ তৈরি করে প্রখর সূর্যালোকিত দিনে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। পাউডার প্রয়োগের ২০-৩০ মিনিট পরেই মাছ মরতে শ

বিষক্রিয়ার মেয়াদকালঃ প্রায় ৩-৪ দিন।

পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা পদ্ধতি

বিষাক্ততা পরীক্ষার সময়

পুকুরে রেণু/পিএল মজুদ করার ১-২ দিন পূর্বে পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করে নেয়া উচিত। পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করার পদ্ধতিসমূহ
২২ হলোঃ

হাপা স্থাপন

চিত্রঃ পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা (পদ্ধতি- ১)

পদ্ধতি-১: পানির বিষাক্ততা পরীক্ষার জন্য পুকুরে একটি হাপা টাঙিয়ে তার মধ্যে অল্প পরিমাণে যে কোনো রেণু/চিংড়ির পিএল ছেড়ে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি এ সময়ের মধ্যে অধিকাংশ রেণু/পিএল (৭০% বেঁচে থাকে) মারা না যায়, তবে বুঝতে হবে পানিতে বিষাক্ততা নেই। এ অবস্থায় পুকুরে রেণু/পিএল মজুদ করা যাবে। যদি এ সময়ের মধ্যে পুকুরে বেশি পরিমাণে রেণু/পিএল মারা যায় তবে বুঝতে হবে পানিতে বিষাক্ততা আছে।

পদ্ধতি-২: যে পুকুরে রেণু/পিএল মজুদ করা হবে তার পানি একটি বালতিতে (১০-১৫ লিটার) নিয়ে পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করা যেতে পারে। দু'টি বালতির একটিতে রেণু ছাড়া পুকুরের এবং অন্যটিতে টিউবওয়েল বা অন্য একটি ভালো পুকুরের ১০-১৫ লিটার পানি নিতে হবে। পুকুর থেকে পানি নেয়ার সময় উপর, মধ্য ও নিচের পানি ভালভাবে মিশ্রিত করে নিতে হবে। বালতি দু টিতে অল্প কিছু রেণু ছেড়ে ৩-৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দু'টি বালতিতে একই সময়ে সমান সংখ্যক পোনা মারা গেলে বুঝতে হবে বিষাক্ততা নেই। যদি রেণু ছাড়ার পুকুরের পানিযুক্ত বালতিতে অধিকাংশ পোনা/পিএল বেঁচে থাকে তা হলেও বুঝতে হবে পানিতে বিষাক্ততা নেই। পরীক্ষায় যদি প্রমাণিত হয় যে, পুকুরের পানিতে বিষাক্ততা আছে তাহলে কোনো অবস্থাতেই পুকুরে রেণু/পিএল মজুদ করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে যতদিন পর্যন্ত পানির বিষাক্ততা শেষ না হয় ততদিন অপেক্ষা করা উচিত।

চিত্র: পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা (পদ্ধতি- ২)

চ. চিংড়ি চাষে চুন প্রয়োগ

চুন হলো ক্যালসিয়ামযুক্ত অজৈব যৌগ, যা অম্লত্ব হ্রাসে প্রশমনে, প্রাণীর দৈহিক কাঠামো গঠন ও রোগজীবাণু দমনে করতে সহায়তা করে। চুনের মধ্যে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়ামের কার্বন আয়ন থাকে যা পানির অম্লত্বকে নিরপেক্ষ করতে সহায়তা করে।

চুন প্রয়োগের উপকারিতা

পুকুরে চুন প্রয়োগ করলে একসাথে অনেকগুলো উপকার পাওয়া যায়। এর প্রধান প্রধান গুণাবলি নিচে উল্লেখ করা হলো

ক) চুন চিংড়ি চাষের পরিবেশ অর্থাৎ মাটি ও পানির অম্লত্ব ও ক্ষারত্বকে নিরপেক্ষ করে। পানির অম্লীয় ও ক্ষারকীয় গুণকে ভারসাম্যের মধ্যে রাখে। পানির পিএইচ চিংড়ি চাষের অনুকূলে রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পানির পিএইচ ৭.৫-৮.৫ এর মধ্যে থাকলে সেই পুকুরের চিংড়ির বৃদ্ধি ও বর্ধন ভালো হয়।

খ) চুন প্রয়োগের ফলে পুকুরের মাটি থেকে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকারক উপাদানসমূহ তথা খনিজ পদার্থ বা। মিনারেলস (যা পানির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক) অতি সহজেই মুক্ত হয়ে পানিতে মিশে। ফলে পুকুরের স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায়, যা চিংড়ির প্রাকৃতিক খাবার তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

গ) চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর, এমন ধরনের রোগ বিস্তারের উৎস, রোগজীবাণু এবং রোগজীবাণু পরিবাহক পরজীবীসমূহকে চুন ধ্বংস করে তথা জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে।

ঘ) চুন পানিতে বিদ্যমান অতিরিক্ত জৈব কণা ও কাদাকে অধঃক্ষেপ না করে পানিকে পরিষ্কার রাখতে তথাদূর করতে সহায়তা করে। পুকুরে পর্যাপ্ত আলোর অনুপ্রবেশ নিশ্চিত হয়, ফলে সালাকেসংশেষণের মাধ্যমে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়ে যায়।

ঙ) চুন পুকুরের তলদেশে সঞ্চিত দূষিত গ্যাসসমূহ দূর করে।

চ) চুনের ক্যালসিয়াম চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধিতে বিশেষ করে প্রজনন কালে ভ্রূণের বর্ধনে ও খোসা গঠনে সহায়তা করে।

ছ) চুন পানিতে প্রয়োগকৃত সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। পানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে তথা পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য ফাইটোপ্লাংকটন ও জুপ্ল্যাংকটন তৈরি করে পানির বর্ণ সবুজ করতে সহায়তা করে।

জ) চুন প্রয়োগের ফলে জৈব পদার্থসমূহ ভেঙে গিয়ে মাটি ও পানির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে।

ঝ) প্রয়োজনীয় উপকারী জীবাণুর বংশ বৃদ্ধিতে জৈব পদার্থসমূহের সুষ্ঠু পচনের জন্য চুন সহায়তা করে।

ঞ) চুন পুকুরের পানিতে ততুময় অ্যালজি থেকে মুক্ত রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ট) সালাকেসংশেষণের জন্য পর্যাপ্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরির মাধ্যমে চুন পানিতে অক্সিজেন স্বল্পতার মাত্রা কমিয়ে আনে। সালাকেসংশ্লে ষণ প্রক্রিয়াকে বৃদ্ধির মাধ্যমে চুন পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

ঠ) চুন প্রয়োগের ফলে জৈব পদার্থের পচন ক্রিয়া দ্রুত হয় এবং পুকুরের তলদেশ থেকে ক্ষতিকর কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস বের করে দেয়। ফলশ্রুতিতে পুকুরের তলার মাটি নিরপেক্ষ হয়।

ড) চুন পুকুরের পানিতে বিদ্যমান অতিরিক্ত ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম ও পটাশিয়াম আয়নের ক্ষতিকর প্রক্রিয়াকে বাধা দেয় এবং এদের বিষক্রিয়াও নষ্ট করে দেয়। এর ফলে পুকুরের স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়।

ঢ) চুন প্ল্যাংকটনের বৃদ্ধির জন্য কাদায় আবদ্ধ ফসফরাসকে মুক্ত করে দেয়।

ণ) চুন মাটি ও পানির মধ্যে সালফিউরিক অ্যাসিডের মত অত্যন্ত ক্ষতিকারক পদার্থের স্থায়ী বন্ধ হওয়াকে প্রতিরোধ করে।

ত) চুন বাফার হিসেবে (কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর সংরক্ষণাগার, কখনও শেষ হয় না) কাজ করে অর্থাৎ চুন এর বাফারিং প্রক্রিয়ায় পুকুরের পানির কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর সাথে মিশে বিভিন্ন ধাপের মাধ্যমে ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেট তৈরি করে এবং এই ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেট বাফার হিসেবে কাজ করে। ফলে পুকুরের কার্বন-ডাই-অক্সাইড চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধিতে ক্ষতিকর উৎপাদক হিসেবে কাজ করতে পারে না। এছাড়াও বাইকার্বোনেট পুকুরের পিএইচকে স্থির অবস্থায় রাখতে সহায়তা করে। উল্লেখ্য বাইকার্বনেট কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর বাফার স্টক হিসেবে কাজ করে তথা এসিডিটি, অ্যালকালিনিটি নিয়ন্ত্রন করে। তাই সালাকেসংশেষণের জন্য কখনও কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর ঘাটতি পড়ে না এবং

২০২২

ক্যালসিয়াম কার্বোনেট পানিতে অদ্রবণীয় বিধায় অদ্রবীভূত অবস্থায় পুকুরের তলায় তলানি পড়ে। কার্বন ডাই-অক্সাইড একে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করে দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেটে পরিণত করে, যা মাছ চাষের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

চুনের প্রকারভেদ

বাজারে বিভিন্ন ধরনের চুন পাওয়া যায়, যেমন- পাথুরে চুন, পোড়া চুন, কলিচুন ইত্যাদি। এছাড়াও শামুক ও ঝিনুকের খোলস পুড়িয়ে এক ধরনের চুন পাওয়া যায়। তবে এগুলো চিংড়ি চাষের পুকুরে ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া যায় না। নিচের সারণিতে চুনের প্রকারভেদ ও উৎস উল্লেখ করা হলো:

সারণি: চুনের প্রকারভেদ ও তার উৎস

ক্রমিক নং	চুনের নাম	উৎস
১	পাথুরে চুন	খনিতে প্রাপ্ত, বাজারে পাওয়া যায় না
২	পোড়া চুন	খনিতে প্রাপ্ত, পোড়ানোর পর বাজার পাওয়া যায়
৩	কলি চুন	পোড়া চুন আর্দ্রতাযুক্ত হয়ে বা পানিতে গোলানোর পর প্রাপ্ত চুন
৪	ডলোমাইট	প্রক্রিয়াজাতকৃত যৌগ চুন
৫	জিপসাম	প্রক্রিয়াজাতকৃত যৌগ চুন

প্রয়োগ মাত্রা: পুকুরের তলদেশের মাটির প্রকারভেদ, পুকুরের বয়স, পানির পিএইচ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের উপর চুন প্রয়োগের মাত্রা নির্ভর করে। কাদা মাটি, এঁটেল মাটি ও লাল মাটির পুকুরে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে একটু বেশি চুন প্রয়োজন হয়। পুকুর দীর্ঘ দিন আগাছা ও পচা আবর্জনায় পূর্ণ থাকলে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে চুন বেশি দরকার হয়। সাধারণত শতাংশ প্রতি এক কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হয়। পোড়া চুনের ক্ষমতা পাথুরে চুনের দ্বিগুণ এবং কলিচুনের ক্ষমতা পাথুরে চুনের দেড় গুণ। নিচে পিএইচ এর উপর ভিত্তি করে চুন প্রয়োগের মাত্রা দেয়া হলো:

পিএইচ মান	৩-৫ এর মধ্যে	৫-৬ এর মধ্যে	৬-৭ এর মধ্যে
পোড়া চুনের পরিমাণ	৬ কেজি / শতাংশ	৪ কেজি / শতাংশ	১-২ কেজি / শতাংশ

প্রয়োগ পদ্ধতি: পুকুর তৈরির সময় প্রয়োজনীয় চুন একটি মাটির চাড়ি বা গামলার মধ্যে কমপক্ষে ১২-২৪ ঘণ্টা আগে গুলে নিতে হবে। তারপর প্রয়োজনীয় চুন পাড়সহ সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। চুন। ব্যবহারের সময়কাল হলো চাষ দেয়ার ২-৩ দিন পর অথবা বিষ প্রয়োগের ৭-৮ দিন পর।

চিত্র: শুকনো ঘেরে চুন প্রয়োগ

চিত্র: পানি ভর্তি ঘেরে চুন প্রয়োগ

সতর্কতা

- পোড়ো চুন এবং কলি চুন অত্যন্ত ক্ষারীয় তাই এটি ব্যবহারে পিএইচ দ্রুত বেড়ে যায়, এজন্য পুকুর শুকানো অবস্থায় তা ব্যবহার করা নিরাপদ ।
- চুন ব্যবহারের সময় নাক ও মুখ গামছা দিয়ে বেধে নিতে হবে এবং বাতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে ।
- চুন গুলানোর সময় তাপ সৃষ্টি হয় সেজন্য পাস্টিকের বালতিতে চুন গুলানো যাবে না ।
- চুন শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে । ব্যবহারের পর পাত্র ভালোভাবে পরিষ্কার করে রাখতে হবে ।

পিএইচ (PH)

পিএইচ হচ্ছে কোনো দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্বের ঋণাত্মক লগারিদম, অর্থাৎ pH=-log(H') । সহজ ভাষায় পিএইচ হচ্ছে কোনো বস্তুর অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের পরিমাপক । পানির পিএইচ বলতে পানির অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের অবস্থা বুঝায় । পিএইচ ০ থেকে ১৪ পর্যন্ত বিস্তৃত । পানির পিএইচ যদি ০-৭ এর মধ্যে থাকে তবে তা অম্লীয় । এই অম্লীয় পানিতে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ বেশি থাকে । আবার পিএইচ যদি ৭-১৪ এর মধ্যে থাকে তবে তা ক্ষারীয় । এই ক্ষারীয় পানিতে অক্সাইড আয়নের (OH-) পরিমাণ বেশি থাকে । কিন্তু বিশুদ্ধ পানিতে উপরোক্ত উভয় আয়নের পরিমাণ সমান সমান থাকার ফলে পানির গুণাগুণ নিরপেক্ষ বা প্রশম হয় । অর্থাৎ পিএইচ যদি ৭ এ থাকে তবে তাদ্বারা নিরপেক্ষ মান নির্দেশিত হয় ।

১. চিংড়ি চাষের সঙ্গে পিএইচ-এর সম্পর্ক

চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার সাথে এই পিএইচ মান খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সাধারণত চিংড়ি চাষের জন্য মৃদু ক্ষারীয় পানি অর্থাৎ পানির পিএইচ ৭.৫-৮.৫ এর মাঝে হলে তা সবচেয়ে ভালো । পানির পিএইচ ৪ এর নিচে নেমে গেলে অর্থাৎ পানি খুব বেশি অম্লীয় হয় তাহলে চিংড়ি বাঁচতে পারে না । কারণ তখন পানিতে বিষাক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যায় । আবার পানি যদি খুব বেশি ক্ষারীয় হয় অর্থাৎ পিএইচ মান ৯.৫ এর বেশি হয় তাহলেও চিংড়ি স্বাচ্ছন্দ্য বাধে করে না । কারণ এই অবস্থায় পানিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ মুক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকে না । শুধু তাই নয় এই অবস্থায় পানিতে বিষাক্ত অ্যামোনিয়া গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যায় । এই দুটো অবস্থাই চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর । পিএইচ মান ১১ এর উপরে গেলে চিংড়ি মারা যায় । চিংড়ি চাষে ভালো ফল পেতে হলে মাছ চাষিকে অবশ্যই তার পুকুরের পিএইচ মান সম্পর্কে সচেতন হতে হবে । পিএইচ মান কাঙ্ক্ষিত মানের চেয়ে কম বেশি হলে তার সম্ভাব্য কারণসমূহ জেনে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে । অম্লীয় ও ক্ষারীয় পানির উৎস ও তার প্রভাব নিচে আলোচনা করা হলো:

অম্লীয় পানির উৎসসমূহ হলো

ক) মাটিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের অভাব হলে বা জৈব পদার্থ বেশি হলে পানিতে অম্লীয় অবস্থার সৃষ্টি হয় ।

খ) উষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলে অধিক পরিমাণ বৃষ্টিপাত হলে বৃষ্টির সাথে চুন মাটির অভ্যন্তরে তলিয়ে যায়, ফলে অম্লীয় অবস্থার সৃষ্টি হয় ।

২০২২

গ) বিভিন্ন কলকারখানার আবর্জনা পানিতে পতিত হয়ে পানির অম্লত্ব বাড়াতে সহায়তা করে, কেননা এই সকল বর্জ্য পদার্থ বিদ্যমান থাকে।

চিংড়ি চাষে অম্লীয় পানির প্রভাব

ক) পিএইচ মান ৫-এর নিচে থাকলে অভিস্রবণ-এর মাধ্যমে চিংড়ি দেহের রক্ত থেকে সোডিয়াম ক্লোরাইড আয়নসমূহ বের হয়ে যায়। চিংড়ি পর্যায়ক্রমে সোডিয়াম ও ক্লোরাইড আয়ন হারানোর ফলে রক্তের গঠন ঠিক রাখতে না পেরে দুর্বল হয়ে পরিশেষে মারা যায়। পানিতে ক্যালসিয়াম কম থাকলে এ ক্ষতি আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে।

খ) শরীর থেকে প্রচুর বিজল (mucous) বের হয় এবং চিংড়ি ধীরে ধীরে তার কর্মক্ষমতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, খাদ্য গ্রহণ ও খাদ্য পরিবর্তন করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ফলে চিংড়ি মারা যায়।

গ) চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় ও অনেক সময় খাবারের রুচি হারিয়ে ফেলে।

ঘ) চিংড়ি আঘাতপ্রাপ্ত হলে সহজে ঘা সারে না।

ঙ) পানিতে অম্লত্বের পরিমাণ বেশি হলে চিংড়ির প্রজনন অঙ্গের বৃদ্ধি অসম পর্যায়ের হয়ে থাকে, যা ডিম পরিস্ফুটন বা পোনা উৎপাদনে বাধার সৃষ্টি করে।

চ) পুকুরের পানিতে সহজে চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হতে পারে না।

ছ) পানিতে অক্সিজেন থাকা সত্ত্বেও চিংড়ি তা গ্রহণ করতে পারে না ফলে চিংড়ি পানির উপর ভেসে উঠে ও পরিশেষে মারা যায়।

ক্ষারীয় পানির উৎসসমূহ হলো

ক) ক্যালসিয়াম এবং সিলিকা সমৃদ্ধ মাটি।

খ) পুকুরের পানি ঘন সবুজ হলে অত্যধিক সালাকসংশ্লেষণের জন্য দিনের বেলায় পানির পিএইচ মান সামান্য বেড়ে যায়। ফলে পানি ক্ষারীয় হতে পারে।

চিংড়ি চাষে ক্ষারীয় পানির প্রভাব

ক) পানির পিএইচ মান ১১ এর বেশি হলে চিংড়ির মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে থাকে।

খ) পিএইচ মান বেড়ে গেলে চিংড়ির চোখের লেন্স এবং কর্ণিয়া নষ্ট হয়ে যায়, পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পায়, অসমোরেগুলেশান (osmoregulation) ক্ষমতা হ্রাস পায়, ফলে চিংড়ি দুর্বল হয়ে মারা যায়। চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও খাবারে রুচি কমে যায়। অনেক সময় চিংড়ি প্রজনন ক্ষমতাও কমে যায়।

২. পানির পিএইচ মান পরীক্ষাকরণ

পানি অম্লীয় না ক্ষারীয় তথা পানির পিএইচ মান কত তা পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। নিচে কিছু পদ্ধতি আলোচনা করা হলো

ক) লিটমাস কাগজ: লিটমাস কাগজ পানিতে ডুবানোর পর কাগজের রং যদি লাল হয়ে যায়, তবে তা অম্লীয় পানি এবং যদি নীল হয়ে যায় তথা লিটমাস কাগজের রঙের কোনো পরিবর্তন না হয় তবে তা ক্ষারীয় পানি। ২০২২

খ) ডিজিটাল পিএইচ মিটার: আধুনিক পদ্ধতিতে ডিজিটাল পিএইচ মিটারের সাহায্যে ও অত্যন্ত নির্ভুলভাবে পানির পিএইচ মান নির্ণয় করা যায়।

গ) পিএইচ পেপার: পিএইচ পেপার একটি গোলাকার চাকতির ভিতর পেচানো থাকে। পেচানো অংশ থেকে এক টুকরো (১ ইঞ্চি পরিমাণ) কাগজ নিয়ে ৩০ সেকেন্ড পানিতে ডুবিয়ে রাখার পর পানি থেকে উঠালে কাগজের রং পরিবর্তিত হবে। রং বদলানো কাগজটিকে চাকতির গায়ে আঁকা বিভিন্ন রংয়ের সাথে মিলিয়ে দেখলেই ঐ পানির পিএইচ বুঝা যাবে অর্থাৎ পানিতে ডুবানোর প্র ঐ কাগজের পরিবর্তনকৃত রং চাকতির গায়ে আঁকা যে রঙের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হবে সেখানে লিপিবদ্ধ পিএইচ মানই হবে ঐ পানির পিএইচ মান। চাষিরা পানির পিএইচ মান দেখে পুকুরের জন্য কোন ধরনের চুন লাগবে তা নির্ধারণ করতে পারবে।

৩. মাটির পিএইচ পরীক্ষা পদ্ধতি

কোনো পুকুরের তলা থেকে এক মুঠ (প্রায় ২০ গ্রাম) মাটি নিয়ে খুব ভালোভাবে শুকিয়ে গুড়া করে (০.৮৫ মিমি সাইজ) পাউডার বানাতে হবে। এই পাউডারের দ্বিগুণ পরিমাণ পরিষ্কার ফোটানা ঠান্ডা পানিতে মিশিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়ে কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে। পর দিন সকালে পিএইচ কাগজ দিয়ে থিতানো পানির পিএইচ পরীক্ষা করতে হবে। প্রাপ্ত পিএইচ হবে পরীক্ষিত পুকুরের মাটির পিএইচ।

পিএইচ কমে গেলে বা পানি অম্লীয় হলে করণীয়

যে কোন কারণে পুকুরের পানির পিএইচ কমে যেতে পারে। যদি কোনো কারণে পিএইচ মান কমে যায় তাহলে অম্লীয় পানিতে শতাংশ প্রতি ১ কেজি পোড়া চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুনের পরিমাণ অম্লতা বা পানির পিএইচ-এর উপর নির্ভরশীল।

পিএইচ বেড়ে গেলে বা পানিক্ষারীয় হলে করণীয়

অপ্রত্যাশিতভাবে পানির পিএইচ বেড়ে গেলে পিএইচ কমানোর নিমিত্ত কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে, যেমন পানির ক্ষারত্বের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে তেঁতুল গালো বা তেঁতুলসজনের পাতা ভেজানো পানি দিতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শতাংশ প্রতি ১০ কেজি কাচা গাত্রের প্রয়োগ করতে হবে। তবে শতাংশ প্রতি ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করে এ সমস্যার সমাধান করা যায়।

ক্ষারত্ব ও খরতা

হলো পানিতে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের আয়নের পরিমাপক।

১. ক্ষারত্ব: সাধারণত ক্ষারত্ব হলো কার্বোনেট, বাইকার্বোনেট ও হাইড্রোক্সিল আয়নের পরিমাপক। পুকুরে এর মাত্রা ২০ মিগ্রা/লিটার এর নিচে থাকা বাঞ্ছনীয়।

২. খরতা: সাধারণত খরতা হলো ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম আয়নের পরিমাপক। যা প্রকাশ করা হয় ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দিয়ে। মোট খরতার পরিমাণ মোট ক্ষারত্বের সাথে সম্পর্কিত। পানির খরতা ২০ মিগ্রা/লিটার।

এর কম হলে পানির বাফার ক্রিয়া (buffer action) নষ্ট হয়ে যায় এবং চিংড়ির জন্য তা বিশেষভাবে ক্ষতিকর। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ভালো জলাশয়ের খরতা ৪০-২০০ মিগ্রা/লিটার এর মধ্যে হওয়া উচিত।

চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে ক্ষারত্ব ও খরতার প্রভাব।

চিংড়ি চাষের জন্য হালকা খর পানি সবচেয়ে ভালো। ক্ষারত্ব ও খরতার মান ২০ মিগ্রা/লিটার এর কম ও ৩০০ মিগ্রা/লিটার এর বেশি হলে পানির বাফারিং ক্ষমতা কমে যায়। ফলে পানির পিএইচ দ্রুত উঠানামা করে। পুকুরে সার দিলে তা কার্যকর হয় না। ক্ষারত্ব ৩০০ মিগ্রা/লিটার এর বেশি হলে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশী-লতা (ফাইটোপ্ল্যাংকটন) হ্রাস পায়। কারণ তখন সালোকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ মুক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকে না। চিংড়ি সহজেই অম্লতা ও অন্যান্য ধাতুর বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়।

হার্ডনেস: হার্ডনেস- এরদ্বারা পানিতে দ্রবীভূত ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়াম লবণসমূহের মাত্রা বুঝায়। হার্ডনেস মাছ/চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে।

ছ. পুকুরে সার প্রয়োগ

কৃষিজ ফসলের অধিক ফলনের জন্য যেমন জমিতে সার প্রয়োগ করতে হয়, তেমনি চিংড়ির অধিক উৎপাদনের জন্যও পুকুরে সার প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে জৈব এবং অজৈব (রাসায়নিক) উভয় সারই প্রয়োগ করা হয়। পুকুরে প্রাকৃতিক খাবার জন্মানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়ামের দরকার হয়। তাছাড়াও ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, কপার, জিংক প্রভৃতি যৌগের দরকার হয়। পুকুরে যে চুন দেয়া হয় তা ক্যালসিয়ামের উৎস হিসেবে কাজ করে। আমাদের দেশের মাটিতে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস ব্যতীত বাকি যৌগগুলো চিংড়ির প্রাকৃতিক খাবার জন্মানোর জন্য মোটামুটি যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। তাই পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈরির জন্য বাইরে থেকে কেবল নাইট্রোজেন ও ফসফরাস সরবরাহ করলেই চলে।

চিত্র: ঘেরে সার প্রয়োগ

সারের প্রকারভেদ: সার প্রধানত দু'ধরনের, যথা

ক) জৈব সার, যেমন- গোবর, কম্পোস্ট ইত্যাদি।

খ) অজৈব সার, যেমন- ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি ইত্যাদি।

প্রয়োগ মাত্রা

ক) গোবর= ৮- ১০ কেজি/শতক ও কম্পোস্ট= ১০-১২ কেজি/শতক

খ) ইউরিয়া= ২০০ গ্রাম/শতক ও টিএসপি ১০০ গ্রাম/শতক

সার প্রয়োগে বিবেচ্য বিষয়সমূহ হলো

ক) কী পরিমাণ সার পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে তা নির্ভর করে মাটির গুণাগুণ ও উর্বরতা শক্তির উপর।

খ) সাধারণত বেলে মাটিতে যেখানে পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ কম থাকে সেখানে সারের পরিমাণ একটু বেশি দিতে হয়। আবার পলি মাটিতে যেখানে পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ বেশি থাকে সেখানে পরিমাণ একটু কম। দিতে হবে।

গ) জৈব সারের পরিমাণ একটু বেশি দিলে অজৈব সারের পরিমাণ সে অনুপাতে কম দিলেই চলবে।

ঘ) জৈব সার খুব বেশি পরিমাণে দেয়া ঠিক না। কারণ জৈব সার পচে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস মুক্ত করার সময় পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন ব্যবহার করে এর পরিমাণ কমিয়ে দেয় এবং পানিতে বিষাক্ত অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি হয়।

ঙ) জৈব সার পুকুর শুকনো অথবা পানি থাকা অবস্থায় দেয়া যাবে। তবে শুষ্ক অবস্থায় দিলে তা মাটির সাথে মিশানোর জন্য চাষ দিতে হবে।

চ) অজৈব সার শুষ্ক পুকুরে দেয়া যাবে না।

ছ) অজৈব সার চিংড়ি ছাড়ার ৪/৫ দিন পূর্বে দিতে হবে।

জ) সার বৃষ্টির দিনে না দিয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ঝ) পুকুর শুকনো থাকলে নাইট্রোজেনের উৎস হিসেবে ধৈঞ্চার চাষ করে ২ ফুট লম্বা হওয়ার আগেই মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া যেতে পারে।

অজৈব সার হতে পাওয়া যায় ?

ক) ইউরিয়া- নাইট্রোজেনের উৎস।

খ) টিএসপি (ট্রিপল সুপার ফসফেট)- ফসফরাসের উৎস।

সাবধানতা

ক. সার খুব বেশি পরিমাণে দেয়া উচিত নয়। বিশেষ করে জৈব সার বেশি দিলে সেগুলো পচনের সময় পানি থেকে অধিক অক্সিজেন ব্যবহার করে পানিকে অক্সিজেন শুন্য করে ফেলে এবং বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত গ্যাস তৈরি করে।

খ. অজৈব সার অধিক ব্যবহারে পুকুরে ফাইটোপ্ল্যাংকটনের পরিমাণ অধিক বৃদ্ধি ঘটিয়ে পানি খুব বেশি সবুজ হয়ে পুকুরের উপরিভাগে সবুজ বা বাদামি স্তর সৃষ্টি করে। যার ফলেও অক্সিজেনের অভাব ঘটে পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

২০২২

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. চিংড়ি খামারে ভেটকি মাছকে কী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়?

২. রোটেনন কোন গাছের শিকড় থেকে উৎপন্ন হয়?

৩. একর প্রতি রোটেনন প্রয়োগের মাত্রা কত?

৪. বাণিজ্যিকভাবে তৈরি রোটেনন পাউডারে কী পরিমাণ রোটেনন থাকে?

৫. ফসটক্সিনের বিষক্রিয়া কতদিন পর্যন্ত থাকে?

৬. চা বীজের খৈলের বিষক্রিয়া কতদিন পর্যন্ত থাকে?

৭. ব্লিচিং পাউডারের বিষক্রিয়া কতদিন পর্যন্ত থাকে?

৮. মহুয়া বীজের খৈল কোন কাজে ব্যবহৃত হয়?

৯. চুন প্রয়োগে কোন ধরনের এ্যালজি নিয়ন্ত্রণ করা যায়?

১০.ইউরিয়া সার কিসের উৎস?

১১.টিএসপি সার কিসের উৎস?

১২.অজৈব সার চিংড়ি ছাড়ার কয়দিন পূর্বে দিতে হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. চিংড়ি চাষে পুকুর প্রস্তুতকরণের উদ্দেশ্য কি?

২. ভৌত পদ্ধতিতে রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্ছিত প্রাণী দমনের পদ্ধতি বর্ণনা কর ।

৩. দশটি রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছের নাম লিখ ।

৪. মাটির পিএইচ মান নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা কর ।

৫. পানির পিএইচ মান নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা কর ।

৬. বিভিন্ন ধরনের চুনের উৎস উল্লেখ কর ।

৭. চুন প্রয়োগের সতর্কতাসমূহ উল্লেখ কর ।

৮. ঘেরে সার প্রয়োগের সময় বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ কর ।

৯. পুকুর/ঘেরে বিভিন্ন ধরনের সার প্রয়োগের মাত্রা উল্লেখ কর ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিংড়ি চাষে পুকুর প্রস্তুতির ধাপসমূহ বর্ণনা কর ।

২. রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণের পদ্ধতি বর্ণনা কর ।

৩. চুনের প্রধান প্রধান গুণাবলিসমূহ উল্লেখ কর ।

৪. পুকুরে সার প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা কর ।

৫. চিংড়ি চাষে পানির পিএইচ-এর গুরুত্ব বর্ণনা কর ।

২০২২

সপ্তম অধ্যায়

পোনা মজুদ

পোনা মজুদ ব্যবস্থাপনায় ত্রুটির কারণে খামারে পোনা ছাড়ার পর পরই অনেক সময় ব্যাপকভাবে পোনা মারা যায়। সাধারণত পোনা মজুদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাবেই এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করা হয় এবং দূর-দূরান্ত থেকে এসব পোনা পরিবহন করে এনে খামারে মজুদ করা হয়। ফলে পরিবেশের পরিবর্তন ক্লেশ, পোনার ক্লেশ এবং খামারের পানিতে খাপ খাওয়ানো বা অভ্যস্তকরণ ঠিকমত না হওয়ার ফলে পোনা মারা যায়। তাই পোনা মজুদ ব্যবস্থাপনার মূল বিষয়গুলোর প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিলে মজুদকালে পোনার মৃত্যুহার যথেষ্ট পরিমাণে কমানো সম্ভব। মজুদ ব্যবস্থাপনার মূল বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

ক. পোনা শনাক্তকরণ,

খ. পোনার উৎস ও সংগ্রহ পদ্ধতি,

গ. পোনা আহরণ ও গণনা,

ঘ. পোনা টেকসইকরণ ও পরিবহন, এবং

ঙ. পোনা শোধন, পরিবেশ সহনশীলকরণ ও ছাড়া।

ক. পোনা শনাক্তকরণ

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল, সাগর এলাকা, নদ-নদী ও খাল-বিলে বিভিন্ন প্রকার চিংড়ি পোনার উৎসস্থল। চাষের জন্য বিশেষ করে লোনা পানির বাগদা চিংড়ির পোনা এবং মিঠা পানির গলদা চিংড়ির পোনা প্রাকৃতিক উৎস নির্ভর। প্রাকৃতিক উৎস থেকেই মূলত এসব চিংড়ি পোনা সংগ্রহ করা হয়। প্রাকৃতিক উৎস থেকে এসব পোনা সংগ্রহের সময় অন্যান্য বিভিন্ন প্রজাতির পোনা ধরা পড়ে। বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ির পোনা থেকে বাগদা ও গলদা চিংড়ির পোনা শনাক্ত করে আলাদাভাবে সংগ্রহ করা হয়। এজন্য বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি পোনার শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যের ওপর সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার চিংড়ি পোনার শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা হলো:

১. বাগদা চিংড়ি: বাগদা চিংড়ির পোস্ট লার্ভা বা পিএল অন্যান্য চিংড়ির পোস্ট লার্ভার চেয়ে আকারে বড় হয়। দেহের গঠন সরু এবং লম্বাটে হয়ে থাকে। চক্ষু তুলনামূলকভাবে বড়। পিএল-এর দেহের দৈর্ঘ্য বরাবর লেজ পর্যন্ত বাদামি রঙের দাগ দেখা যায়। জুভেনাইল অবস্থায় এই দাগ সবুজ বর্ণ ধারণ করে এবং পেটের দিকে তখন এটি একটি কাঠির মত দেখায়। খড়গ বা তুণ্ড সোজা এবং ডগাটি সামান্য উপর দিকে বাঁকানো থাকে। খড়গের উপর তলে ৫টি দাঁত দেখা যায়। ১ম তিন জোড়া পায়ের শেষ প্রান্তে ছোট চিমটা আছে। ২য় পা ১ম পায়ের চেয়ে সামান্য লম্বা এবং ৩য় পায়ের চাইতে ছোট বা সমান।

চিত্র: বাগদা চিংড়ির পিএল

২০২২

২. চাকা চিংড়িঃ এই চিংড়ির পোনা বাগদা চিংড়ির পোনার চেয়ে আকারে অনেক ছোট। এদের দেহের রং স্বচ্ছ সাদা এবং রোস্ট্রামের অগ্রভাগ গোলাপী রঙের হয়ে থাকে। পুচ্ছ পাখনা এবং টেলসনে অস্পষ্ট লালচে বাদামি দাগ দেখা যায়। চক্ষু দণ্ড হালকা হলুদ বর্ণের এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ উদর খণ্ডে মধ্যবর্তী পৃষ্ঠ কাঁটা থাকে। রোস্ট্রামের উপরিভাগে ১ টি মাত্র দাঁত দেখা যায় এবং এই রোস্ট্রাম চক্ষু ছাড়িয়ে সম্মুখের দিকে প্রসারিত। এরা পাত্রের গা ঘেঁষে দ্রুত সাঁতার কাটে এবং নাড়াচাড়া অনুভব করলে লাফাতে চেষ্টা করে, সাধারণত এরা সাঁতারের সময়ে ধড়ের মাঝামাঝি সামান্য উঁচু করে সাঁতার কাটে।

চিত্রঃ চাকা চিংড়ির পোনা

৩. বাঘা চামা চিংড়িঃ এই চিংড়ির পোনার দেহের রং সাদাটে তবে স্বচ্ছ নয়। এদের শরীরে অবস্থিত লালচে রঙের দাগগুলো গাঢ় বর্ণের। এন্টেনা ও অ্যান্টিনিউলের তন্তুগুলো লাল বর্ণের হয়ে থাকে। ডানায় ৩-৪টি রঞ্জন কণা থাকে। এদের রোস্ট্রাম চাকা চিংড়ির মতই লম্বা ও পাতলা তবে চাকার মত মাথার খোলসের ওপর অতটা বিস্তৃত বা উঁচু নয়। সাঁতার কাটার সময় এরা মাথা ও লেজের দিক পর্যন্ত লম্বা রেখে পৃষ্ঠদেশ কিছুটা বাঁকিয়ে সাঁতার কাটে।

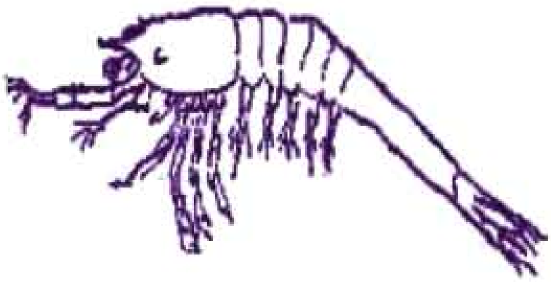

চিত্রঃ বাঘা চামা চিংড়ির পোনা

৪. বাগতারা চিংড়িঃ এই পোনা দেখতে অনেকটা বাগদা চিংড়ির পোনার মত, তবে তুলনামূলক-ভাবে বাগদা পোনার চেয়ে আকারে ছোট। রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৪-৫ টি দাঁত আছে। পোনার উদরের তলদেশে ৪-৫টি লালচে বাদামি রঙের ফোটা ফোটা দাগ থাকে। ষষ্ঠ উদর খণ্ডকের পিঠের দিকে একটি কাঁটা থাকে। এদের তলপেটে পিছন দিকে ইংরেজি এম অক্ষরের মত নীলাভ কালো দাগ দেখা যায়।

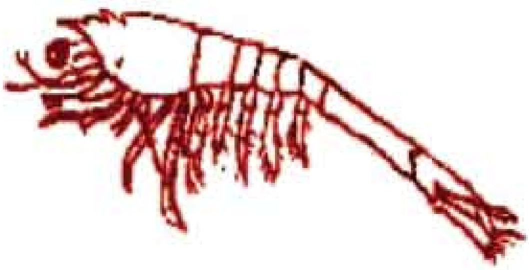

চিত্রঃ বাগতারা চিংড়ির পোনা

৫. হরি চিংড়িঃ এরা দেখতে অনেকটা হরিণা চিংড়ির মত এবং দেহের রং অনেকটা বাদামি বা খয়েরি রঙের। তাদের বৃন্তে লালচে ধরনের রঞ্জক কণা থাকে। এদের রোস্ট্রাম। ত্রিকোণাকৃতির এবং এর উপরিভাগে ৪-৭টি দাঁত থাকে। চক্ষু বৃন্তের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত। উদর খণ্ডকের পাশের নিচের দিকে লাল ইটের মত ডোরা এবং ইউরোপডড ও লেজে দাগ থাকে।

চিত্রঃ হরি চিংড়ির পোনা

৬. কেরানী চিংড়িঃ এদের রোস্ট্রাম ছোট, অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ ও ত্রিকোণাকৃতির। রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৩-৪টি দাঁত থাকে, তবে নিচের টি দিকে কোনো দাত থাকে না। ক্যারোপসে ২ ৩টি এপিগ্যাস্ট্রিক কাটা থাকে। ইউরোপডডের ডানায় একটি বাদামি ফোটা দাগ থাকে। এদের শরীরে এ্যান্টিনাল ও হেপাটিক কাটা দেখা যায়। এন্টিনিউলার পেডাংকেলের অগ্রভাগ রঙিন এবং এদের লেজে ছাপে ছাপে দাগ থাকে।

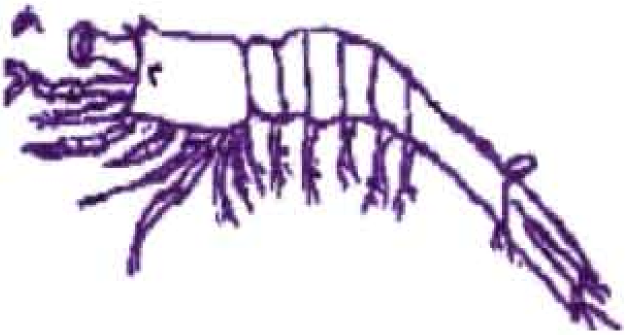

চিত্রঃ কেরানী চিংড়ির পোনা

৭. পোসা চিংড়িঃ এদের রোস্ট্রাম ছোট, তীক্ষ্ণ এবং ত্রিকোণাকৃতির। রোস্ট্রামের উপরিভাগে ২টি দাঁত থাকে। দেহের রং বাদামি এবং উদরের তলদেশে ১-২টি বাদামি ফোটা দাগ থাকে। প্রতিটি উদর খণ্ডক ও টেলসনের মধ্যাংশে গাঢ় বর্ণের দাগ বিদ্যমান।

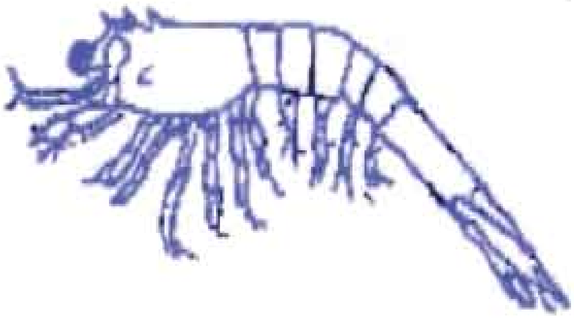

চিত্রঃ পোসা চিংড়ির পোনা

৮. বাঘাতারা চিংড়িঃ এই চিংড়ির পোনার রোস্ট্রাম সরু, লম্বা, সোজা এবং চক্ষুপুঞ্জের মাঝামঝি পর্যন্ত বিস্তৃত। রোস্ট্রামের উপরিভাগে ২টি দাঁত থাকে। এন্টিনিউলার পেডাংকলের রং হালকা খয়েরি। দেহের রং বাদামি এবং উদর খণ্ডকে কোনো পৃষ্ঠ কাটা নেই। টেলসনের কিনারা, প্রান্ত ও পশ্চাৎ পার্শ্বে (৮+১+৮) মোট ১৭টি কাটা থাকে।

চিত্রঃ বাঘাতারা চিংড়ির পোনা

৯. বাগদা চিংড়ি : এই চিংড়ির পোনার দেহ অনেকটা গোলাকৃতি এবং মোটা ধরনের। মস্তক অংশ দেহের অন্য অংশের চেয়ে বড়। রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৫-৭টি ও নিচের দিকে। ৬-১০টি দাঁত থাকে। দেহের রং সাদা মাখনের মত।

চিত্রঃ বাগদা চিংড়ির পোনা

১০. গলদা চিংড়িঃ গলদা চিংড়ির পিএল দেখতে স্বচ্ছ এবং পিএল এর মাথার খোলস-এর উপর ২-৫টি লম্বালম্বি কাল বর্ণের বন্ধন থাকে। ক্রমান্বয়ে গলদা বড় হতে থাকলে উক্ত বন্ধন বিলুপ্ত হয়ে পেটের প্রতিটি খণ্ডের সংযোগস্থলে বলয় দেখা যায়। পিএল পর্যায়ের বয়স ৩০-৩৫ দিন এবং দৈর্ঘ্য ১-১.৫ সেমি হয়। গলদা চিংড়ির রোস্ট্রাম বাঁকানো এবং উপরে নিচে খাঁজ কাটা থাকে। পাগুলো বেশ লম্বা হয় এবং ১ম ও ২য় জোড়া পা চিমটাযুক্ত।

চিত্রঃ গলদা চিংড়ির পিএল

১১. ছটকা চিংড়িঃ এদের শিহাবেক্ষ অংশে লম্বালম্বি অস্পষ্ট দাগ থাকে। উদর অঞ্চলের পার্শ্বীয় অংশে ক্ষুদ্র বিন্দুর সমন্বয়ে গঠিত দাগ পরিলক্ষিত হয়। এই দাগগুলো সারিবদ্ধ ও নিয়মিতভাবে বিন্যস্ত। এই চিংড়ির পোনার রোস্ট্রামটির দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত ছোট।

খ. পোনার উৎস ও সংগ্রহ পদ্ধতি

দুটি উৎস থেকে বাগদা চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করা যেতে পারে। উৎস দুটি হচ্ছে প্রাকৃতিক উৎস ও হ্যাচারি বা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র। বাংলাদেশে মূলত প্রাকৃতিক উৎস থেকে বাগদার পোনা সংগ্রহ করা হয়।

১. প্রাকৃতিক উৎস

সাধারণত 'জো' 'বা' 'গোণ' কালীন সময়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বাগদার পোনা পাওয়া যায়। ডিসেম্বর-এপ্রিল মাসের মধ্যে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার ২য়-৫ম দিনের জোয়ার-ভাটার সময় পানির ওঠা-নামা সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। এই জোয়ার-ভাটায় পানির সর্বোচ্চ ওঠা-নামাকে খুলনা অঞ্চলে গাঙ্গে এবং কক্সবাজার অঞ্চলে জো (tidal fluctuation) বলা হয়। এই জোয়ার আরম্ভ হওয়ার পর ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম ঘণ্টাই পোনা আহরণের সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত সময়। বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার টেকনাফ, মহেশখালী, চকোরিয়া, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী জেলার মহিপুর, রাঙাবালি, খেপুপাড়া ও ভালো জেলার চরকচ্ছপিয়া, ঢালচর, চর কুকরি-মুকড়ি এলাকায় প্রচুর পরিমাণে বাগদার পোনা পাওয়া যায়। বাংলাদেশের কিছু কিছু এলাকায় সারা বছরই বাগদার পোনা পাওয়া যায়। তবে ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে সবচেয়ে বেশি পোনা ধরা পড়ে। বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের কয়েকটি উপকূলীয় নদীতে পোনা আহরণের ওপর বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার ফলাফল নিচের সারণিতে দেখানো হলোঃ

সারণিঃ দক্ষিণাঞ্চলীয় নদীসমূহে বাৎসরিক গড় লবণাক্ততার মাত্রা ও পোনা ধরার হার

নদীর নাম	লবণাক্ততার মাত্রা (পিপিটি)	বাৎসরিক গড় পোনা ধরার হার			
		বাগদা	অন্যান্য চিংড়ি	মৎস্য প্রজাতি	জুপ্লাংটন
ইছামতি(সাতক্ষিরা)	১-১৬	০.৬১	৬৮.৯৩	৫.৩৬	২৫.১০
কাকশিয়ালি	১-১৭	০.৭৩	২৮.৯৭	৭.০৬	৬৩.২৪
কালিন্দি	১-১৮	১.৭৯	৪১.৬৭	১০.২২	৪৬.৩২
খোলপেটুয়া	৯-২৩	০.৬৬	২০.৩০	৪.৩০	৭৪.৭৪
মাদার	৭-২২	১.০৯	২৬.৮২	৫.৩৪	৬৬.৭৫
পশুর (বাগেরহাট)	০-১৫	২.২৯	২৭.৬৭	১০.৮১	৫৯.২৩
মংলা	০-১৫	২.১৭	৪৫.১৬	১০.৮৫	৪১.৮২
পানগুচি	০-০৫	২.২৬	২৮.২৪	১৮.১২	৫১.৩৮
মোট গড়		**১.৪৫**	**৩৫.৯৭**	**৯.০১**	**৫৩.৫৭**

এই গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখা যায়, সাতক্ষীরা অঞ্চলে একটি বাগদার পোনা সংগ্রহ করতে ৩৮ টি অন্যান্য প্রজাতির চিংড়ি, ৩টি মৎস্য প্রজাতি ও ৫৬ টি বিভিন্ন প্রজাতির জুপ্ল্যাংকটন ধ্বংস হয়, যা ক্রমান্বয়ে উপকূলীয় নদীসমূহের

জীব-বৈচির্ত্যকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলছে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত পোনা চাষের ক্ষেত্রে অসুবিধাসমূহ হলোঃ

ক) এই পোনার সাথে অন্যান্য চিংড়ির পোনা এবং রাক্ষুসে মাছের পোনা থাকে।

খ) একই বয়সের ও একই আকারের পোনা পাওয়া যায় না।

গ) সময়মত পর্যাপ্ত পরিমাণে পোনা পাওয়া যায় না।

ঘ) আহরণ ও পরিবহনজনিত চাপে অনেক সময় পোনা মারা যায়।

ঙ) পোনা শনাক্তকরণ, গণনা ও পরিবহনের সময় অসতর্কতার ফলে অনেক পোনার অঙ্গহানি হয়ে থাকে। ফলে এসব অসুস্থ পোনা থেকে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাওয়া যায় না।

চ) অত্যন্ত দুর্গম এলাকায় এই পোনা আহরণ করা হয়ে থাকে, ফলে এসব পোনা সংগ্রহ করা বেশ কষ্টসাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ।

২. হ্যাচারি বা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র

আধুনিক পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের পূর্বশর্ত হচ্ছে সময়মত পর্যাপ্ত পরিমাণে নির্ভেজাল পোনার প্রাপ্তি। সময়মত উন্নতমানের পোনা কেবল কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র থেকেই পাওয়া সম্ভব। কিন্তু বাংলাদেশে চিংড়ি হ্যাচারি শিল্প এখনও নানা কারণে বিকাশ লাভ করেনি বললেই চলে। আমাদের দেশে হ্যাচারিতে বাগদার পোনা উৎপাদন এখনও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে খুবই স্বল্প মাত্রায় উৎপাদিত হচ্ছে যা চাহিদার তুলনায় একেবারেই নগণ্য। হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা চাষের ক্ষেত্রে সুবিধাসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) সময়মত ও চাহিদামত পর্যাপ্ত পরিমাণে পোনা পাওয়া যায়।

খ) একই আকারের ও বয়সের পানা পাওয়া যায়।

গ) সুস্থ-সবল পোনা পাওয়া যায়।

ঘ) নির্ভেজাল বাগদার পোনা পাওয়া যায়। এতে অন্য কোনো চিংড়ি বা রাক্ষুসে মাছের পোনা থাকে না।

ঙ) হ্যাচারি থেকে সহজেই পোনা অন্যত্র পরিবহন করা যায়।

চ) বাগদার পালো শনাক্তকরণে কোনো সমস্যা হয় না।

গ. পোনা আহরণ ও গণনা

১. পোনা আহরণ

প্রাকৃতিক উৎস থেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে চিংড়ি পানা আহরণ করা হয় এবং বিভিন্ন আহরণ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের জাল ব্যবহার করা হয়। সাধারণত উপকূলীয় এলাকায় বেহুন্দী জাল, ছাঁকনি জাল, ঠেলা জাল ও টানা জালদ্বারা চিংড়ির পানা ধরা হয়। বাগদা চিংড়ির পোনা আহরণের সময় পোনার মৃত্যুহার ও পোনার পীড়ন যাতে কম হয় এবং অন্যান্য চিংড়ি ও মাছের পোনার মৃত্যুহার কমানো তথা উপকূলীয় নদীসমূহের জীব-বৈচির্ত্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য কতকগুলো বিষয়ের ওপর লক্ষ্য রাখা দরকার। পোনা ধরার সময় লক্ষ্যণীয় বিষয়সমূহ হলোঃ

ক) পোনা ধরার জাল থেকে নির্দিষ্ট সময় পরপর পোনা সরিয়ে ফেলতে হবে। পোনা শনাক্তকরণ ও বাছাই এর কমপক্ষে ১ ঘণ্টা পর পোনা গণনা করা উচিত যাতে পোনা পাত্রের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

খ) পোনা মজুদের পাত্র ঠান্ডা ও ছায়াযুক্ত স্থানে সযত্নে রাখতে হবে এবং পাত্রের মুখ ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে কারণ অন্ধকারময় পরিবেশ পোনার জন্য কম পীড়াদায়ক। ২০২২

গ) পোনা মজুদ পাত্রের পানি ঘন ঘন বদলানো এবং বেশি ঘনত্বে পোনা রাখা ঠিক নয়।

ঘ) আহরিত পোনা থেকে বাগদার পোনা আলাদা করে অন্যান্য মাছ ও চিংড়ির পোনা যত্ন সহকারে পানিতে ছেড়ে দিতে হবে। অন্যান্য চিংড়ির পোনা ও মাছ কোনো ক্রমেই মাটিতে ফেলা উচিত নয়।

২. পোনা গণনা

আমাদের দেশে সাধারণত প্রাকৃতিক উৎস অর্থাৎ নদী বা সাগরে যেসব পোনা আহরণ করা হয় সেসব পোনা ঝিনুক দিয়ে একটি একটি করে গণনা করা হয়। কিন্তু এভাবে বেশি পোনা গণনা করা অসুবিধাজনক। বিশেষ করে এতে পোনার ওপর পীড়ন পড়ে বলে পোনার মৃত্যুহার বেশি হয় এবং গণনা করতে সময়ও অনেক বেশি লাগে। ফলে পরিবহনকালে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। অল্প সময়ে বেশি পোনা গণনার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় ?

ক) ৩০০ অথবা ৫০০ লিটারের গোলাকার ট্যাংকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানিদ্বারা পূর্ণ করে তাতে গণনার জন্য। প্রয়োজনীয় পোনা ছাড়তে হবে।

খ) তারপর ট্যাংকের পানি প্যাডেলদ্বারা ওপর নিচ ঘুরাতে হবে।

গ) দ্রুত ১ লিটার পানি নিয়ে তাতে কতটা পোনা আছে তা ভালোভাবে গণনা করতে হবে। এভাবে উপর্যুপরি কয়েকবার এক লিটার করে পানি নিয়ে পোনা গণনা করতে হবে এবং গড়ে এক লিটার পানিতে কি পরিমাণ পোনা আছে তা হিসাব করে বের করে নিতে হবে। এরপর ট্যাংকে মোট যত লিটার পানি আছে তা দিয়ে এক লিটার পানিতে কি পরিমাণ পোনা আছে তাকে গুণ করলে মোট পোনার সংখ্যা বের হবে।

উদাহরণ: ধরা যাক একটি গোলাকার ট্যাংকে মোট ৫০০ লিটার পানি আছে। প্রথম গণনায় ১ লিটার পানিতে ৪৩০ টি, দ্বিতীয় গণনায় ১ লিটার পানিতে ৪২০টি এবং তৃতীয় গণনায় ১ লিটার পানিতে ৪৫০টি পোনা পাওয়া গেল। তাহলে প্রতি এক লিটার পানিতে গড়ে (৪৩০+৪২০+৪৫০) / ৩ = ১৩০০ / ৩ = ৪৩৩ টি পোনা পাওয়া গেল। তাহলে ট্যাংকে মোট পোনার সংখ্যা ৪৩৩ * ৫০০= ২১৫০০ টি।

এছাড়া আমাদের দেশে বিশেষ করে কক্সবাজার এলাকায় বেশ কিছু সংখ্যক বাগদার পোনার নার্সারি গড়ে উঠেছে। এসব নার্সারিতে প্রাকতিক উৎস থেকে আহরিত পোনা সংগ্রহ করে মজদ করা হয় এবং ৩-৪ পোনা নার্সারিতে বিশেষ যত্নে বা ব্যবস্থাধীনে রাখা হয়। তারপর এসব পোনা বিক্রি করে দেওয়া হয়। এসব নার্সারিতে নির্দিষ্ট আয়তনের এবং একই রঙের ২০-৩০টি পাস্টিকের গামলায় সমপরিমাণ পানি দিয়ে সারিবদ্ধভাবে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখা হয় এবং পোনা গণনা করা হয়।

বাগদা চিংড়ির ভালো ও খারাপ পিএল এর বৈশিষ্ট্য নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

পর্যবেক্ষন বিষয়	ভালো পিএল	খারাপ পিএল
দেহের রং	হালকা বাদামি বা স্বচ্ছ	লালচে বা নীল
খোলস	পরিষ্কার	নোংরা
আচারণ (সমপরিমাণ লবণাক্ত ও মিঠা পানির পিশ্রণে)	৩০-৪৫ মিনিট বেঁচে থাকে	মারা যাবে
আচারণ(গোলাকার পাত্রে স্রোত সষ্টি করলে)	স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটে	পাত্রের মাঝখানে জমা হয়

ঘ. পোনা টেকসইকরণ ও পরিবহন

১. পোনা টেকসইকরণ

পরিবহনের সময় পোনার মলমূত্র ত্যাগের ফলে পরিবহন পাত্রে যাতে কোনো গ্যাস (অ্যামোনিয়া) সৃষ্টি না হয় সেজন্য পোনাকে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে না খাইয়ে রেখে পেট খালি করা হয় এবং পোনা যাতে প্রতিকূল অবস্থার সাথে সহনশীল হতে পারে সে জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এটাই পোনা টেকসইকরণ। এক কথায় প্রতিকূল অবস্থার সাথে সহনশীল করে পোনাকে টেকসই করে নেয়াটাই হলো টেকসইকরণ। টেকসই করে পোনা পরিবহন করলে অধিক দূরত্বে পরিবহন করা যায় এবং পোনার মৃত্যুহার অনেকাংশে কমে যায়।

টেকসইকরণ পদ্ধতিসমূহ

ক) পুকুরে হাপার মধ্যে: বেড় জাল দিয়ে পোনা ধরার পর জালের মধ্যে রেখে ১০-১৫ মিনিট পোনাকে ঝাপটা দিয়ে পুনরায় পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে। পোনা পরিবহনের অন্তত ৫-৭ দিন পূর্ব থেকে ২-৩ দিন অন্তর দিনে একবার এই কাজটি করতে হবে। পরিবহনের কমপক্ষে ৮ ঘণ্টা পূর্বে পোনা ধরে হাপার মধ্যে রাখতে হবে। এই সময় কোনো ধরনের খাবার হাপায় দেয়া যাবে না।

খ) গোলাকার ট্যাংক বা সিস্টার্নে: পোনা বিক্রির আগের দিন জাল দিয়ে পোনা ধরে ট্যাংক বা সিস্টার্নে রেখে পানির ফোয়ারা দিতে হবে কমপক্ষে ৮ ঘণ্টা। এই সময় সিস্টার্নে কোনো ধরনের খাবার দেয়া যাবে না।

গ) যশোর পদ্ধতি: পোনা বিক্রির আগে যে পুকুরে পোনা টেকসই করা হয় তাকে পাকাই পুকুর বলে। পাকাই পুকুরের আয়তন ১০-৩০ শতাংশ এবং গভীরতা ৩-৪ ফুট হয়। পাকাই পুকুরে পোনা টেকসই করতে ৩-৪ দিন সময় লাগে। চালাই বা লালন পুকুর থেকে পাকাই পুকুরে পোনা স্থানান্তরের আগের দিন জাল টেনে পেনাকে পানির ঝাপটা খাওয়ানোর পর শতাংশ প্রতি ১ কেজি পচানো সরিষার খৈল প্রয়োগ করা হয়। ফলে পুকুরে অক্সিজেনের ঘাটতি হয়। পরদিন ভারে পোনা যখন পানির উপরে ভেসে খাবি খেতে শুরু করে তখন জাল টেনে পোনা এক সাথে জড় করে প্রায় আধা ঘণ্টা পানির ঝাপটা খাওয়ানোর পর পাকাই পুকুরে পোনা স্থানান্তর করা হয়। এই সময় শতাংশে ৬০০০ টি পোনা মজুদ করা হয়। পাকাই পুকুরে তার পরের ২ দিন একই পদ্ধতিতে পানির মধ্যে জাল টেনে পানির ঝাপটা খাওয়ানো এবং প্রতি ১ কেজি পচানো সরিষার খৈল ছিটানো হয়। যদি দূরবর্তী স্থানে পোনা পরিবহন করতে হয় তবে চাষিরা কখনও কখনও শতাংশ প্রতি ১৫০ গ্রাম হারে চুন প্রয়োগ করে থাকেন। পরিবহনের দিন সকালে জাল টেনে পোনা এক সাথে জড় করে প্রায় আধা ঘণ্টা পানির ঝাপটা খাওয়ানোর পর কৃত্রিম স্রোতের ব্যবস্থা করা হয়। স্রোতের বিপরীতে যে সমস্ত পোনা চলে আসে সেগুলোকেই পরিবহনের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

২. পোনা বা পিএল পরিবহন

চিংড়ি পোনার গরিবহন ঘনত্ব মূলত জাত, আকার, ওজন, তাপমাত্রা, শারীরতাত্ত্বিক অবস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে ৩৬ ইঞ্চি * ২০ ইঞ্চি আকারের পলিথিন ব্যাগ, ২০-৪০ লিটার ধারণক্ষমতার হাড়ি এবং ২০০ লিটার ধারণক্ষমতার ড্রাম চিংড়ি পোনা পরিবহনে ব্যবহৃত হয়। চিংড়ি পিএল-এর (গলদা ও বাগদা) পরিবহন ঘনত্ব নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

সারণি: চিংড়ি পিএল-এর পরিবহন ঘনত্ব

পরিবহন পদ্ধতি	বয়স	পরিবহন ঘনত্ব	পরিবহন সময়	মন্তব্য
অক্সিজেন ভর্তি পলিথিন ব্যাগ	১০-১৫দিন	১০০০-১২০০টি/ব্যাগ ১৫০০-২০০০টি/ব্যাগ ২৫০০-৩০০০টি/ব্যাগ	১৮-২৪ ঘন্টা ১২-১৬ ঘন্টা ৫-৬ ঘন্টা	ব্যাগের ১/৩ অংশ পানি এবং ২/৩ অংশ অক্সিজেন থাকতে হবে
সনাতন পদ্ধতি	১০-১৫দিন	২৫০-৫০০টি/লিটার পানিতে	১-১.৫ঘন্টা	

পরিবহনকালে পোনা মৃত্যুর কারণ

একাধিক কারণে পরিবহনকালে মাছ ও চিংড়ির পোনা মারা যেতে পারে। সাধারণত যে সব কারণে পোনার মৃত্যু ঘটে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ নিচে বর্ণনা করা হলো:

ক) অক্সিজেন ঘাটতি: যদি অধিক ঘনত্বে পোনা পরিবহন করা হয় তবে খুব দ্রুত পাত্রে অক্সিজেন ঘাটতি সৃষ্টি হওয়ার ফলে পোনা ও পিএল মারা যেতে পারে।

খ) শারীরিক ক্ষত: জাল টানা, ওজন ও গণনা করার সময় অথবা এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে স্থানান্তরের। সময় চিংড়ির পিএল-এর শরীরে আঘাত লাগতে পারে, এন্টেনা ও উপাঙ্গসমূহ ভেঙে যেতে পারে। দুর্বল ও শারীরিকভাবে ক্ষত এই সমস্ত পোনা পরিবহনকালে এবং পুকুরে মজুদের পরপরই মারা যেতে পারে।

গ) অ্যামোনিয়া সৃষ্টি: পরিবহনকালে চিংড়ির পিএল বা জুভেনাইলের নিঃসৃত মলমূত্র পচনের ফলে পাত্রে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। যার ফলে পানি বিষাক্ত হয়ে পোনা মারা যেতে পারে।

ঘ) তাপমাত্রা: পানির তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে পোনার অক্সিজেন চাহিদা বাড়ে। কিন্তু পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা কমতে থাকে। পরিবহনকালে পাত্রের পানির তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পানে মারা যেতে পারে।

ঙ) পরিবহন দূরত্ব: পরিবহন দূরত্ব যত বেশি হবে পোনা বা পিএল-এর উপর তত বেশি চাপ পড়ে। এভাবে পোনা বা পিএল যদি শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে যায়, তবে পরিবহনকালে মৃত্যুহার স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অনেক বেশি হয়।

চ) টেকসই না করে কাঁচা পোনা পরিবহন: ধানী বা চারা পোনা টেকসই না করে পরিবহন করলে এরা নাজুক বা কাচা থাকে। কাঁচা পোনা পরিবহনকালীন ধকল সহ্য করতে পারে না বিধায় অনেক পোনা মারা যায়।

ছ) রোগাক্রান্ত ও দুর্বল পোনা পরিবহন: রোগাক্রান্ত ও দুর্বল পোনা পরিবহন করলে মৃত্যুহার স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি হয়।

পরিবহনকালীন বিবেচ্য বিষয়সমূহ

ক) পানির তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে চিংড়ি পোনার অক্সিজেন চাহিদা বাড়ে। তাই পরিবহনকালে পানির তাপমাত্রা কম রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। পাত্রের পানি ঠান্ডা রাখার জন্য প্রতি ঘণ্টা পরিবহন সময়কালে প্রতি লিটার পানিতে ১০ গ্রাম হারে বরফ মিশানোর ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

২০২২

খ) পিএল-এর আকার যত বড় হবে পরিবহন ঘনত্ব তত কম হবে। সেই সাথে অক্সিজেন সরবরাহ বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) পেটে খাবার থাকলে চিংড়ি পোনার অক্সিজেন চাহিদা বেড়ে যায়। তাছাড়া পেটে খাবার ভর্তি পোনা পরিবহন করলে পরিবহনের সময় পোনা মলমূত্র ত্যাগ করে। ফলে বিষাক্ত অ্যামোনিয়া গ্যাসের সৃষ্টি হয়। সেজন্য পরিবহনের আগে টেকসইকরণ পদ্ধতিতে পোনার পেট খালি করে নিতে হবে।

ঘ) পরিবহনকালে পোনার অবস্থা খারাপ হতে পারে তা বিবেচনা করে প্রতিরোধকল্পে প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম হারে খাবার লবণ ব্যবহার করতে হবে।

ঙ) ব্যাগে যাতে কোনো প্রকার চাপ না লাগে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

চ) পরিবহন পাত্র ভেজা কাপড় বা চটদ্বারা ঢেকে রাখতে হবে এবং পরিবহনকালে ব্যাগ/পাতিল ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে।

ছ) পানি পরিবর্তনের সময় মিশ্রিত পানি এবং পাত্রের পানির তাপমাত্রা সমতায় নিয়ে আসতে হবে।

জ) একই ব্যাগ বা পাত্রে সমান আকারের পিএল পরিবহন করতে হবে এবং পাত্রের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত পোনা পরিবহন করা যাবে না।

ঝ) ব্যাগে যাতে কোনো শক্ত বস্তু যেমন-ধারালো টিনের টুকরা, পেরেক ইত্যাদির আঘাত না লাগে সে। দিকে খেয়াল রাখতে হবে। বিড়ি/সিগারেটের আগুন থেকেও ব্যাগকে সাবধানে রাখতে হবে।

ঞ) পরিবহনের জন্য সঠিক সময় হিসেবে পরিবহন করতে হবে যাতে পারে মৃত্যুহার কোনোভাবেই বেশি না হয়।

ট) পরিবহনকালে পরিষ্কার পানি সাথে রাখা এবং বারবার পাত্রের কিনারা ধুয়ে দিতে হবে, যাতে পোনা পাত্রের গায়ে লেগে না যায়।

পরিবহন পদ্ধতি

আমাদের দেশে বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে পলিথিন ব্যাগে চিংড়ির পিএল এবং ড্রাম বা অ্যালুমিনিয়ামের হাড়িতে চিংড়ির জুভেনাইল পরিবহন করা হয়ে থাকে। কখনও কখনও স্বল্প দূরত্বে হাড়িতে করে রেণু বা পিএল আবার পলিথিন ব্যাগে জুভেনাইল ও ধানী বা চারা পোনা পরিবহন করতে দেখা যায়। তবে সব সময়ই আধুনিক পদ্ধতিতে রেণু, ধানী, চারা পোনা এবং পিএল ও জুভেনাইল পরিবহন অধিক নিরাপদ। পোনা পরিবহনের প্রচলিত নিয়মসমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো

সনাতন পদ্ধতি

ক) সাধারণভাবে হাড়ি বা ব্যারেলের ৩ ভাগের ২ ভাগ টিউবওয়েলের পানি নিয়ে তাতে পুকুরের কিছু পরিষ্কার পানি মেশাতে হবে, যেমন- ২০ লিটারের একটি পরিবহন পাত্রে ১০-১২ লিটার টিউবওয়েলের পানি নিয়ে তাতে ২-৩ লিটার পুকুরের ভালো পানি মেশাতে হবে।

খ) নদী বা খাল পথে পোনা পরিবহনের সুযোগ থাকলে নৌকায় পোনা পরিবহন করা যায়।

গ) পোনা বা জুভেনাইল ভর্তি করে পাত্রের মুখ ঘন ফঁসের জাল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

ঘ) পরিবহনকালে প্রতি ২-৩ ঘণ্টা অন্তর পাত্রের ২/৩ ভাগ পানি পরিবর্তন করলে ভালো হয়।

ঙ) পরিবহনের সময় হাত দিয়ে ব্যারেলের পানি ঝাকাতে হবে।

চ) হাড়িতে পোনা পরিবহনের সময় মাঝে মধ্যে হাত দিয়ে পানি ঝকাতে/আন্দোলিত করতে হবে।

চিত্রঃ পাতিলে পোনা পরিবহন

চিত্রঃ নদী পথে পোনা পরিবহন

আধুনিক পদ্ধতি

ক) পরিবহনের কমপক্ষে ২ ঘন্টা পূর্বে খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। তবে অনেক দূরে পিএল পরিবহ-নের ক্ষেত্রে জীবিত খাদ্য হিসেবে আর্টিমিয়া বা প্রতি ৫০০ পিএল এর জন্য একটি সিদ্ধ ডিমের কুসুমের ১/৮ অংশ খেতে দিতে হবে।

খ) পলিথিন ব্যাগে ছিদ্র আছে কিনা তা ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে। একটি ব্যাগের ভেতর আরেক-টি ব্যাগ ঢুকিয়ে কোণাগুলো শক্তভাবে বাঁধতে হবে, যেন সব স্থানে কোনো ক্রমেই রেণু বা পিএল আটকে না যায়। অতঃপর ব্যাগের ১/৩ অংশে পানি দিয়ে পূর্ণ করতে হবে।

গ) শুধুমাত্র পিএল পরিবহনের ক্ষেত্রে প্যাকিংয়ের পূর্বে আশ্রয়স্থল হিসেবে কিছু জলজ আগাছা ব্যাগের ভিতর দিতে হবে। এবার পিএল বা পোনা ব্যাগের ভিতর নিয়ে ২/৩ অংশে অক্সিজেন দিয়ে পূর্ণ করতে হবে এবং

পলিথিন ব্যাগের মুখে শক্ত করে বাঁধন দিতে হবে। এক সাথে অনেক ব্যাগ পরিবহন করা হলে ব্যাগগুলো তাপ অপরিবাহী কার্টুনে নিয়ে পরিবহন করা অধিক নিরাপদ।

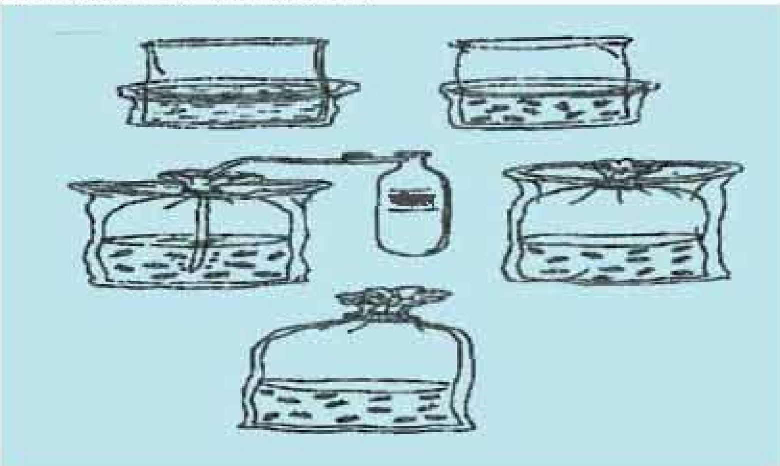

চিত্রঃ অক্সিজেন সহকারে পলিথিন ব্যাগে পিএল পরিবহন

চিত্রঃ স্থানীয় বাজার থেকে পোনা পরিবহন

ঙ. পোনা শোধন, পরিবেশ সহনশীলকরণ ও ছাড়া

১. পোনা শোধন

নিম্নলিখিত কারণে পোনা শোধন করার প্রয়োজন হয়

ক) পোনাকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য;

খ) পোনার পরিবহনকালীন আঘাতজনিত অবস্থার উন্নতির জন্য; এবং

গ) মজুদের পর যাতে সহজে রোগবালাইয়ে আক্রান্ত না হয়।

২০২২

পোনা শোধনের উপায়

ক. প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১ চা চামচ পটাসিয়াম-পার-ম্যাংগানেট বা পটাশ গুলে নিয়ে তাতে পোনাগুলোকে ৩০ সেকেন্ড ডুবিয়ে গোসল করানোর মাধ্যমে। অথবা

খ. প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০০ গ্রাম খাবার লবণ গুলে নিয়ে তাতে পোনাগুলোকে ৩০ সেকেন্ড ডুবিয়ে গোসল করানোর মাধ্যমে।

২. পরিবেশ সহনশীলকরণ ও ছাড়া

পরিবহন পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পুকুর বা ঘেরের পানির তাপমাত্রার মধ্যে সমতা আনাই হচ্ছে পরিবেশ সহনশীলকরণ। পোনার বেঁচে থাকার হার বৃদ্ধি ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য পরিবেশ সহনশীলকরণ একান্ত অপরিহার্য।

পোনা পরিবেশ সহনশীলকরণের উপায়

যে পাত্রেই পোনা পরিবহন করা হোক না কেন তা ১৫-২০ মিনিট পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে রাখতে হবে। মুখ খোলার পর হাতদ্বারা পরিবহন পাত্র এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রার ব্যবধান পরীক্ষা করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দুই পানির তাপমাত্রার ব্যবধান ১-২০ সে এর বেশি না হয়। পরিবহন পাত্র ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা সমান না হওয়া পর্যন্ত আস্তে আস্তে পাত্র এবং পুকুরের পানি অদল বদল করে পানির তাপমাত্রা সমতায় আনতে হবে।

চিত্রঃ পোনা পরিবেশ সহনশীলকরণ

পোনা ছাড়া

উভয় পানির তাপমাত্রা সমান হলে পাত্রের মুখ কাত করে ধরে বাইরে থেকে ভেতরের দিকে হাতদ্বারা হালকা স্রোতের ব্যবস্থা করতে হবে ।এ অবস্থায় সুস্থ ও সবল পোনা স্রোতের বিপরীতে ধীরে ধীরে বাইরে চলে যাবে। পাড়ের কাছাকাছি অল্প গভীরতায় পোনা ছাড়তে হবে, ঘের বা পুকুরের মাঝখানে নয়।

চিত্রঃ পোনা ছাড়া

ছাড়ার সময়

ক) সকাল অথবা বিকালে ঠান্ডার সময় পোনা ছাড়তে হবে।

খ) পোনা কড়া রোদেও সময় ছাড়া যাবে না।

গ) মেঘলা দিন, নিম্নচাপ বা ভ্যাপসা আবহাওয়ায় পোনা ছাড়া উচিত নয়।

ঘ) গলদা বা বাগদার পোনা রাত ৮-৯ টা থেকে সকাল ৮-৯ টার মধ্যে ছাড়তে হবে।

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. বাগদা পোনার রোস্ট্রীমের উপরিভাগে কয়টি দাঁত থাকে?

২.চাকা পোনার রোস্ট্রামের উপরিভাগে কয়টি দাত থাকে?

৩.গলদা চিংড়ির কোন জোড়া পা চিমটা যুক্ত?

৪. সুস্থ ও সবল বাগদা পোনার রং কেমন?

৫.চিংড়ির পোনা আহরণের ক্ষেত্রে কোন ধরনের জাল বেশি ব্যবহৃত হয়?

৬.সনাতন পদ্ধতিতে পোনা পরিবহনের জন্য কোন ধরনের পাত্র ব্যবহূত হয়?

৭.পোনা পরিবহন পাত্রের তাপমাত্রা কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড-এর মধ্যে রাখতে হয়?

৮. । পোনা পরিবহনের ক্ষেত্রে পরিবহনের কত সময় আগে পোনাকে খাওয়ানো বন্ধ করতে হয়?

৯.পরিবহন কত ঘণ্টার বেশি হলে অক্সিজেন ও বরফ উভয়ই ব্যবহার করতে হয়?

১০. পরিবহনকৃত পোনাসহ পলিথিন ব্যাগ কমপক্ষে কত সময় পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে রাখতে হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাগদা চিংড়ির পোনা শনাক্তকরণের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ ।

২. বাগতারা চিংড়ির পোনা শনাক্তকরণের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ ।

৩. কেরাণী চিংড়ির পোনা শনাক্তকরণের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ ।

৪. গলদা চিংড়ির পোনা শনাক্তকরণের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ ।

৫. জো বা গাণে বলতে কী বাঝে লেখ ।

৬. ভাল ও খারাপ পোনা শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর ।

৭. পোনা আহরণের সময় কোন কোন বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার তা উল্লেখ কর ।

৮. পোনা পরিবহনপূর্ব প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাকৃতিক উৎস ও হ্যাচারি উৎপাদিত পোনা চাষের সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা কর ।

২. পলিথিন ব্যাগে পোনা পরিবহনের ক্ষেত্রে প্যাকিং পদ্ধতি বর্ণনা কর ।

৩. পোনা গণনা পদ্ধতি বর্ণনা কর ।

৪. পরিবহনকালে পোনা মৃত্যুর কারণসমূহ বর্ণনা কর ।

৫. পোনা অভ্যস্তকরণ ও অবমুক্তকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর ।

অষ্টম অধ্যায়

পোনার মজুদোত্তর ব্যবস্থাপনা

পোনা মজুদের পর পুকুরের সার্বিক ব্যবস্থাপনা চিংড়ি উৎপাদনের পূর্বশর্ত। পোনা মজুদোত্তর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ছাড়া চিংড়ির কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন সম্ভব নয়। পোনা মজুদের পর উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমগুলো হলো:

১. পোনা/পিএল-এর বাঁচার হার পর্যবেক্ষণ,
২. চিংড়ি চাষে পানি ব্যবস্থাপনা,
৩. পানির গুণাগুণ সংরক্ষণ,
৪. সার প্রয়োগ পদ্ধতি,
৫. চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা,
৬. খামারে চিংড়ির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, এবং
৭. অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ।

১. পোনা/পিএল-এর বাঁচার হার পর্যবেক্ষণ

পুকুরে মজুদের পর বিভিন্ন কারণে আংশিক বা সম্পূর্ণ মজুদকৃত পোনা বা পিএল মারা যেতে পারে। সম্ভাব্য কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- পরিবহনজনিত ত্রুটি, শারীরিক আঘাত, পানির বিষক্রিয়া এবং হঠাৎ করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি। এসব কারণে পোনা/পিএল ছাড়ার পর মজুদকৃত পোনা বা পিএল-এর বাঁচার হার পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

বাঁচার হার পর্যবেক্ষণ করার উপায়

মরা পোনা পানির উপর ভেসে উঠে। তাই মরা পোনা পাড়ের কাছাকাছি দেখা যায় কিনা তা খুব ভালভাবে লক্ষ্য করতে হবে। মরা পোনা পানি থেকে উঠিয়ে গণনার পর আবার সমপরিমাণ পোনা ছাড়তে হবে।

২. চিংড়ি চাষে পানি ব্যবস্থাপনা

যে কোনো জলজ উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীর সার্থকভাবে চাষের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পানির কোনো বিকল্প নেই। অথচ সেই পানি ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাই চিংড়ি চাষের প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশে বর্তমানে উন্নত প্রচলিত পদ্ধতিতে বেশিরভাগ ঘেরে চিংড়ি চাষের চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে এই পদ্ধতিতে খুব কম ঘেরেই খাদ্য ব্যবহার করা হয়। বেশিরভাগ ঘেরেই প্রাকৃতিক উৎপাদন/উৎপাদনশীলতার উপরই চিংড়ির উৎপাদন নির্ভর করে। ঘেরের প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে চিংড়ি চাষের জন্য অবশ্যই ঘেরের পানি ব্যবস্থাপনার উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

চিংড়ি চাষে পানির প্রয়োজনীয়তা

চিংড়ির চলাফেলার জন্য, চিংড়ির নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য, চিংড়ির প্রাকৃতিক খাবার উৎপাদনের জন্য এবং চিংড়িকে রোগবালাই হতে মুক্ত রাখার জন্য পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। নিচে বিভিন্ন বিষয়ে পানি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করা হলো:

ক. চলাচলের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা

বেশিরভাগ উপকূলীয় ঘেরের তলদেশ অসমতল হওয়ায় ঘেরের সর্বত্র সমানভাবে পানি থাকে না। এমনকি কোনো কোনো ঘেরে দুই গাঙের মাঝামাঝি সময়ে ঘেরের প্রায় ৩০-৪০ ভাগ এলাকায় কোনো পানিই থাকে না। পানির গভীরতা কম ও স্বচ্ছতা বেশি থাকার ফলে ঘেরের তলদেশ পর্যন্ত সূর্যালোকে পৌছায়। ফলে, নানান ধরনের উচ্চতর জলজ উদ্ভিদ (নাজাজ, কারা ইত্যাদি) জন্মে চিংড়ির চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে। এসব বিষয়সমূহ বিবেচনা করলে অনেক সময় দেখা যায় যে, ঘেরের অধিকাংশ এলাকা চাষের আওতার বাইরে থাকে। ফলে, চিংড়ির উৎপাদনের হারও অনেক কম হয়। অতএব ঘেরের সম্পূর্ণ এলাকা চাষযোগ্য করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা প্রয়োজন

ক) ঘেরের সর্বত্র যাতে সমান গভীরতায় পানি রাখা যায় সেভাবে ঘের প্রস্তুত করতে হবে।

খ) ঘেরের পানির গভীরতা প্রায় এক মিটার এবং পানির স্বচ্ছতা ২৫-৩৫ সেমি এর মধ্যে রাখতে হবে, যেন ঘেরের তলায় সূর্যালোকে না পৌঁছায়।

গ) ঘেরে জন্মানো যেকোনো উচ্চতর উদ্ভিদ পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

খ. নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা

চিংড়ির স্বাভাবিক শ্বাস গ্রহণের জন্য পানিতে ৪ পিপিএম- এর বেশি দ্রবীভূত অক্সিজেনের প্রয়োজন। অক্সিজেন এক ধরনের গ্যাস। পানিতে অক্সিজেন ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় গ্যাস, যথা: কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি দ্রবীভূত থাকে। অপ্রয়োজনীয় গ্যাসসমূহের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে মজুদকৃত চিংড়ি মারা যেতে পারে। পানির গ্যাস ধারণের একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। যদি কোন কারণে অপ্রয়োজনীয় গ্যাসের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজনীয় গ্যাসের পরিমাণ কমে যাবে। চিংড়ি চাষের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় গ্যাসের সহনীয় মাত্রা নিচের সারণিতে দেয়া হলো:

সারণি: পানিতে দ্রবীভূত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় গ্যাসের সহনীয় মাত্রা গ্যাসের নাম সহনীয় মাত্রা।

গ্যাসের নাম	সহনীয় মাত্রা	মন্তব্য
দ্রবীভূত অক্সিজেন	৫-১০ পিপিএম	৪ পিপিএম এর কম নয়
কার্বন-ডাই-অক্সাইড	<৬.০০ পিপিএম	পিএইচ কম হলে পরিমাণ বেড়ে যায়
হাইড্রোজেন সালফাইড	<০.০৩ পিপিএম	কম পিএইচ এ অধিক ক্ষতিকর
অ্যামোনিয়া	<০.০১পপিএম	উচ্চ পিএইচ এবং তাপমাত্রা অধিক ক্ষতিকর

পানিতে অপ্রয়োজনীয় গ্যাস এর মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণসমূহ হলো ?

ক) পানিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে;

খ) পানিতে অক্সিজেন এর উৎপাদন/পরিমাণ কমে গেলে;

গ) চিংড়ির অতিরিক্ত খোসা পাল্টানারে কারণে; এবং

ঘ) ঘেরের তলায় ল্যাব-এর পরিমাণ অধিক পরিমানে বৃদ্ধি পেলে।

জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণসমূহ হলো:

ক) অতিরিক্ত জৈব সার ব্যবহারের ফলে;

খ) চিংড়িকে অপরিমিত সম্পূরক খাবার সরবরাহ করলে; এবং

গ) কোনো কারণে পানির সব প্ল্যাংকটন হঠাৎ মরে গেলে।

২০২২

পানিতে অপ্রয়োজনীয় গ্যাস ও জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে করণীয়

ক) চিংড়ি ঘেরের পানিতে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে জৈব সার প্রয়োগ না করা;

খ) ঘেরে খাবারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেয়া। কারণ অপরিমিত সম্পূরক খাবার ব্যবহারে যেমন আর্থিক তি হয় তেমনি ঘেরের পানি দূষিত হয়;

গ) ঘেরে প্ল্যাংকটন উৎপাদনের সহনশীল মাত্রা বজায় রাখা;

ঘ) পানিতে প্যাডেল তুইল অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে অক্সিজেন সরবরাহ করা; এবং

ঙ) অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় যথারীতি পানি পরিবর্তন করা।

গ. প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য পানি ব্যবস্থাপনা

জলাশয়ের প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বলতে পানিতে সাধারণত ফাইটোপ্ল্যাংকটন-এর উৎপাদনের হারকে বুঝায়। ফাইটোপ্ল্যাংকটন শুধু পানিতে প্রাথমিক খাদ্যের যোগান দেয় না, সালাকেসংশেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিংড়ির শ্বাস গ্রহণ ও অন্যান্য প্রয়োজনে পানিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং ক্ষতিকর গ্যাসসমূহের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। পর্যাপ্ত ফাইটোপ্ল্যাংকটনের উপস্থিতি মাটির তলায় জন্মানো ক্ষতিকর উদ্ভিদ জন্মাতে বাধা সৃষ্টি করে এবং পানিতে দ্রবীভূত অতিরিক্ত নাইট্রোজেন ও ফসফরাস খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে পানিকে দূষণমুক্ত রাখে। এক কথায় চিংড়ির সঠিক উৎপাদনের জন্য পানির প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা সহনশীল পর্যায়ে থাকা বিশেষ প্রয়োজন। প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলি প্রয়োজনীয় মাত্রায় থাকা প্রয়োজন। এছাড়া পানিতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশসহ বিভিন্ন খাদ্যোপাদানের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। চিংড়ি খামারের পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলি ও তার সহনীয় মাত্রা নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলাঃ

সারণি: পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলি ও তার সহনীয় মাত্রা

গুণাবলি	সহনীয় মাত্রা
তাপমাত্রা	২৮-৩২° সে.
লবণাক্ততা	১০-৩০পিপিটি
রং	সবুজ,হলদে সবুজ অথবা বাদামি
গভীরতা	>১০০
স্বচ্ছতা	৩০-৪০ সে.মি.
পিএইচ	৭.৫-৮.৫
অ্যাল্কালিনিটি	৮০-২০০ পিপিএম
নাইট্রেট	>২.০০ পিপিএম
ফসফেট	০.১.-০.২০ পিপিএম

ক) তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা

পানির তাপমাত্রার হঠাৎ হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে চিংড়ির বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত হতে পারে, এমনকি চিংড়ি মারাও যেতে পারে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ঘেরসমূহে পানির গভীরতা কম থাকার ফলে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে অতিরিক্ত সূর্যতাপ কিংবা হঠাৎ বৃষ্টিপাতের ফলে পানির তাপমাত্রা অস্বাভাবিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তাপমাত্রার পরিবর্তনের ন্যায় লবণাক্ততার পরিবর্তনের ফলে চিংড়ির তেমন কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। তবে হঠাৎ ২০২২

অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে লবণাক্ততা এবং তাপমাত্রা উভয়েরই অস্বাভাবিক হ্রাস চিংড়ির ক্ষতির কারণ হতে পারে। পানির গভীরতা প্রায় ১ মিটার রাখা সম্ভব হলে এ ধরনের পরিবর্তনে চিংড়ির তেমন কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

খ) রং ও স্বচ্ছতা

সাধারণত পানিতে ফাইটোপ্ল্যাংকটনের রঙের উপর পানির রং নির্ভর করে। ফাইটোপাংকটনের রং কম লবণাক্ত পানিতে সবুজ অথবা হলদে সবুজ থাকে এবং অধিক লবণাক্ত পানিতে বাদামি হয়। ফাইটোপ্ল্যাংকটনের ঘনত্ব যত বেশি হবে পানির স্বচ্ছতাও সেই হারে কমে যাবে। কাজেই পানির স্বাভাবিক গুণাগুন ধরে রাখার জন্য পানির রং ও স্বচ্ছতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

গ) পিএইচ ও অ্যালকালিনিটি

পানিতে পিএইচ-এর গুরুত্ব এত বেশি যে এক কথায় পিএইচ-কে পানির পালস্ হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। আর পানিতে প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতার যে সুপ্ত ক্ষমতা বিদ্যমান তা নির্ভর করে পানির অ্যালকালিনি-টির উপর। চিংড়ির ভালো উৎপাদনের জন্য পানির এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি সঠিক মাত্রায় রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট দৃষ্টি দিতে হবে। কোনো কারণে পিএইচ এবং অ্যালকালিনিটি কমে গেলে চুন ব্যবহারের মাধ্যমে তা বাড়ানো যেতে পারে। ঘেরে চিংড়ি থাকা অবস্থায় কৃষিজ চুন বা ডলো চুন ব্যবহার করা নিরাপদ। কোনো কারণে পাথুরে কিংবা কলি চুন ব্যবহারের প্রয়োজন হলে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। পিএইচ-এর মান যদি ৭.৫ এর নিচে নেমে আসে কিংবা সকাল ও বিকালের পিএইচ-এর তারতম্য ০.৫ এর বেশি হয়, তাহলে অবশ্যই পানিতে চুন প্রয়োগ করতে হবে। এমতাবস্থায় একর প্রতি ৪০-৫০ কেজি (শতকে ০.৪-০.৫ কেজি) ডলো চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে। চুন প্রয়োগের ফলে পিএইচ-এর সাথে সাথে অ্যালকা-লিনিটিও বৃদ্ধি পাবে। যদি কোনো কারণে পিএইচ বেড়ে ৯.০ এর অধিক হয়ে যায় তাহলে পানি পরিবর্তন করে পিএইচ কমাতে হবে। বৃষ্টির পানি অম্ল, তাই অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের ফলে পানির পিএইচ কমে যেতে পারে। সেজন্য বৃষ্টির পর পরই ঘেরে ডলো চুন প্রয়োগ করতে হবে।

ঘ) খাদ্যোপাদান।

পানির প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা তথা ফাইটোপ্ল্যাংকটনের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পানিতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশসহ বিভিন্ন খাদ্যোপাদানের উপস্থিতি নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। এই সব উপাদান সরবরাহের জন্য পানিতে সার প্রয়োগ অপরিহার্য। চিংড়ি চাষের জন্য ঘের প্রস্তুত করার সময় পানিতে একর প্রতি ২০-২৫ কেজি (শতকে ২০০-২৫০ গ্রাম) ইউরিয়া ও ৩০-৩৫ কেজি (শতকে ৩০০-৩৫০ গ্রাম) টিএসপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। চিংড়ি পোনা মজুদ পরবর্তী প্রত্যেক মাসে একর প্রতি ১০-১২ কেজি (শতকে ১০০-১২০ গ্রাম) ইউরিয়া, ১৫-১৮ কেজি (শতকে ১৫০-১৮০ গ্রাম) টিএসপি এবং ২-৩ কেজি (শতকে ২০০-৩০০ গ্রাম) পটাশ সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। যদি চিংড়িকে সম্পূরক খাবার সরবরাহ করা হয়, তাহলে প্রথম দুই মাস পর সাধারণত সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।

ঙ) প্ল্যাংকটন মৃত্যু ও তার প্রতিকার

পানিতে কোনো খাদ্যোপাদান কিংবা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অভাব হলেই বেশিরভাগ প্ল্যাংকটন মারা যেতে পারে। প্যাকটনের এই অস্বাভাবিক মারা যাওয়াকে প্ল্যাংকটন ক্লাসও বলা হয়। এমতাবস্থায় পানি একেবারে স্বচ্ছ হয়ে যায়, পানিতে ফোম হয় এবং দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ দ্রুত কমে গিয়ে চিংড়ির জন্য সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি করে।

২০২২

এ অবস্থায় দ্রুত পানি পরিবর্তন এবং পানিতে কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। প্ল্যাংকটন হ্রাস প্রতিরোধকল্পে পানিতে নিয়মানুযায়ী চুন ও সার ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে।

ঘ. রোগ প্রতিরোধে পানি ব্যবস্থাপনা

যেকোনো পানিতেই চিংড়ি রোগের জীবাণু বিদ্যমান থাকে। উপযুক্ত পরিবেশ এবং চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলেই কেবলমাত্র রোগ জীবাণু চিংড়িকে আক্রমণ করতে সক্ষম হয়। যে পরিবেশ চিংড়ির বসবাসের জন্য অসহনশীল, সেই পরিবেশেই রোগ জীবাণুর বংশ বৃদ্ধি বেশি হয় এবং চিংড়িকে আক্রমণ করতে সহায়ক হয়। চিংড়ির চলাফেরা কোনো কারণে অস্বাভাবিক কিংবা চিংড়িকে রোগাক্রান্ত মনে হলে তাৎক্ষণিক-ভাবে পানির পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন ও অ্যালাকালিনিটি পরীক্ষা করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। পানি পরিবর্তনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রবেশকৃত পানির গুণগতমান সহনীয় পর্যায়ে থাকে। উন্নত পদ্ধতির চিংড়ি চাষে জলাধারে পানি পরিশোধনপূর্বক ঘেরে সরবরাহ করা যেতে পারে। পানি পরিশোধনের জন্য ২০-২৫ পিপিএম হারে ব্লিচিং পাউডার ট্রিটমেন্ট করা যেতে পারে। রোগ প্রতিরোধের জন্য পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলি সহনশীল মাত্রায় বজায় রাখতে হবে।

ঙ. পানির গুণাগুণ সংরক্ষণে পানি ব্যবস্থাপনা

পানির গুণাগুণ সঠিক মাত্রায় বজায় রাখা চিংড়ি চাষের সফলতার ক্ষেত্রে অন্যতম মূল চাবিকাঠি। সাধারণত পানি ব্যবস্থাপনা তথা পানির গুণাগুণ বজায় রাখার প্রধান কারণ হচ্ছে চিংড়ির বেঁচে থাকার হার বাড়ানো এবং স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি। পুকুরের পানির ভালো অবস্থা বলতে সাধারণত পানিতে পরিমিত অক্সিজেন ও অত্যন্ত কম বর্জ্যের উপস্থিতিকে বুঝায়। এই বর্জ্যের উৎস হচ্ছে চিংড়ির মল, অভুক্ত খাদ্য, শেওলা এবং অন্যান্য অণুবীক্ষণিক জীব। চিংড়ি চাষকালে তৃতীয় মাস ভুক্ত খাদ্যের প্রায় ৩০% এবং চতুর্থ মাস বা শেষ পর্যায়ে প্রায় ৫০% বর্জ্য হিসেবে পুকুরের তলায় জমা হয়। এর ফলে ক্ষতিকর শেওলার উৎপাদন ত্বরান্বিত হয় এবং একটা পর্যায়ে এসব ক্ষতিকর। শেওলা মারা গিয়ে পানি দূষিত করে তালে। ফলে চিংড়ির স্বাভাবিক জীবনযাপন এবং দৈহিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই পানির গুণগতমান বজায় রাখার উত্তম পদ্ধতি হলো নিয়মিতভাবে পুকুরের পানি পরিবর্তন করা। এর ফলে পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ বজায় থাকে, বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ, অতিরিক্ত শেওলা ইত্যাদি দূরীভূত হয় এবং নতুন পানির সাথে নতুন পুষ্টিকর পদার্থসমূহ পুকুরে সঞ্চালিত হয়। চিংড়ির পোনা মজুদের পর এক সপ্তাহ পর্যন্ত কোনো পানি পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না। তবে প্রথম মাসে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় একবার বা দু বার পানি পরিবর্তন করা ভাল। চিংড়ি চাষের পুরো সময়ে পোনা মজুদের ঘনত্ব, পানির গুণগতমান, লবণাক্ততা, প্ল্যাংকটনের ঘনত্ব, দ্রবীভূত অক্সিজেন, পিএইচ, রোগের প্রাদুর্ভাব, খাদ্য প্রয়োগের পদ্ধতি ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে পানি পরিবর্তনের মোট পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত প্রত্যেকবার পানি পরিবর্তনের সময় মোট পানির ২০-৫০% পরিমাণ পানি পরিবর্তন করা হয়। অনেক সময় প্রয়োজনানুসারে প্রতিদিন ১০% পানি পরিবর্তন করা হয় এবং নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে সাধারণত প্রতিদিনই ৩০% পানি পরিবর্তন করা হয়। পুকুরে চিংড়ির দেহের মোট ওজন অনুসারে কী পরিমাণ পানি পরিবর্তন করা উচিত তার তালিকা নিচের সারণিতে দেয়া হল।

সারণি: চিংড়ির মোট ওজন অনুসারে পানি পরিবর্তনের হার

চিংড়ির মোট অজন (গ্রাম/বর্গমিটার)	প্রতিদিন পানি পরিবর্তনের পরিমান(%)
২ গ্রামের কম	০
২-১০ গ্রাম	২
১১-২০ গ্রাম	৩
২১-৪০ গ্রাম	৫
৪১-৬০ গ্রাম	৭
৬১-৮০ গ্রাম	৯
৮১-১০০ গ্রাম	১২
১০১-১২০ গ্রাম	১৫
১২১-১৪০ গ্রাম	১৮
১৪১ গ্রামের বেশি	২০% বা তার বেশি

প্রচলিত চাষ পদ্ধতিতে ভাটার সময় প্রয়োজনে পুকুরের অর্ধেক পানি বের করে দিয়ে জোয়ারের সময় পানি ঢুকানো হয়। সাধারণত জোয়ার-ভাটার ওপর নির্ভর করে মাত্র ৫-৬ দিনে ৫০-১০০% পানি পরিবর্তন করা সম্ভব। আধা-নিবিড় বা নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে পানি পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন রকমের পাম্প ব্যবহার করা হয় এবং জোয়ারের পানির ওপর কম নির্ভর করা হয়। আধা-নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে জোয়ারের সময় স্বাভাবিকভাবে পানি পরিবর্তন করা হয় তবে ভাটার সময় প্রয়োজনে পাম্প ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে পানি দুভাবে পরিবর্তন করা যায়। প্রথম পদ্ধতিতে প্রয়োজন মত কিছুটা পানি বের করে দেয়া হয় এবং পরে সেই পরিমাণ পানি ঢুকানো হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে পুকুর/ঘেরের একদিক দিয়ে পানি প্রবেশ করানো হয় এবং অপরদিক দিয়ে পানি নিষ্কাশন করা হয়। এভাবে পানি পরিবর্তন করার পদ্ধতিকে Flow through system বলা হয়। অধিক বৃষ্টিপাতের সময় পানি পরিবর্তন না করে পানি নিষ্কাশন গেটের মুখে ফল বোর্ড স্থাপন করে পুকুরের ওপরের স্তরের পানি বের করে দেয়া উত্তম। এতে লবণাক্ততা হ্রাসের ঝুঁকি কমে যায়। সাধারণত পুকুর/ঘেরে নিম্নবর্ণিত অবস্থাদি পরিলক্ষিত হলে পানি পরিবর্তন করার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ক) সকাল (৬-৭ টা) ও বিকাল (৩-৪ টা) এই দুই সময়ে পর্যবেক্ষণকৃত পিএইচের পার্থক্য ০.৫ থেকে অধিক বা পিএইচের মান ৮.৫ এর বেশি অথবা ৭.৫ এর কম হলে।

খ) পানির স্বচ্ছতা ৮০ সেমি (৩২ ইঞ্চি) এর বেশি অথবা ৩০ সেমি এর কম হলে।

গ) পানি অত্যধিক ভারী ও গাঢ় হয়ে গেলে।

ঘ) পানিতে অজৈব কণার পরিমাণ অধিক প্রতীয়মান হলে।

ঙ) পানির উপরিভাগে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী বুদবুদ দেখা গেলে।

চ) পানিতে আন-আয়োনোইজ অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেড়ে গেলে।

ছ) এয়ারেটর চালানো অবস্থায় দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কম হলে।

৩. পানির গুণাগুণ সংরক্ষণ

পানির গুণাগুণ রক্ষার জন্য প্রধাণত তাপমাত্রা, দ্রবীভূত অক্সিজেন, পানির লবণাক্ততা, অ্যামোনিয়া, নাইট্রাইট, নাইট্রেট, খরতা ও ক্ষারত্ব, পিএইচ, হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতির ওপর বিশেষ নজর রাখা হয়। পানিতে এসব প্রয়োজনীয় গুণাগুণ না থাকলে চিংড়ির বৃদ্ধি ও বাঁচার হার কমে যায়।

ক. তাপমাত্রা: সাধারণত তাপমাত্রা সমস্ত প্রাণীর জৈব-বিপাক (Metabolism) ক্রিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৭ সে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে চিংড়ির বিপাকীয় কার্যক্রম প্রায় ১০% বৃদ্ধি হয়। একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জৈব ও রাসায়নিক ক্রিয়া যেমন বাড়ে ঠিক তেমনি তাপমাত্রা কম হলে সমস্ত ক্রিয়া কমে যায়। এই জন্য দেখা যায় ২০° সে তাপমাত্রার চেয়ে ৩০° সে তাপমাত্রায় জলজ প্রাণীসমূহের অক্সিজেন চাহিদা, খাদ্যের চাহিদা, দৈহিক বৃদ্ধির হার ইত্যাদি প্রায় দ্বিগুণ দ্রুততার সাথে বেড়ে যায়। বাগদা চিংড়ির উৎপাদনের জন্য ২৫-৩০° সে তাপমাত্রা উত্তম। ২৫° সে তাপমাত্রার নিচে চিংড়ির বৃদ্ধির হার কমতে থাকে এবং ২০° সে এর নিচে প্রায় থেমে যায়। পানির তাপমাত্রা ১৩° সে এর নিচে এবং ৩৪° সে এর উপরে হলে চিংড়ির ব্যাপক মড়ক দেখা দিতে পারে। তাপমাত্রা অত্যধিক হলে খাদ্য ও সার প্রয়োগ প্রয়োজন মত কম বা বেশি অথবা বন্ধ করে দিতে হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে পানি পরিবর্তন করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সনাতন ও হালকা উন্নত পদ্ধতির চিংড়ি চাষের পুকুরে পানির গভীরতা ঠিক রাখা সম্ভব হয় না। ফলে এ সমস্ত খামারে গরমের সময় পানির তাপমাত্রা অত্যধিক বেড়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় চিংড়ির আশ্রয়ের জন্য খামারের ভিতরের পার্শ্বে চারদিকে বা কোণাকুণিভাবে নালা থাকা প্রয়োজন। এছাড়া প্রয়োজনমত পানি পরিবর্তন করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। নার্সারিতে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য ৪-৬% এলাকাতে কচুরিপানা দেয়া যেতে পারে।

খ. দ্রবীভূত অক্সিজেন: চিংড়ি চাষের জন্য পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাগদা চিংড়ির অক্সিজেন চাহিদা তুলনামূলকভাবে বেশি। চিংড়ি চাষের পুকুরে ৫-৭ পিপিএম অক্সিজেন থাকা উত্তম। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ২.৫ পিপিএম এর নিচে নামলে চিংড়ি মারা যেতে শুরু করে এবং ১ পিপিএম এর কম হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত চিংড়ি মারা যাবে। পানিতে অক্সিজেন দ্রবীভূত হওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে পানির তাপমাত্রা, লবণাক্ততা ও বায়ুচাপের ওপর। সাধারণত তাপমাত্রা, লবণাক্ততা ও বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে গেলে পানিতে অক্সিজেনের দ্রবণীয়তা কমে যায়। পানিতে অক্সিজেনের উৎস দু'টি, যথা- বাতাস ও সালাকেসংশেষণ। আর পানিতে অক্সিজেন ঘাটতি তিন ভাবে হয়ে থাকে, যথা- রাত্রিকালে উদ্ভিদের শ্বাস গ্রহণ, প্রাণীকূলের শ্বাস গ্রহণ এবং পচনশীল জৈব পদার্থের পচন। অক্সিজেন হ্রাসের কারণে চিংড়ির দৈহিক ক্লেশ, ক্ষুদামন্দা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস এবং দৈহিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে থাকে। পুকুরে অক্সিজেন হ্রাসের লক্ষণসমূহ হলো:

ক) পানির উপর সরের মত বুদ্বুদ জমা হয়।

খ) পুকুরের তলা থেকে বুদ্বুদের আকারে গ্যাস ভেসে উঠে।

গ) অধিকাংশ শামুক ও ঝিনুক পুকুরের কিনারায় চলে আসে।

ঘ) সমস্ত চিংড়ি সাঁতার কাটতে থাকে।

ঙ) মিশ্রচাষের পুকুর হলে মরা মাছের মুখ হা করা থাকবে ও ফুলকা ফেটে যাবে।

চ) সাধারণত মেঘলা দিনে, খুব গরম পড়লে এবং মধ্যরাত থেকে ভারেবেলা পর্যন্ত পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়।

পুকুরে পানির বিভিন্ন তাপমাত্রায় অক্সিজেনের দ্রবণীয়তা ভিন্ন হয়ে থাকে। নিচের সারণিতে বিভিন্ন তাপমাত্রায় অক্সিজেনের দ্রবণীয়তা উল্লেখ করা হলো।

সারণি: পানির বিভিন্ন তাপমাত্রায় অক্সিজেনের দ্রবণীয়তা

তাপমাত্রা (°সে)	অক্সিজেনের দ্রবনিয়তা (মিগ্রা/ লিটার)	
	মিঠা পানি	সমুদ্রের পানি (৩৫ পিপিটি)
১৬	৯.৮৬	৮.০০
১৮	৯.৪৫	৭.৬৬
২০	৯.০৮	৭.৩৮
২২	৮.৭৩	৭.১২
২৪	৮.৪০	৬.৮৭
২৬	৯.০৯	৬.৫৪
২৮	৭.৮১	৬.৪২
৩০	৭.৫৪	৬.২২

পানিতে সবুজ উদ্ভিদ কণার (ফাইটোপ্ল্যাংকটন) উপস্থিতিতে সূর্যালোকের পভাবে সালাকেসংশ্লেষণ ঘটে থাকে। এই সালাকেসংশেষণ প্রক্রিয়ার সময় ফাইটোপ্ল্যাংকটন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে থাকে। রাতের বেলায় যখন সালাকেসংশেষণ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে তখন এরা অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বন-ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে থাকে। তাই যেসব পুকুরে ফাইটোপ্ল্যাংকটনের আধিক্য বেশি থাকে সে সব পুকুরে সাধারণত বিকেলবেলায় অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে এবং ভারেবেলায় অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে। ফাইটোপ্ল্যাংকটন সমৃদ্ধ পুকুরের উপরিভাগে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে এবং তলদেশে কম থাকে। তবে নিম্লেক্ত উপায়ে পুকুরের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে ?

ক) পানিতে ঢেউ এর সৃষ্টি করে, যেমন- সাঁতার কাটা, বাঁশ পেটানো ইত্যাদি।

খ) পুকুরে নতুন পানি সরবরাহ করে অর্থাৎ পানি পরিবর্তন করে।

গ) কৃত্রিমভাবে বায়ু সঞ্চালন করে। যেমন এয়ারেটর বা প্যাডেল তুইল স্থাপন করে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। পানিতে স্তর সৃষ্টি রাধে, বর্জ্য পদার্থ বের করা এবং অক্সিজেনের মাত্রা বাড়াতে এয়ারেটর অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। পুকুরের চারদিকে ৪টি এয়ারেটর ব্যবহার করলে বর্জ্য পদার্থ ঠিকভাবে এক জায়গায় জমা হতে পারে। সবগুলো এয়ারেটর এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে সব এয়ারেটর একই দিকে ঘুরে। পুকুর পাড় থেকে এয়ারেটর ৫-১০ মিটার দূরে এবং একটি থেকে অন্যটি ৩০-৩৫ মিটার দূরে স্থাপন করতে হবে।

গ. পানির লবণাক্ততা: বাগদা চিংড়ি প্রায় শূন্য থেকে ৭০ পিপিটি লবণাক্ততায় বেঁচে থাকতে পারে। তবে ১০-২৫ পিপিটি লবণাক্ততায় এদের দৈহিক বৃদ্ধি ভালো হয়। পানির লবণাক্ততা ২৫ পিপিটির বেশি হলে মিঠা পানি সরবরাহ করে পানির লবণাক্ততা কমাতে হবে। রিফ্রাক্টোমিটার বা স্যালাইনোমিটারের সাহায্যে পানির লবণাক্ততা পরিমাপ করা যায়।

ঘ. অ্যামোনিয়া : সাধারণত পুকুরের তলদেশে পুঞ্জিভূত জৈব পদার্থের পচন ও জলজ প্রাণীর বিপাকীয় ক্রিয়ায় অ্যামোনিয়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে। আধা-নিবিড় ও নিবিড় চাষের পুকুরে সাধারণত হঠাৎ করে ব্যাপক হারে ফাইটোপ্লাংকটনের মড়ক ও অন্যান্য ময়লা-আবর্জনা পচনের কারণে অনায়নিত অ্যামোনিয়া উৎপাদিত হয়। আয়োনিত (NH4') ও অনায়নিত (NH) অবস্থায় অ্যামোনিয়া পানিতে বিদ্যমান থাকে। অনায়নিত অ্যামোনিয়া চিংড়ির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। পুকুরের পানিতে অনায়নিত অ্যামোনিয়ার মাত্রা ০.০২৫ মিগ্রা/লিটার এর কম থাকতে হবে যা চিংড়ির জন্য সহনীয়। এতে চিংড়ি উৎপাদনে কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। পানিতে অনায়নিত

অ্যামোনিয়ার পরিমাণ ০.১ পিপিএম এর বেশি হলে চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ০.৪৫ পিপিএম এর বেশি হলে বৃদ্ধির হার অর্ধেকে নেমে আসে। সাধারণত পানির পিএইচ বৃদ্ধির সাথে সাথে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এজন্য পানির পিএইচ ৮.৫ এর বেশি হওয়া উচিত নয়। অ্যামোনিয়ার বৃদ্ধি পিএইচ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলে বিকাল বেলা পানিতে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেশি থাকে এবং ভোর বেলায় কম থাকে। পানিতে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য চিংড়ির মজুদ ঘনত্ব হ্রাস এবং অত্যধিক সার ও খাদ্য প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ করতে হবে।

ঙ. নাইট্রাইট (NO_2): নাইট্রাইট হচ্ছে অ্যামোনিয়া ও নাইট্রেটের মধ্যবর্তী যৌগ। অনেক সময় এই যৌগ চিংড়ির ব্যাপক মড়ক ও দৈহিক বৃদ্ধির হার হ্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নাইট্রাইটজনিত কারণে চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয়। নাইট্রাইটের মাত্রা ০.১ পিপিএম এর নিচে থাকা চিংড়ির জন্য নিরাপদ। তবে সাগরের পানিতে নাইট্রাইট কম বিষাক্ত। চিংড়ির ঘনত্ব হ্রাস ও পানি পরিবর্তন করে জিওলাইট এবং চরম বিপর্যয়ের সময় ৩.৩ কেজি/শতাংশ/৩০ সেমি পানির গভীরতায় লবণ প্রয়োগ করে নাইট্রাইটের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

চ. নাইট্রেট (NO_3) : পানিতে নাইট্রেটের মাত্রা ২০ পিপিএম-এর নিচে রাখা চিংড়ির জন্য উত্তম। নাইট্রেট চিংড়ির জন্য তেমন একটা বিষাক্ত নয়, বরং শেওলার জন্য একটি পুষ্টিকর উপাদান।

ছ. খরতা ও ক্ষারত: পানিতে দ্রবীভূত বাই-কার্বনেট ও কার্বনেট এর ঘনত্বই হলো ক্ষারত্ব। বাই-কার্বনেট ও কার্বনেট অন্য কতকগুলো উপাদানের সাথে একত্রে মিলিত আকারে থাকে। উপাদানগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেয়ামি অন্যতম। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেয়ামি এর ঘনত্বকে খরতা বলে। খরতা ও ক্ষারত্বের মান হ্রাস-বৃদ্ধি হলে পানির বাফারিং ক্ষমতা কমে যায় এবং পানির পিএইচ দ্রুত উঠা-নামা করে। এর হ্রাস বৃদ্ধির ফলে পুকুরে সার দিলে তা কার্যকর হয় না এবং চিংড়ির খোলস বদলানো বাধাপ্রাপ্ত হয়। খরতা ও ক্ষারত্বের মান ৪০-২০০ মিগ্রা/লিটার হলে চিংড়ির জন্য ভালো। পুকুরের পানি পরিবর্তন করে এবং চুন বা জিপসাম প্রয়োগ করে পানির খরতা ও ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

জ. পিএইচ: চিংড়ির জন্য পানির পিএইচ ৭.৫-৮.৫ হওয়াই উত্তম। পানির পিএইচ মান ৫ পিপিএম এর কম হলে এবং ৯.৫ পিপিএম এর বেশি হলে চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর। সাধারণত খামারে পানির পিএইচ-এর উপস্থিতির মাত্রা ফাইটোপ্ল্যাংকটন, অব্যবহৃত খাদ্যের চর্বি ও ময়লা-আবর্জনা দ্বারা প্রভাবিত হয়। দিনের বেলায় ফাইটোপ্লাংকটন সালাকেসংশেষণ প্রক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করার ফলে বিকাল বেলায় পুকুরের পানিতে পিএইচ বেড়ে যায় এবং রাতের বেলায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করার ফলে ভোর বেলা পিএইচ কমে যায়। পিএইচ এর দ্রুত উঠানামা চিংড়ির জন্য মাটেও ভালো নয়। পানির পিএইচ কমে গেলে চিংড়ির উপর নিম্লেক্ত প্রভাবগুলো পরিলক্ষিত হয়

ক) চিংড়ির দেহ থেকে সোডিয়াম ও ক্লোরাইড বেরিয়ে যায়, ফলে চিংড়ি দুর্বল হয়ে মারা যায়।

খ) চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং খাবারে অরুচি ভাব দেখা দেয়।

গ) পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়।

পানির পিএইচ বেড়ে গেল চিংড়ির উপর নিমাক্তে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়

ক) চিংড়ির ফুলকা ও চোখ নষ্ট হয়ে যায়।

খ) অভিস্রবণ (Osmoregulation) ক্ষমতা হ্রাস পায়।

গ) চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ কন্ধ করে দেয়।

চুন ও জিপসাম প্রয়োগ করে পানির পিএইচ বাড়ানো যায় এবং অ্যামোনিয়াম সালফেট (১ কেজি/শতাংশে) অথবা তুঁতে (৬-১২ গ্রাম/শতাংশে/৩০ সেমি গভীরতা) প্রয়োগ করে পানির পিএইচ কমানো যায়।

ঝ. হাইড্রোজেন সালফাইড (H2): সাধারণত পচনশীল জৈব পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়া ও অক্সিজেনের ঘাটতির ফলে পুকুরের তলদেশের মাটিতে পচা ডিমের গন্ধের অনুরূপ গন্ধ পাওয়া যায় এবং মাটির উপরিভাগে কালো আবরণের সৃষ্টি হয়। পানিতে হাইড্রোজেন সালফাইডের মাত্রা ০.১-০.২ পিপিএম হলে চিংড়ি শরীরের ভারসাম্য হারায় ও খাদ্য গ্রহণে অনীহাভাব দেখায়, ফলে চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। হাইড্রোজেন সালফাইডের মাত্রা ১ পিপিএম-এর বেশি হলে চিংড়ির মড়ক আরম্ভ হয়। পুকুরে অক্সিজেন বৃদ্ধি, সার ও খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা হ্রাস ও পিএইচ এর মাত্রা বৃদ্ধি করে হাইড্রোজেন সালফাইডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পুকুরের পানি পরিবর্তনের মাধ্যমেও হাইড্রোজেন সালফাইডজনিত সমস্যা সমাধান করা যায়।

৪. সার প্রয়োগ পদ্ধতি

সেকি ডিস্ক রিডিং নিয়ে সারের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করতে হবে। সেকি ডিস্ক ১২ ইঞ্চি পানিতে রাখার পর যদি সেকি ডিস্ক এর সাদা-কালো অংশ পরিষ্কার দেখা যায়, তবে শতাংশে প্রতি ৮০-১০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ২০-৩০ গ্রাম টিএসপি প্রয়োগ করতে হবে। এ মাত্রায় সার প্রয়োগের ৫-৬ দিনের মধ্যে সেকি ডিস্ক এর দৃশ্যমানতা না কমলে উপরোক্ত মাত্রার অর্ধেক পরিমাণ সার আবার প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণত এই পদ্ধতিতে চাষের ক্ষেত্রে প্রতি ২ সপ্তাহ অন্তর অন্তর অর্থাৎ প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যার সময় পানি পরিবর্তনের পর সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অজৈব সার ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। জৈব সার পানিতে গুলিয়ে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হয়। তাছাড়া জৈব ও অজৈব সার একসাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যায়।

চিত্রঃ অজৈব সার প্রয়োগ

চিত্রঃ জৈব ও অজৈব সার একসাথে মিশিয়ে প্রয়োগ

৫. চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা

চিংড়ির নিয়মিত নমুনায়ন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং সর্বোপরি পর্যবেক্ষণ খুব জরুরি। প্রতি ১৫ দিন অন্তর চিংড়ি ধরে নমুনায়ন ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সে সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে চিংড়ির স্বাভাবিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

চিত্রঃ চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা

২০২১

সারণি: চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা পদ্ধতি এবং করণীয়

ক্রমিক নং	পর্যবেক্ষণ	করণীয়
১.	শিরায়/পেটে খাবার আছে কি না	খাবার না থাকলে, কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং প্রয়োজনে খাবার প্রদান বৃদ্ধি করতে হবে।
২.	খোলসের উপর সাদা চাকা চাকা দাগ আছে কিনা	চিংড়ির ভাইরাস হলো কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে এবং প্রয়োজনে চিংড়ি আহরণের উদ্যোগ নিতে হবে
৩.	ফুলকা কালো হয়ে গেছে কিনা	চিংড়ি আক্রান্তের সংখ্যা বেশি হলে, ঘেরে হররা/পালা টেনে দিতে হবে এবং স্বল্প মাত্রায় চুন প্রয়োগে করতে হবে
৪.	লেজ ফোলা এবং তাতে পানি জমা হয়েছে কিনা	চিংড়ি আক্রান্তের সংখ্যা বেশি হলে, বিঘা প্রতি ১.৫ কেজি হিসেবে পটাসিয়াম-পার-ম্যাঙ্গানেট পানিতে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে
৫.	চিংড়ি দুর্বল/সতেজ কিনা	দুর্বল চিংড়ি বেশি হলে কারণ নির্ণয় করতে হবে এবং স্বল্প পরিমাণে চিংড়ি আহরণের উদ্যোগ নিতে হবে
	খোলস নরম/শক্ত কিনা	নরম চিংড়ির সংখ্যা বেশি হলে কারণ নির্ণয় করতে হবে এবং চুন প্রয়োগে করতে হবে।
	দেহের মাংশ এবং খোলসের মধ্যে কোনো ফাকা আছে কিনা	ফাকা থাকলে খাবার প্রদানের তালিকা পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজনে পরিমান বাড়াতে হবে

৬. খামারে চিংড়ির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

সাধারণত অস্বাস্থ্যকর জলীয় পরিবেশ, মজুদ ঘনত্ব বেশি, খাদ্যাভাব ইত্যাদি কারণে চিংড়ির শরীরে নানা রকম রোগের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। এজন্য চিংড়ির স্বাস্থ্য রক্ষায় পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। চিংড়ির ঘনত্ব বেশি হলে খাদ্যাভাবও প্রকট হয়। ফলে কিছু কিছু চিংড়ি দ্রুত বড় হয়ে যায় এবং দুর্বল ছোট চিংড়িগুলো খাদ্য প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। এর ফলে দুর্বল চিংড়িগুলো ধীরে ধীরে আরও দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া অধিক ঘনত্বের কারণে জলীয় পরিবেশও দূষিত হয়ে পড়ে। চিংড়ির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিম্নরূপ:

ক) পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

খ) নির্ধারিত মজুদ ঘনত্ব বজায় রাখা।

গ) খামারে সুষম ও পরিমিত খাদ্য ব্যবহার।

ঘ) অনাকাঙ্ক্ষিত প্রাণীর অনুপ্রবেশ রোধে।

ঙ) খামারে ব্যবহৃত সকল যন্ত্রপাতি ও আহরণ সরঞ্জামাদি জীবাণুমুক্ত রাখা।

চ) স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে পুকুরে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার না করা। তবে একান্তভাবেই যদি রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার করতে হয় সেক্ষেত্রে এর ব্যবহারের মাত্রা সহনশীল পর্যায়ে রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। পুকুরে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারের মাত্রা নিচের সারণিতে দেয়া হলো।

২০২২

সারণি: পুকুরে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের উদ্দেশ্য ও প্রয়োগমাত্রা

রাসায়নিক দ্রব্য	উদ্দেশ্য	মাত্রা
ফরমালিন	প্রাটোজোয়াসহ বাহ্যিক পরজীবী দমন	১৫-২৫ পিপিএম
ম্যালাকাইট গ্রীন	ফাংগাস, বাহ্যিক পরজীবী ও ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণ	২-৪ পিপিএম
পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট	ফাংগাস, বাহ্যিক পরজীবী, শেওলা ও ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণ	০.২৫-০.৫ পিপিএম
সিমাজিন	শেওলা নিয়ন্ত্রণ	০.২৫ পিপিএম
ফিটকারী	ঘালোত্ব নিয়ন্ত্রণ	১০-২০ পিপিএম
জিপসাম	ঘালোত্ব নিয়ন্ত্রণ	২৫০-১০০০ পিপিএম
কলিচুন	ঘালোত্ব নিয়ন্ত্রণ	১০০-১০০০ পিপিএম

৭. অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ

সঠিকভাবে পানি ব্যবস্থাপনা চিংড়ি উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই পানি সরবরাহ ও নির্গমন ব্যবস্থা যাতে ঠিকমত থাকে সেজন্য পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন গেট নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করতে হবে। এসব গেটে কোনো প্রকার ত্রুটি দেখা দিলে তা সাথে সাথে অপসারণ করতে হবে। তাছাড়া গেটের পার্শ্বে বা তলা দিয়ে পানি চলাচল করলে তা সাথে সাথে বন্ধ করতে হবে। অবাঞ্চিত প্রাণী নিয়ন্ত্রণের জন্য নিষ্কাশন গেটে স্থাপিত নেট নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে। এগুলো ত্রুটিপূর্ণ হলে চিংড়ি খামার থেকে বের হয়ে যেতে পারে কিংবা অবাঞ্চিত পানি খামারে প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকে। বেষ্টনী বঁধ ও পুকুরের বাঁধ নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে। বাধে কোনো প্রকার ত্রুটি থাকলে তা সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করতে হবে। খামারের অবকাঠামোসমূহ নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে আকস্মিক প্রাকৃতিক দূর্যোগকালীন সময়েও খামার/চিংড়ির ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকে।

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. পানি ব্যবস্থাপনায় পানি পরিবর্তনের সময় প্রত্যেক বার কত ভাগ পানি পরিবর্তন করা হয়?
২. নিবিড় পদ্ধতিতে চাষাবাদকালে কোন পদ্ধতিতে পানি পরিবর্তন করা হয়?
৩. পুকুরের বিভিন্ন স্তরের পানি পরিবর্তনের জন্য স্লুইস গেটের মুখে কি ব্যবহার করা হয়?
৪. পানির স্বচ্ছতা কত সেন্টিমিটারের কম বা বেশি হলে পানি পরিবর্তন করতে হবে?
৫. পুকুরের পানির তাপমাত্রা কত ডিগ্রির বেশি হলে চিংড়ির মড়ক দেখা দিতে পারে ?
৬. চিংড়ি চাষের পুকুরে দ্রবীভূত অক্সিজেনের উত্তম মাত্রা কত?
৭. ফাইটোপ্লাংকটন সালাকেসংশেষণ প্রক্রিয়ায় কোন গ্যাস ত্যাগ করে?
৮. বেশি ফাইটোপ্ল্যাংকটন যুক্ত পুকুরে কোন সময় বেশি অক্সিজেন থাকে?
৯. বাগদা চিংড়ি সর্বোচ্চ কত লবণাক্ততায় বাঁচতে পারে?
১০. চিংড়ির পুকুরে অ্যামোনিয়ার সহনীয় মাত্রা কত?
১১. চিংড়ির জন্য পানির উত্তম পিএইচ মাত্রা কত?

১২.সেক্কি ডিক রিডিং কত হলে পুকুরে সার প্রয়োগ করা উচিত?

১৩. চিংড়ির নমুনা সংগ্রহে সাধারণত কোন জাল ব্যবহার করা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. Flow through system বলতে কী বাঝে লেখ ।

২. কোন কোন অবস্থায় পানি পরিবর্তন করা দরকার তা লেখ ।

৩. চিংড়ি চাষের পুকুরের পানিতে অক্সিজেন ঘাটতির কারণগুলো লেখ ।

৪. চিংড়ির পুকুরে অক্সিজেন হ্রাসের লক্ষণগুলো লেখ ।

৫. পানিতে অক্সিজেন বৃদ্ধির উপায়গুলো লেখ ।

৬. পুকুরে অ্যামোনিয়া নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো লেখ ।

৭. পানির পিএইচ কমে গেলে চিংড়ির উপর কী ধরনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা লেখ ।

৮. পানির পিএইচ বেড়ে গেলে চিংড়ির উপর কী ধরনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা লেখ ।

৯. পুকুরে হাইড্রোজেন সালফাইড নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ লেখ ।

১০. চিংড়ি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কী কী লেখ ।

১১.অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে লেখ ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিংড়ি চাষাবাদে পানির গুণাগুণ আলোচনা কর ।

২. চিংড়ি চাষাবাদে অ্যামোনিয়ার গুরুত্ব আলোচনা কর ।

৩. পোনা মজুদোত্তর পুকুরে সার প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা কর ।

৪. চিংড়ির ওজনের ভিত্তিতে খাদ্য প্রয়োগের হার বর্ণনা কর ।

৫. চিংড়ির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগমাত্রা বর্ণনা কর ।

৬. পানির গুণাগুণ সংরক্ষণে পানি ব্যবস্থাপনা বর্ণনা কর ।

৭. পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের গুরুত্ব আলোচনা কর ।

নবম অধ্যায়

বাগদা চিংড়ির খাদ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধির জন্য পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের প্রয়োজন। পেশীকলা গঠন ও জৈবিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। আমিষ, চর্বি, শ্বেতসার, খাদ্যপ্রাণ, খনিজ পদার্থ প্রভৃতি চিংড়ির খাদ্যের প্রধান পুষ্টি উপাদান।

চিংড়ির খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

অধিকাংশ চিংড়িই সর্বভূক ও নিশাচর। এরা সাধারণত রাতের বেলায় খেতে পছন্দ করে। এরা জৈব পচা পদার্থ, ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী, উদ্ভিদকণা প্রভৃতি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও সম্পূরক খাদ্য হিসেবে শুকনো মাছের গুঁড়া, সয়াবিন চূর্ণ, চালের খুদ, ভুট্টা, গম চূর্ণ বা আটা প্রভৃতি গ্রহণ করে থাকে। বাণিজ্যিকভাবে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে উভয় প্রকার খাদ্যের উৎপাদন ও নির্দিষ্ট মাত্রায় গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য পরিবেশন করা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা চিংড়ি চাষে আশাতীত ফলন লাভ করা সম্ভব নয়। চিংড়ি চাষে সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সমূহ হলো

ক) চিংড়ির বৃদ্ধি দ্রুততর হয়।

খ) চিংড়ির বাঁচার হার বৃদ্ধি পায়।

গ) সময়মত নির্দিষ্ট আকারের চিংড়ি আহরণ করা যায়।

ঘ) নির্দিষ্ট সময়ে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ঙ) একক ও মিশ্রচাষে চিংড়ি চাষের মাধ্যমে আর্থিকভাবে অধিক লাভবান হওয়া যায়।

খাদ্যের প্রকারভেদ

দেহের পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য চিংড়ি নানা ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। খাদ্য গ্রহণের প্রকৃতিতে এরা সর্বভূক প্রাণী। খাদ্য গ্রহণে এদের কোনো বাচ-বিচার নেই। সাধারণত এরা সব ধরনের খাদ্য খেয়ে থাকে। চিংড়ির খাদ্যকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- ক. প্রাকৃতিক খাদ্য এবং খ, সম্পূরক খাদ্য।

ক. প্রাকৃতিক খাদ্য

আমাদের দেশে উন্নত সম্প্রসারিত চিংড়ি চাষ পদ্ধতিতে সাধারণত প্রাকৃতিক খাদ্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পুকুর প্রস্তুতকালে এবং পরবর্তীতে খামার ব্যবস্থাপনার সময় জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন করা হয়। প্রাকৃতিক খাদ্য আবার দু ধরণের, যেমন

ক) প্রাণী প্ল্যাংকটন- ড্যাফনিয়া, কপিপড, ক্লাডোসেরা, রটিফারস, সাইক্লপস, অস্টাকডস, ব্রাইন শ্রিম্প ইত্যাদি।

খ) উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন- ইউজেরিনা, সবুজ শেওলা, নাভিকুলা, ডায়াটমস, সুতাকার শেওলা ইত্যাদি।

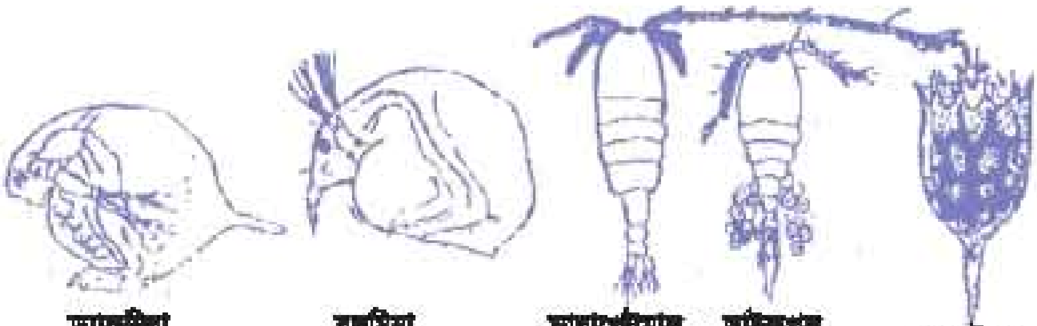

চিত্র: প্রাকৃতিক খাদ্য (প্রাণী প্ল্যাংকটন)

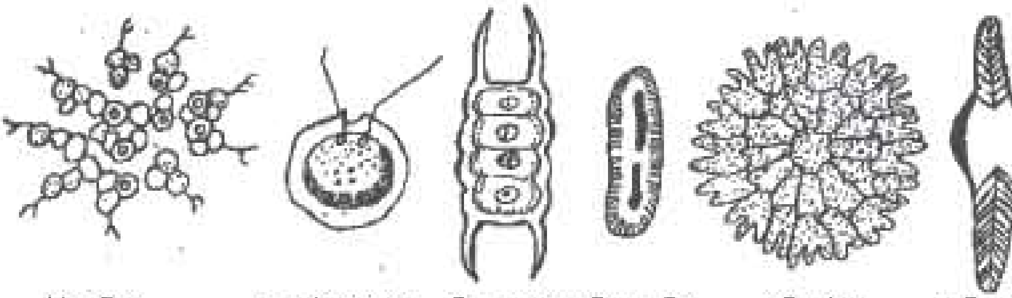

চিত্র: প্রাকৃতিক খাদ্য (উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন)

খ. সম্পূরক খাদ্য

অন্যান্য প্রাণীর মতই সুস্থভাবে বেঁচে থাকা ও দৈহিক বৃদ্ধির জন্য চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। আমাদের দেশে আধা নিবিড় বা নিবিড় চিংড়ি চাষ পদ্ধতিতে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুষম সম্পূরক খাদ্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের ফলে চিংড়ি দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি ও অণুজীবজনিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। চিংড়ি স্বভাবজাত কারণেই পুকুর বা জলাশয়ের তলদেশের খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। এ কারণেই মিশ্র মাছ চাষের ন্যায় সম্পূরক খাদ্য পানির উপরিভাগে ছড়িয়ে দেয়া চিংড়ি চাষের জন্য উপযোগী নয় বা এমন ধরনের ভাসমান খাদ্য চিংড়ির খাদ্য হিসেবে সরবরাহ করা উচিত নয়। সঠিকভাবে খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে চিংড়ির খাদ্যের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ হওয়া উচিত ;

ক) চিংড়ির খাদ্য ভাসমান হওয়া উচিত নয়।

খ) পানিতে মিশ্রিত খাদ্যের স্থায়ীকাল অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গ) মিশ্রিত খাদ্যের খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ পদার্থের গুণাগুণ দীর্ঘ সময় অপরিবর্তিত থাকা।

ঘ) খাদ্যের উপকরণের দানা খুবই ছোট আকারের হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে চিংড়ি আতি সহজেই গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

ঙ) খাদ্য চিংড়ির বয়সের অনুপাতে হওয়া উচিত।

সম্পূরক খাদ্যের উপাদান

আমাদের দেশে প্রাপ্য চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরণের উপাদান ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ সমত উপাদান সঠিক মাত্রায় মিশ্রণের মাধ্যমে সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা যায়। চিংড়ি স্বাস্থ্য ও মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর পদার্থ বা রাসায়নিক দ্রব্য কোনো অবস্থাতেই সম্পূরক খাদ্য তৈরির সময় ব্যবহার করা উচিত নয়। সম্পূরক খাদ্য তৈরির উপাদানসমূহ, যেমন- ফিসমিল, শ্রিম্পমিল, সয়াবিন মিল, পোকা-মাকড়, মথ, কেঁচো, শামুক ঝিনুকের মাংসালো অংশ, খৈল, চালের কুঁড়া, গমের ভুষি, শুকনো শেওলার গুঁড়া, চালের খুদ, রেশম কীটের গুঁড়া, স্কুইড নামক প্রাণীর গুঁড়া প্রভৃতির মাধ্যমে অতি সহজেই চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা যায়।

বাগদা চিংড়ির উপযোগী কৃত্রিম খাদ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো:

ক) খাদ্য সহজেই গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রয়োজন।

খ) সহজেই পরিপাক উপযোগী।

গ) চিংড়ির খাদ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ আমিষ, শর্করা, চর্বি, খাদ্যপ্রাণ, ভিটামিন, খনিজ পদার্থমিনারেল থাকা আবশ্যক।

ঘ) খাদ্য পুষ্টির অপচয় রাধেকল্পে প্রস্তুতকৃত পিলেট খাবার যতটা সম্ভব শক্ত হওয়াই শ্রেয়। পিলেট তৈরির জন্য ব্যবহৃত বাইন্ডার চিংড়ির জন্য যেন ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে খেয়াল রাখা। শ্রিম্প পিলেট তৈরির ক্ষেত্রে পিলেটের আকার ও পুষ্টিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো।

সারণি: পিলেটের আকার এবং সাধারণ পুষ্টিগত বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	নার্সারি	স্টার্টার	গ্রোয়ার	ফিনিসার
চিংড়ির ওজন (গ্রাম)	০-০.৩৫	০.৩৫-৪	৪-১৮	১৮-২৩
পিলেটের আকার	মিহি, মধ্যম মানের, দানাদার	ছোট পিলেট	মাঝারী পিলেট	লম্বা পিলেট
পিলেটের ব্যাস	০.৫, ১.০, ২.০ মিমি	৩/৩২ ইঞ্চি	৩/৩২ ইঞ্চি	৩/৩২ ইঞ্চি বা ১/৮ ইঞ্চি
প্রোটিন (%)	৩৫	৩০-৩৫	২৫-৩০	২৫-২০
লিপিড (%)	৮	৮	৭	৬
অ্যাস (%)	৭	৭	৭	৬
আর্দ্রতা (%)	১০	১০	১০	১০
প্রয়োজনীয় শক্তি (কিলোক্যালরি/কেজি)	৩৫০০	৩৫০০	৩৫০০	৩৫০০

২০২২

চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য তৈরি পদ্ধতি

সম্পূরক খাদ্য তৈরির প্রথমেই উপকরণগুলোর শতকরা হার অনুযায়ী উপাদানসমূহ ভালো করে মিশ্রিত করতে হয়। মিশ্রণের পরিমাণ নির্ভর করে খামারের আয়তন অনুযায়ী কি পরিমাণ খাদ্য তৈরি করা হবে তার উপর। পকরণগুলো যথাসম্ভব চালনি দিয়ে চেলে নেয়া উচিত যাতে উপাদানগুলো সঠিকভাবে মিশ্রিত হয়। মিশ্রণকে শক্ত বড়ি বা পিলেট আকারে তৈরি করার জন্য বাইন্ডিং এজেন্ট হিসেবে চিটাগুড় বা পেগা বাইন্ডার পানিতে মিশিয়ে গরম করে নেয়া হয় এবং ক্রমাগত মিশ্রিত করে আঠার মতো করে নেওয়া হয়। তারপর খাদ্য উপাদানগুলো মেশিনের মাধ্যমে পিলেট আকারে তৈরি করা হয়। এ ছাড়া ভেজা পদ্ধতিতেও চিংড়ি খামারে খাদ্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মিশ্রিত সম্পূরক খাদ্য প্রতি দিনের মাত্রা বা পরিমাণ অনুযায়ী পানিতে এমনভাবে মিশাতে হয় যেন ছোট গোলাকার বলের মতো তৈরি করা যায়। পরে তৈরিকৃত বল জলাশয়ের নির্দিষ্ট স্থানে আস্তে আস্তে সরবরাহ করতে হয়। বাগদা চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য তৈরির জন্য উদাহরণস্বরূপ নিচের সারণি ব্যবহার করা যেতে পারে।

সারণি: সম্পূরক খাদ্য তৈরির জন্য ব্যবহৃত উপকরণের পরিমাণ।

খাদ্য উপাদান	পিএল এর খাদ্য		বড় চিংড়ির খাদ্য	
	ব্যবহার মাত্রা (%)	সরবরাহকৃত আমিষ (%)	ব্যবহার মাত্রা (%)	সরবরাহকৃত আমিষ (%)
ফিসমিল	৪০.০০	২৪.০০	৩০.০০	১৮.০০
প্রোটিন কনসেনট্রেট/মিট এন্ড বোনমিল	১০.০০	৫.০০	১০.০০	৫.০০
সয়াবিন মিল	১০.০০	৪.৮০	১০.০০	৪.৮০
সরিষার/তিলের খৈল	১০.০০	৩.৫০	১৬.০০	৬.০০
চালের কুড়া/গমের ভুষি	২৩.০০	২.৭০	১৮.০০	২.২০
চিটাগুড়/আটা	৫.০০	-	৫.০০	-
ভিটামিন ও খনিজ লবণ	১.০০	-	১.০০	-
ঝিনুক গুড়া	১.০০	-	১০.০০	-
মোট	১০০.০০	৪০.০০	১০০.০০	৩৬.০০

উপরোক্ত উপকরণসমূহ ব্যবহার করে তৈরিকৃত সম্পূরক খাদ্যের বর্তমান (২০০৯) বাজারমূল্য বিবেচনা করলে দেখা যায়, প্রতি কেজি খাদ্যের মূল্য পড়বে ২৫-৩০ টাকা এবং তৈরিকৃত খাদ্যের খাদ্য রূপান্তরিত হার হবে প্রায় ২.০০।

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা বা হার

সাধারণত প্রত্যেক মজুদকৃত চিংড়ির মোট ওজনের শতকরা ২ থেকে ৫ ভাগ হারে খাবার সরবরাহ করতে হয় এবং জলাশয়ে মজুদকৃত পোনার ওজন নির্ণয়ের জন্য প্রতি মাসে দু'বার নমুনা সংগ্রহ করে ওজন নিতে হয়। এতে একদিকে যেমন চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়, অপরদিকে খাবারের পরিমাণও পুনঃনির্ধারণ করা সম্ভব হয়। নিচে চিংড়ির পোনার বৃদ্ধির হার অনুযায়ী খাদ্য পরিবেশনের তালিকা দেয়া হলো।

২০২২

সারণি: চিংড়ির ওজন অনুযায়ী খাদ্য প্রয়োগের হার

চিংড়ির ওজন (গ্রাম)	খাদ্য প্রয়োগের হার (%)/দিন
০.২ থেকে ১.০	১৫ থেকে ১৩
১.০ থেকে ২.০	১৩ থেকে ১১
২.০ থেকে ৩.০	১১ থেকে ৯
৩.০ থেকে ৫.০	৯ থেকে ৭
৫.০ থেকে ১৩.০	৭ থেকে ৫
১৩.০ থেকে ২০.০	৫ থেকে ৩
২০.০ থেকে ৩০.০	৩ থেকে ২

চিংড়ির প্রতিদিনের খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সূত্রটি হলো
প্রতিদিনের খাদ্যের পরিমাণ= মজুদকৃত পোনার সংখ্যা × বঁচার হার (%) × গড় দেহের ওজন × দেহ ওজন অনুসারে খাদ্য প্রয়োগ মাত্রার হার (%)।

চিংড়ির বয়স বাড়ার সাথে সাথে খাদ্যেও পরিমাণও বাড়তে থাকে। চিংড়ির বয়স অনুসারে খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি: চিংড়ির বয়স অনুসারে প্রতিদিনের খাদ্যের পরিমাণ

পোনার বয়স (দিন)	প্রতি ১০০ পোনার জন্য প্রতিদিনের খাদ্যের পরিমাণ (গ্রাম)	প্রতি ১০০০ পোনার জন্য প্রতিদিনের খাদ্যের পরিমাণ (গ্রাম)
১ থেকে ৩০	২	১৫
৩১ থেকে ৬০	১০	৭৫
৬১ থেকে ৯০	১৫	১৫০
৯১ থেকে ১২০	৪০	৪০০
১২১ থেকে ১৫০	১০০	১০০০

খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি

খাদ্যের প্রকৃতি অনুসারে চিংড়ির পুকুরে বা জলাশয়ে তিন ভাবে খাদ্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রয়োগ পদ্ধতিসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো।

২০২২

সারণি: খাদ্যের প্রকৃতি অনুসারে প্রয়োগ পদ্ধতি

প্রয়োগ পদ্ধতি	খাদ্যের প্রকৃতি	সুবিধা-অসুবিধা
১. ছিটিয়ে প্রয়োগ	কুঁড়া মিশ্রিত খাবার	এ পদ্ধতি চিংড়ির নার্সারির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু চারা বা মজুদ পুকুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এতে অতিরিক্ত খাবার পুকুরের পানি দূষিত করে এবং খাদ্যের অপচয় হয়।
	পিলেট খাবার	পিলেট খাবারও পুকুরের কিনারে ছিটিয়ে দেয়া হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় ছিটানো পদ্ধতির চেয়ে খাদ্যের অপচয় কম হয়। ধান ক্ষেতে চিংড়ির চাষ কিংবা পুকুরে স্বল্প পানি থাকা অবস্থায় বা ঘেরে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর।
২. খাবার ট্রে বা পাত্র ব্যবহার পদ্ধতি	ভেজা বা পিলেট খাবার	পুকুরের বিভিন্ন স্থানে খাবার ট্রে-এর পাত্র ব্যবহার করে খাদ্য পরিবেশন করা যেতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় খাদ্যের অপচয় কম হয় এবং অতি সহজেই অতিরিক্ত খাবার সরিয়ে ফেলা যায়। অপরদিকে অতি সহজেই চিংড়ি খাদ্যের চাহিদা নির্ণয় করা যায়।
৩. সামান্য পানিতে ঝুরা খাবার মিশিয়ে দলাকৃতির খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি	ঝুরা খাবার	এ পদ্ধতিতে দলাকৃত খাদ্যগুলো পুকুরের স্বল্প গভীর এলাকায় ছুড়ে দিতে হয়। এ প্রক্রিয়ায়ও খাদ্যের অপচয় বেশি হয়ে থাকে এবং পানি দূষিত হতে পারে।

ফিডিং ট্রে

চিংড়ি পোনা একটু বড় হলে অর্থাৎ মজুদকৃত পোনার বয়স ৪ সপ্তাহ হলে ফিডিং ট্রে থেকে পোনার বাঁচার হার ও গড় ওজন জেনে খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। ফিডিং ট্রে দেখতে বর্গাকার বা গোলাকার হয়ে থাকে এবং ট্রে বাঁশ বা বেত দিয়ে তৈরি করা যায়। পুকুর বা ঘেরে কয়টি ট্রে স্থাপন করতে হবে তা নির্ভর করে পুকুরের আয়তনের উপর। সাধারণত প্রতি হেক্টর আয়তনের পুকুরে ৬-৮টি ফিডিং ট্রে ব্যবহার করা হয়। ফিডিং ট্রে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাবার নির্ধারনের জন্য নিচের সারণি অনুসরণ করা যেতে পারে।

সারণি: ফিডিং/খাবার ট্রে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাবার নির্ধারণ

ট্রেতে পরিত্যক্ত খাবারের পরিমাণ	পুনঃখাবার নিধারনের পরিমাণ
০	৫% বৃদ্ধি
<৫	কোনো পরিবর্তন নেই
৫-১০	৫% কমানো
১০-২৫	১০% কমানো
>২৫	খাবার বন্ধ করতে হবে, পুনারায় ১০% কম খাবার দিয়ে শুরু করতে হবে

২০২২

খাদ্য প্রয়োগের সময়

চিংড়ি নিশাচর প্রাণী এবং এরা সাধারণত রাতে খাবার গ্রহণ করে থাকে। এ কারণেই চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে খাদ্য পরিবেশন সন্ধ্যা ও ভোর বেলায় করা শ্রেয়। চিংড়ি সাধারণত একই পরিমাণ খাবার খায় না এজন্য প্রতিবার খাদ্য প্রয়োগের সময় ট্রে বা পাত্রে অতিরিক্ত খাদ্য থাকলে তা তুলে ফেলতে হয় এবং শেষ হয়ে গেলে খাদ্যের পরিমাণ বাড়াতে হয়।

চিত্রঃ আয়তকার ট্রে-তে খাদ্য প্রয়োগ

চিত্রঃ গোলাকার ট্রে-তে খাদ্য প্রয়োগ

চিত্রঃ চিংড়ি ঘেরে ছিটিয়ে খাবার প্রয়োগ

২০২২

প্রশ্নমালা- ৯

এক কথায় উত্তর দাও

১. খাদ্য গ্রহণের প্রকৃতি অনুযায়ী চিংড়ি কোন্ ধরনের প্রাণী?

২. উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন ও প্রাণী প্ল্যাংকটন কোন ধরনের খাদ্য?

৩. ইউজেরিনা, নাভিকুলা, ডায়াটমস কোন ধরনের প্ল্যাংকটন?

৪. ড্যাফনিয়া, কপিপড, রটিফারস প্রভৃতি কোন ধরনের প্ল্যাংকটন ?

৫. চিংড়ি চাষের প্রথম মাসে প্রতি ১০০টি পোনার জন্য প্রতিদিন কী পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করা হয় ?

৬. এক হেক্টর আয়তনের জলাশয়ে কয়টি ফিডিং ট্রে দিতে হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

১. চিংড়ি চাষে সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর ।

২. ১০টি উদ্ভিদ ও প্রাণী প্ল্যাংকটনের নাম লিখ ।

৩. বাগদা চিংড়ির উপযোগী কৃত্রিম খাদ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ ।

৪. চিংড়ির বয়স অনুসারে খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ উল্লেখ কর ।

৫. আমাদের দেশে প্রাপ্য চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য তৈরির বিভিন্ন উপাদানসমূহ উল্লেখ কর ।

৬. প্রতিদিন পুকুরে খাদ্য প্রয়োগের সময় সম্পর্কে লিখ ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাগদা চিংড়ির উপযোগী পিলেটের আকার ও সাধারণ পুষ্টিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর ।

২. সম্পূরক খাদ্য তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর ।

৩. চিংড়ি খামারে খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা কর ।

শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং- ১

প্রথম পত্র

ব্যবহারিক

ব্যবহারিক- ১ঃ বাগদা চিংড়ির শারীরিক গঠন পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বাগদা চিংড়ির দেহকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- (ক) শিরোবক্ষ এবং (খ) উদর

ক. শিরোবক্ষ (Cephalothorax):

মাথা ও বক্ষ নিয়ে বাগদা চিংড়ির শিরোবক্ষ অঞ্চল গঠিত। শিরোবর্ম দ্বারা শিরোবক্ষ অঞ্চল আবৃত থাকে। এই শিরোবর্ম ক্যারাপেস নামে পরিচিত। এই ক্যারাপেসের অগ্রভাগে করাতের ন্যায় রোস্ট্রাম অবস্থিত। রোস্ট্রামের গোড়ার উভয় পার্শ্বে দুইটি সবৃন্তক পুঞ্জাক্ষি (Stalked compound eye) অবস্থিত। চিংড়ির শিরোবক্ষ অংশে ১৩ জোড়া উপাঙ্গ রয়েছে।

১. শিরোপাঙ্গঃ বাগদা চিংড়ির শিরোদেশে ৫ জোড়া শিরোপাঙ্গ অবস্থিত। যথা- শুঙ্গানু (Antenul), ২. শুঙ্গ (Antena), ৩. ম্যান্ডিবুল, ৪. ম্যাক্সিলুলা ও ৫. ম্যাক্সিলা।

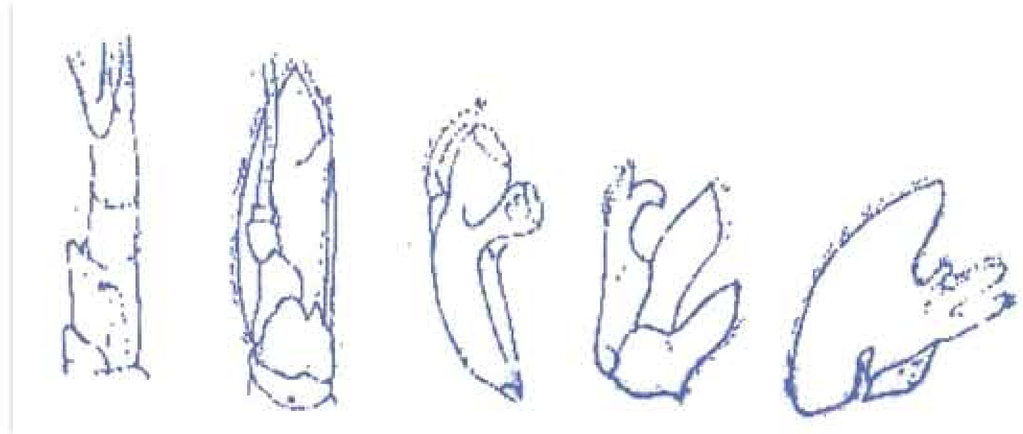

১ ২ ৩ ৪ ৫

চিত্রঃ চিংড়ির শিরোপাঙ্গসমূহ

২. বক্ষ উপাঙ্গঃ বক্ষদেশে অবস্থিত মোট ৮ জোড়া উপাঙ্গের প্রথম ৩ জোড়া উপাঙ্গকে ম্যাক্সিলিপেড এবং পরবর্তী ৫ জোড়া উপাঙ্গকে চলন পদ বলা

হয়।

১. ১ম ম্যাক্সিলিপেড; ২. ২য় ম্যাক্সিলিপেড; ৩. ৩য় ম্যাক্সিলিপেড;

৪. ১ম চলনপদ; ৫. ২য় চলনপদ; ৬. ৩য় চলনপদ;

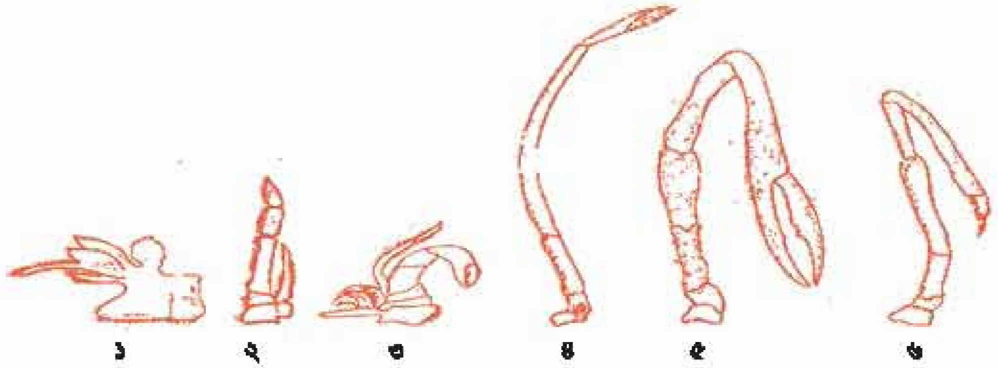

চিত্র: চিংড়ির বক্ষ উপাঙ্গসমূহ

খ. উদর (Abdomen):

চিংড়ির উদর ক্রমান্বয়ে পিছনের দিকে সরু হয়ে লেজ বা টেলসনের সাথে মিশেছে। বাগদা চিংড়ির উদর অঞ্চলে অবস্থিত জোড়া উদর উপাঙ্গকে সন্তরণ পদ (Pleopod) বলা হয়। ১ম থেকে ৫ম উপাঙ্গ দেখতে অনেকটা একই রকমের। তবে ৬ষ্ঠ উপাঙ্গটি অনেকটা চ্যাপ্টা ত্রিকোণাকৃতির। এই ৬ষ্ঠ উপাঙ্গকে ইউরোপড বা পুচ্ছ পাখনা বলা হয়।

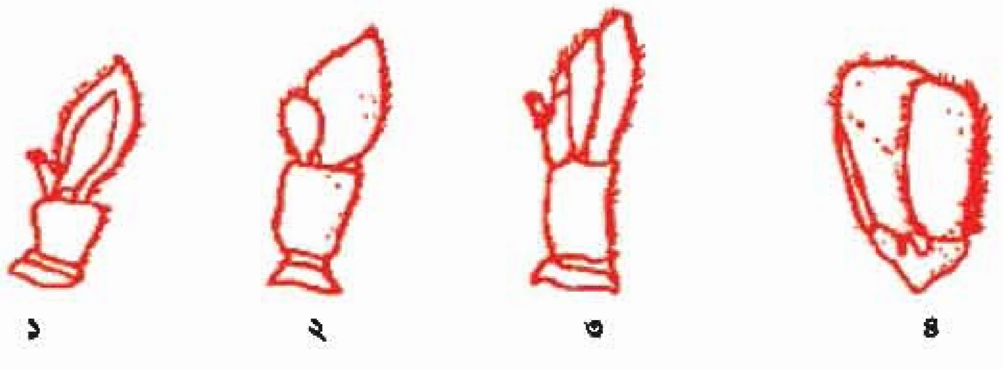

চিত্র: চিংড়ির উদর উপাঙ্গসমূহ

১. ৩য় উদর উপাঙ্গ; ২. ১ম উদর উপাঙ্গ; ৩. ২য় উদর উপাঙ্গ; ৪. ইউরোপড

জনন অঙ্গ: পুরুষ বাগদা চিংড়ির জননেন্দ্রিয়কে পেটাসমা (Petasma) ও স্ত্রী বাগদা চিংড়ির জননেন্দ্রিয়কে থেলিকাম (Thelycum) বলে। পুরুষ বাগদা চিংড়ির ১ম জোড়া সন্তরণ পদের মধ্যবর্তী স্থানে পেটাসমা এবং স্ত্রী বাগদা চিংড়ির ৪র্থ ও ৫ম সন্তরণ পদের মধ্যবর্তী স্থানে থেলিকাম অবস্থিত।

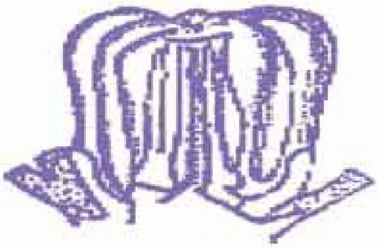

চিত্রঃ ১. পেটাসমা

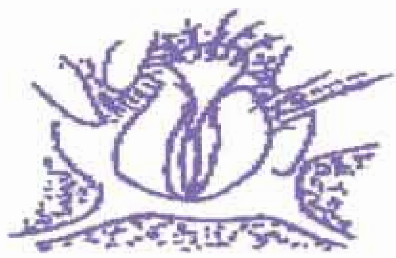

চিত্রঃ ২. থেলিকাম

চিত্রঃ বাগদা চিংড়ির জননেন্দ্রিয়সমূহ

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. পুরুষ ও স্ত্রী বাগদা চিংড়ি	৬. নিডল বা উঁচ	১১. ব্যালান্স
২. ট্রে	৭. আলপিন	১২. বরফ
৩. বালতি	৮, ম্যাগনিফাইং গ্লাস বা আঁতশ কাঁচ	১৩. ব্যবহারিক খাতা
৪. কাঁচি	৯. স্পেসিমেন জার	১৪. পেন্সিল
৫. ফরসেপ বা চিমটা	১০. ফরমালিন	১৫. ইরেজার ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ বাজার, পুকুর বা খামার থেকে স্ত্রী ও পুরুষ বাগদা চিংড়ি সংগ্রহ কর। বাগদা চিংড়ি লোনা পানির চিংড়ি বিধায় উপকূলীয় অঞ্চলের জলাশয়ে বা বাজারে এদের পাওয়া যায়।

২. নমুনা চিংড়ি সংগ্রহের বিস্তারিত তথ্য, যেমন- চাষির নাম, পুকুর/খামারের অবস্থান, আয়তন, নমুনা । সংগ্রহের তারিখ প্রভৃতি তথ্য লিপিবদ্ধ কর।

৩. সংগৃহীত নমুনা চিংড়ি জীবিত হলে পানি ভর্তি বালতি এবং মৃত হলে বরফ দিয়ে বালতিতে করে বহন করে পরীক্ষাগারে আন।

৪. স্ত্রী ও পুরুষ চিংড়ি দু টিকে আলাদা আলাদা ট্রেতে রেখে আলপিন দিয়ে চিংড়িকে ট্রেতে আটকাও।

৫. ফরসেপ ও কাচির সাহায্যে শিরোবক্ষ ও উদর উপাঙ্গসমূহকে চিংড়ির দেহ থেকে পৃথক করে ট্রেতে রাখ।

৬. রোস্ট্রামের উপরিভাগ ও নিচের অংশের দাঁতগুলো আলপিনের সাহায্যে ভালভাবে গণনা কর।

৭. পুরুষ বাগদার ১ম জোড়া চলন পদের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত জনন অঙ্গ পেটাসমা ও স্ত্রী বাগদার ৪র্থ ও ৫ম জোড়া চলন পদের মধ্যবর্তী স্থানে জনন অঙ্গ থেলিকাম ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৮. ব্যবহারিক খাতায় স্ত্রী ও পুরুষ বাগদা চিংড়ির ছবি আঁক, এরপর বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গ ও উপাঙ্গগুলো চিহ্নিত কর।

৯. সবশেষে অনুশীলন পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

ব্যবহারিক- ২। বিভিন্ন প্রকার চিংড়ির পরিচিতি

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের নদীসমূহে এবং সাগরে প্রায় ৩৬ প্রজাতির লোনা পানির চিংড়ি পাওয়া যায়। লোনা পানির অনেক প্রজাতির চিংড়ি ৭০ পিপিটি লবণাক্ততা পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। বাগদা চিংড়ির বহিঃকঙ্কালের ২য় উদর খণ্ডকের প্লিউরা ৩য় উদর খণ্ডকের প্লিউরাদ্বারা আংশিক আবৃত থাকে। এদের প্রথম তিন জোড়া বক্ষ উপাঙ্গ চিলেটে (চিমটাকৃতি) রূপান্তরিত হয়। সাধারণত লোনা পানির চিংড়ির শুঙ্গ (Antennule) দুটি ফ্লাজেলাযুক্ত থাকে। অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন ও চাষযোগ্য কতকগুলো লোনা পানির চিংড়ির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়ে দেয়া হলো।

বাগদা চিংড়ি (*Penaeus monodon*)

বাগদা চিংড়ির গায়ের রং হালকা বাদামি বা সবুজ হয়ে থাকে। এদের গায়ে বাঘের মতো কালচে ডোরা কাটা দাগ থাকে বলে এদেরকে জায়েন্ট টাইগার প্রন (Gianttiger prawn) বলে। ইউরোপডদ্বয়ে দুটি ঘন নীল বর্ণের ডোরাকাটা দাগ থাকে। এদের পাগুলো বাদামি এবং শুঙ্গ (Antena) ধূসর রঙের হয়ে থাকে। বাগদা চিংড়ির রোস্ট্রাম শক্ত, বাঁকা ও প্রশস্ত। রোস্ট্রামের উপরের দিকে ৬-৮ টি এবং নিচের দিকে ২-৪ টি দাঁত থাকে।

চাকা চিংড়ি (Penaeus indicus)

লোনা পানির এই চিংড়ির দেহে হালকা বাদামি রঙের ফোঁটা দাগ থাকে। চাকা চিংড়ির রোস্ট্রামটি চূড়া ও বাঁকা। রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৮-১০ টি এবং নিচের দিকে ৪-৬ টি দাঁত থাকে।

হরিণা চিংড়ি (Metapenaeus monoceros)

হরিণা চিংড়ির রোস্ট্রাম সোজা এবং এতে কোনো চূড়া (Crest) নেই। এদের শুঙ্গ বাদামি রঙের এবং এন্টেনা ও ফ্লাজেলা লাল। রঙের হয়ে থাকে। রাস্টোমের উপরিভাগে ৮-১২ টি দাঁত থাকে এবং নিচের অংশে কোনো দাঁত থাকে না।

চিত্রঃ হরিণা চিংড়ি

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি	৬. ম্যাগনিফাইং গাস	১১. ব্যবহারিক খাতা
২. ট্রে	৭. স্পেসিমেন জার	১২. পেনসিল
৩. বালতি	৮. ফরমালিন	১৩. ইরেজার, ইত্যাদি
৪. ফরসেপ বা চিমটা	৯. বরফ	
৫. আলপিন	১০. গাম বা আঠা	

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোনো বাজার, পুকুর বা খামার থেকে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি, যেমন- বাগদা, চাকা, হরিণা চিংড়ি সংগ্রহ কর। যেহেতু লোনা পানির চিংড়ি সেহেতু উপকূলীয় অঞ্চলের কোনো বাজার বা চিংড়ি খামার বা উপকূলীয় জলাশয় থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

২. নমুনা চিংড়ি সংগ্রহের বিস্তারিত তথ্য, যেমন- চাষির নাম, খামারের নাম, খামারের আয়তন, অবস্থান, সংগ্রহের তারিখ, ওজন ইত্যাদি লিপিবদ্ধ কর।

৩. সংগৃহীত চিংড়ি বালতিতে করে উপযুক্ত বরফ দিয়ে পরীক্ষাগারে নিয়ে আসতে হবে।

৪. পরীক্ষাগারে চিংড়িগুলো আলাদা আলাদাভাবে ট্রেতে রেখে ফরসেফ দিয়ে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো পরীক্ষা করে দেখ।

৫. এবার আলপিন দিয়ে চিংড়িগুলোর রোস্ট্রামের উপরিভাগের ও নিচের অংশের দাঁতগুলো গণনা কর।

৬. বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়িগুলো এবার আলাদা আলাদাভাবে কাচের জারে ১০% ফরমালিনে সংরক্ষণ কর।

৭. প্রতিটি কাচের জারের গায়ে পৃথক পৃথকভাবে চিংড়ির শ্রেণিবিন্যাসসহ সংগ্রহের তারিখ সংবলিত। কাগজের লেবেল আঠা দিয়ে আটকিয়ে দাও।

৮. এবার ব্যবহারিক খাতায় বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ির শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যগুলো আলাদাভাবে লিখ।

ব্যবহারিক- ৩: চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. বাংলাদেশের বিভিন্ন জলাশয়ে প্রায় ৬০ টি প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। এদের ৩৬ টি লোনা পানির চিংড়ি এবং ২৪ টি মিঠা পানির চিংড়ি। আবার সবজাতের চিংড়িই বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও চাষযোগ্য নয়। লোনা পানির চিংড়ি বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের নদীসমূহে এবং সাগরে পাওয়া যায়। মিঠা পানির চিংড়ি বাংলাদেশের প্রায় সকল নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওড়ে পাওয়া যায়।

২. বাজারে সাধারণত সায়েন্টিফিক স্টোর বা ঔষধের ফার্মেসিতে ফরমালিন পাওয়া যায়। বাজারে যে ফরমালিন পাওয়া যায় তা সাধারণত ৩৮-৪০% ফরমালডিহাইড এর দ্রবণ। কিন্তু এই ফরমালিনে চিংড়ি সংক্ষণ করা ঠিক নয়। চিংড়ি সংরক্ষণের জন্য এই ফরমালিন দ্রবণে পাতন পানি মিশিয়ে ১ ভাগ পানিঃ ৯ ভাগ ফরমালিন মিশিয়ে দ্রবণে পরিণত করতে হবে। মিশ্রণের সময় ফরমালিনের ঝাঝালো গন্ধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য মুখম-লে মাস্ক পরে নেওয়া ভালো।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি	৬. আলপিন	১১. গাম বা আঠা
২. ট্রে	৭. স্পেসিমেন জার	১২. বরফ
৩. বালতি	৮. ড্রপার	১৩. ব্যবহারিক খাতা
৪. ফরসেপ বা চিমটা	৯. পাতন পানি,	১৪. পেনসিল
৫. নিডল বা সুচ	১০. ফরমালিন	১৫. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. সম্ভব হলে নিকটস্থ বাজার বা খামার থেকে অথবা উপকূলীয় অঞ্চল থেকে বিভিন্ন প্রজাতির লোনা পানির। চিংড়ি সংগ্রহ করে আলাদাভাবে রাখ।

২. নিকটস্থ বাজার বা খামার থেকে বিভিন্ন প্রজাতির মিঠা পানির চিংড়ি সংগ্রহ কর।

৩. নমুনা চিংড়ি সংগ্রহের বিস্তারিত তথ্য, যেমন- চাষির নাম, খামারের অবস্থান, আয়তন, নমুনা সংগ্রহের তারিখ, চিংড়ির ওজন প্রভৃতি লিপিবদ্ধ কর।

৪. লোনা পানির চিংড়িগুলো শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী পৃথক করে আলাদা আলাদা ট্রেতে রাখ।

৫. মিঠা পানির চিংড়িগুলো শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী পৃথক করে আলাদা আলাদা ট্রেতে রাখ।

৬. নিকটস্থ বাজার থেকে ফরমালিন সংগ্রহ কর।

৭. প্রয়োজনীয় পরিমাণ ১ ভাগ পানি: ৯ ভাগ ফরমালিন মিশিয়ে দ্রবণে পরিণত কর।

৮. প্রয়োজনীয় সংখ্যক জারে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ফরমালিন দ্রবণ লও।

৯. এবার বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি আলাদা আলাদা জারে সংরক্ষণ কর।

১০. প্রত্যেকটি জারের গায়ে কাগজ আটকিয়ে তাতে চিংড়ির শ্রেণিবিন্যাস ও সংরক্ষণের তারিখ লিখ।

১১. সবশেষে অনুশীলন পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

২০২২

ব্যবহারিক- ৪: বাগদা চিংড়ির অভ্যন্তরীণ গঠন পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. পরিপাকতন্ত্র: বাগদা চিংড়ির পরিপাকতনত্র পরিপাকনালি ও হেপাটোপ্যানক্রিয়াস গ্রন্থি সমম্বয়ে গঠিত।

২. পরিপাকনালি: বাগদা চিংড়ির পরিপাকনালি মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পরিপাকনালি প্রধানত অগ্র' পরিপাকনালি, মধ্য পরিপাকনালি এবং পশ্চাৎ পরিপাকনালি এই তিনটি অংশে বিভক্ত।

অগ্র পরিপাকনালি: এই পরিপাকনালির প্রধান অংশ হচ্ছে মুখ গহবর, গ্রাস নালি এবং পাকস্থলী। পাকস্থলী আবার কার্ডিয়াক ও পাইলারেিক পাকস্থলীতে বিভক্ত।

মধ্য পরিপাকনালি: পাইলোরিক পাকস্থলীর পর লম্বা সরু সুতার মত অংশকে মধ্য পরিপাকনালি বলে। সাধারনত পরিপাকনালির এই অংশ অন্ত্র নামে সমধিক পরিচিত।

পশ্চাৎ পরিপাকনালি: পরিপাক নালির সবচেয়ে ছোট এই অংশ মলাশয় ও পায়ুছিদ্র নিয়ে গঠিত।

৩. হেপাটোপ্যানক্রিয়াস গ্রন্থি: গহবরে অবস্থিত কমলা রঙের এই গ্রন্থিটিকে হেপাটোপ্যানক্রিয়াস গ্রন্থি বলে যা চিংড়ির একমাত্র পরিপাক গ্রন্থি।

৪. প্রজনন তন্ত্র: বাগদা চিংড়ি এক লিঙ্গ বিশিষ্ট প্রাণী। পুংজনন অঙ্গ ও স্ত্রীজনন অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন চিংড়িতে থাকে।

পুংজনন তন্ত্র: চিংড়ির পুংজনন তন্ত্র নিম্নবর্ণিত অঙ্গ নিয়ে গঠিত:১. এক জোড়া শুক্রাশয় ২. এক জোড়া শুক্রনালি ৩. শুক্রথলি ৪. পুংজনন ছিদ্র

স্ত্রীজনন তন্ত্র: বাগদা চিংড়ির স্ত্রীজনন তন্ত্রে নিম্নবর্ণিত অঙ্গগুলো বিদ্যমান:১. ডিম্বাশয় (Ovaries) ২. ডিম্বনালি (Oviaries) ৩. স্ত্রীজনন ছিদ্র (Female Genital Apertures)

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. পুরুষ ও স্ত্রী বাগদা চিংড়ি
২. ট্রে
৩. বালতি
৪. ফরসেপ বা চিমটা
৫. নিডল বা উঁচ
৬. কাঁচি
৭. আলপিন
৮. ম্যাগনিফাইং গাস
৯. স্কালপেল
১০. বরফ
১১. ব্যবহারিক খাতা
১২. পেনসিল
১৩. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

ক. পরিপাকতন্ত্র

১. নিকটস্থ বাজার, পুকুর বা খামার থেকে বাগদা চিংড়ি সংগ্রহ কর। বাগদা চিংড়ি লোনা পানিতে বাস করে। বিধায় উপকূলীয় অঞ্চলের যে কোনো জলাশয় বা সাগরে এদের পাওয়া যায়।

২. নমুনা চিংড়ি সগ্রহের বিস্তারিত তথ্য, যেমন- চাষির নাম, খামারের অবস্থান, আয়তন, নমুনা সংগ্রহের তারিখ, ওজন প্রভৃতি লিপিবদ্ধ কর।

৩. নমুনা চিংড়ি প্রয়োজনীয় বরফ মিশ্রিত অবস্থায় বালতিতে করে পরীক্ষাগারে নিয়ে যাও।

৪. বালতি থেকে চিংড়ি তুলে ট্রেতে রাখ।

৫. চিংড়িটিকে এবার পৃষ্ঠদেশ উপরের দিকে রেখে আলপিন দিয়ে ভালোভাবে ট্রেতে আটকিয়ে রাখ।

৬. আঁতশ কাচ দিয়ে চিংড়ির মুখ ও পায়ু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৭. সাবধানে শিরোবক্ষ ও উদর উপাঙ্গগুলো কাঁচি দিয়ে কাটার পর পৃষ্ঠপার্শ্ব বরাবর টারগাম কাট।

৮. ফরসেপ দিয়ে সাবধানে টারগাম ও নিচের পেশী সরিয়ে ফেল।

৯. এবার হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ কঁচি দিয়ে কেটে ফেললে যকৃৎ-অগ্নাশয় গ্রন্থিটি দেখা যাবে।

১০. ফরসেপ ও স্কালপেল দিয়ে যকৃত-অগ্নাশয় গ্রন্থি সরিয়ে নিয়ে বাগদা চিংড়ির পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

১১. পেনসিল দিয়ে পরিপাকতনের চিত্র খাতায় আঁক ও পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলো চিহ্নিত কর।

খ. প্রজননতন্দ্র

১. নিকটস্থ বাজার, পুকুর বা খামার থেকে স্ত্রী ও পুরুষ বাগদা চিংড়ি সংগ্রহ কর।

২. নমুনা চিংড়ি সংগ্রহের বিস্তারিত তথ্য, যেমন- চাষির নাম, খামারের অবস্থান, আয়তন ও নমুনা। সংগ্রহের তারিখ, ওজন প্রভৃতি লিপিবদ্ধ কর।

৩. সংগৃহীত নমুনা চিংড়ি প্রয়োজনীয় বরফ মিশ্রিত অবস্থায় বালতিতে করে পরীক্ষাগারে নিয়ে আন।

৪. বালতি থেকে স্ত্রী ও পুরুষ চিংড়ি তুলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবচ্ছেদ ট্রেতে রাখ।

৫. চিংড়িকে এবারে পৃষ্ঠদেশ উপরের দিকে রেখে আলপিন দিয়ে ভালোভাবে ব্যবচ্ছেদ ট্রেতে আটকাও।

৬. এবার চিংড়ির পৃষ্ঠপার্শ্ব বরাবর কঁচি ও ফরসেপ দিয়ে টারগাম ও পেশী সরিয়ে ফেল।

৭. পেশী সরানোর পর সাবধানে হৃৎপিন্ডটি সরিয়ে ফেললে যকৃৎ-অগ্নাশয়ে জনন অঙ্গ দেখা যাবে।

৮. বাগদা চিংড়ির পুরুষ ও স্ত্রীজনন তন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলো পর্যবেক্ষণ কর।

৯. পেনসিল দিয়ে ব্যবহারিক খাতায় প্রজননতন্ত্রের ছবি আঁক ও জননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলো চিহ্নিত কর।

১০. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

ব্যবহারিক- ৫ঃ পানির লবণাক্ততা পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বাগদা চিংড়ি লোনা পানির চিংড়ি। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের লোনা পানির জলাশয়সমূহে বাগদা চিংড়ি পাওয়া যায় এবং উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় লোনা পানিতে বাগদা চিংড়ির চাষ করা হয়। ১০ থেকে ২৫ পিপিটি লবণাক্ততাযুক্ত পানি বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য উপযোগী। যদিও বাগদা চিংড়ি ০-৭০ পিপিটি লবণাক্ততাযুক্ত পানিতে বেঁচে থাকতে পারে। পানির লবণাক্ততা দু'টি উপায়ে পরিমাপ করা যায়; যথা- (ক) রিফ্রাক্টোমিটার ব্যবহার করে ও (খ) হ্যাককীটে বিদ্যমান রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে।

ক. রিফ্রাক্টোমিটারের সাহায্যে লবণাক্ততা নির্ণয়

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. ছিপিসহ বোতল	৪. ড্রপার	৭. পেনসিল
২. বটিং পেপার	৫. পাতন পানি	৮. ইরেজার, ইত্যাদি
৩. রিফ্রাক্টোমিটার	৬. ব্যবহারিক খাতা	

চিত্রঃরিফ্রাক্টোমিটার

কাজের ধাপ

১. যে জলাশয়, পুকুর বা খামারের পানির লবণাক্ততা নির্ণয় করতে হবে সেই পুকুর/ খামার থেকে এক পানি সংগ্রহ কর।

২. পানি সংগ্রহের বিস্তারিত তথ্য, যেমন- চাষির নাম, খামারের অবস্থান, পানি সংগ্রহের সময়, তারিখ, পানির গভীরতা, পানির রং প্রভৃতি লিপিবদ্ধ কর।

৩. এবার রিফ্রাক্টোমিটারের অগ্রভাগে অবস্থিত কভার স্লাইড উঠিয়ে বটিং পেপার বা টিস্যু পেপার দিয়ে। রিফ্রাক্টোমিটারের অগ্রভাগ ভালোভাবে পরিষ্কার কর।

৪. রিফ্রাক্টোমিটারের অগ্রভাগে কভার স্লাইডের নিচে ড্রপারের সাহায্যে কয়েক ফোঁটা পাতিত পানি দাও।

৫. রিফ্রাক্টোমিটারের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত আইপিসে চোখ লাগিয়ে রিফ্রাক্টোমিটারের অভ্যন্তরে অবস্থিত কেলটি শূন্যে এডজাস্ট কর।

৬. এবার রিফ্রাক্টোমিটারের অগ্রভাগে কভার স্লাইডের নিচে কয়েক ফোটা লবণাক্ত পানি দাও।

৭. অতঃপর আইপিসে চোখ লাগিয়ে পানির লবণাক্ততা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৮. রিফ্রাক্টোমিটারের অভ্যন্তরস্থ স্কেল থেকে সরাসরি লবণাক্ততার মাত্রা পরিমাপ কর।

৯. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

খ. হ্যাককীটের বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে পানির লবণাক্ততা নির্ণয়

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. ডিজিটাল টাইট্রেটর কার্টিজ (২.৫৭ CON মারকিউরিক নাইট্রেট)
২. ডাইফিনাইলকার্বাজোন পাউডারের পুরিয়া
৩. সিরিঞ্জ (৩ সিসি)
৪. ২, ৫, ১০, ২০ ও ২৫ মিলি বোতল
৫. ৪৭৩ মিমি ডিমিনারালাইজার বোতল
৬. ডিজিটাল টাইট্রেটর
৭. ডেলিভারি টিউব
৮. বড় ক্লিপারস্
৯. ব্যবহারিক খাতা
১০. পেনসিল
১১. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোনো পুকুর বা খামার থেকে লবণাক্ত পানি সংগ্রহ কর।

২. নমুনা পানি সংগ্রহের বিস্তারিত তথ্য, যেমন- চাষির নাম, পুকুরের অবস্থান, আয়তন, পানির সংগ্রহের সময়, তারিখ, পানির রং প্রভৃতি লিপিবদ্ধ কর।

৩. একটি পরিষ্কার ডেলিভারি টিউবকে মারকিউরিক নাইট্রেট (২.৫৭ CON) টাইট্রেশন কার্টিজের সাথে সংযুক্ত কর এবং টাইট্রেটরের চতুর্দিকে কার্টিজ লাগিয়ে দাও।

৪. ডেলিভারি টিউবের নব এবার ঘুরাতে থাক যে পর্যন্ত না টাইট্রেন্ট পড়া শুরু করে। অতঃপর ডেলিভারি টিউবের শেষপ্রাত মুছে ফেলে এবং নবকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে শুন্যে আন।

৫. ৩ মিলি সিরিঞ্জ দিয়ে সংগৃহীত নমুনা পানি থেকে ২ মিলি নিয়ে বোতলে রাখ।

৬. ১০ মিলি বোতলটি ডিমিনারলাইজড পানি দিয়ে পূর্ণ কর। ডিমিনারালাইজড বোতলে ট্যাপের পানি দিয়ে। ডিমিনারালাইজড পানি প্রস্তুত করা হয় এবং প্রায় ৩০ সেকেন্ড সময় এটি ঝাঁকানো হয়।

৭. এবার ডাইফিনাইলকার্বাজোন রিএজেন্ট পাউডারের পুরিয়া বোতলে রাখ এবং ভালোভাবে এটি দ্রবণে মিশাও।

৮. মারকিউরিক নাইট্রেট দিয়ে নমুনা পানিকে টাইট্রেট করতে হবে যতক্ষণ না দ্রবণের রং হলুদ থেকে। হালকা পিংক বর্ণের হয়।

৯, ডিজিটাল কাউন্টার উইন্ডো থেকে প্রাপ্ত রিডিংকে ১০ দিয়ে ভাগ করে নমুনা পানির লবণাক্ততা (পিপিটি)। নির্ণয় কর।

১০. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

ব্যবহারিক- ৬: পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বাগদা চিংড়ির অক্সিজেনের চাহিদা অন্যান্য জলজ প্রাণীর তুলনায় বেশি। চিংড়ি চাষের জন্য সর্বোত্তম অক্সিজেন মাত্রা হচ্ছে ৫-৭ মিগ্রা/লিটার। কোনো পুকুরে সাধারণত দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাপ সকালে সবচেয়ে কম এবং বিকালে সবচেয়ে বেশি থাকে। পানির দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ দু'টি উপায়ে পরিমাপ করা যায়, যথা- ক. ডিও মিটারের সাহায্যে ও খ. হ্যাককীটে বিদ্যমান বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে।

ক. ডিও মিটারের সাহায্যে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ণয়

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. ডিও মিটার
২. ব্যবহারিক খাতা
৩. পেনসিল
৪. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোনো চিংড়ি খামারে গমন কর।

২. খামারের যে কোনো একটি পুকুরের পানিতে ডিও মিটারটির সংবেদনশীল অংশ অল্প সময়ের জন্য ডুবিয়ে রাখ।

৩. এভাবে পুকুরের কয়েকটি স্থান থেকে ডিওমিটারের সাহায্যে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ পরিমাপ কর এবং অক্সিজেনের পরিমাপের সময় লিখে রাখ।

৪. পেনসিল দিয়ে ডিওমিটারের রিডিংগুলো সময়সহ লিপিবদ্ধ কর।

৫. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

খ. হ্যাককীটের সাহায্যে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ণয়

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. দ্রবীভূত অক্সিজেন ১ বিকারক পাউডারের পুরিয়া।
(Dissolved Oxygen 1 reagent powder pillow)

২. দ্রবীভূত অক্সিজেন ২ বিকারক পাউডারের পুরিয়া।
(Dissolved Oxygen 2 reagent powder pillow)

৩. দ্রবীভূত অক্সিজেন ৩ বিকারক পাউডারের পুরিয়া।
(Dissolved Oxygen 3 reagent powder pillow)

৪. ডিজিটাল টাইট্রেটর কার্টিজ।
(০.০২৫ CON সোডিয়াম থায়াসোলফেট)

৫. স্টার্চ ইনডিকেটর (100 ml. MDV)

৬. বোতল (60 ml)

৭. দাগাঙ্কিত সিলিন্ডার

৮. ডিজিটাল ট্রাইট্রেটর (Digital tritrator)

৯. ডেলিভারি টিউব

১০. বড় ক্লিপারস

১১. ব্যবহারিক খাতা

১২. পেনসিল (100 ml)

১৩. ইরেজার, ইত্যাদি

২০২২

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোনো পুকুর বা খামারে গমন কর ।

২. ছিপিযুক্ত ৬০ মিলি-এর একটি পরিষ্কার বোতলে পানি সংগ্রহ কর । এমনভাবে বোতলে পানি সংগ্রহ করতে হবে যেন বোতলটিতে পানির কোনো বুদবুদ না ঢুকে ।

৩. নমুনা পানি সংগ্রহের বিস্তারিত তথ্য, যেমন- পুকুরের অবস্থান, আয়তন, পানি, পানি সংগ্রহের সময় ওতারিখ, রং প্রভৃতি লিপিবদ্ধ কর ।

৪. এরপর বোতলে পানির সাথে একটি দ্রবীভূত অক্সিজেন-১ ও দ্রবীভূত অক্সিজেন-২ পাউডার মিশ্রিত কর । পাউডার মিশানোর পর খুব সাবধানে বোতলের ছিপি লাগাও যেন বোতলে বাতাস না ঢুকে ।

৫. বোতলের অতিরিক্ত পানি বের হয়ে যাওয়ার পর তাড়াতাড়ি বোতলটিকে কয়েকবার উল্টা ও সোজা করে পাউডারকে ভালোভাবে পানির সাথে মিশ্রিত কর । এর ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে বোতলে একটি বাদামি কমলা তলানী জমবে যা পরিমাপের ফলাফলকে প্রভাবিত করে না ।

৬. এবার বোতলটিকে কিছুক্ষণ স্থির রাখ যাতে নিচে তলানি জমতে পারে । এর ফলে বোতলের উপরের অর্ধেক দ্রবণ পরিষ্কার দেখাবে । পুনরায় বোতলটিকে কয়েকবার উলট-পালট করে দ্রবণ মিশাও । এর পর আবার বোতলটিকে স্থির অবস্থায় রাখ যেন বোতলের উপরের অর্ধেক অংশ পরিষ্কার হয় ।

৭. এবার ছিপি খুলে বোতলটিকে দ্রবণের সাথে দ্রবীভূত অক্সিজেন-৩ পাউডারের একটি পুরিয়া মিশ্রিত কর । পুনরায় সাবধানে ছিপি লাগাও যেন বোতলে বাতাসের বুদ্বুদ না ঢুকে । এবার কয়েকবার বোতলটিকে পুনরায় উলট-পালট করে দ্রবণের সাথে পাউডার মিশ্রিত কর । যদি পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকে তাহলে তলানী দ্রবীভূত হবে এবং দ্রবণ হলুদ বর্ণ ধারণ করবে ।

৮. দাগাঙ্কিত ১০০ মিলি সিলিন্ডারে ৫০ মিলি প্রস্তুতকৃত নমুনা দ্রবণ ঢল ।

৯. সোডিয়াম থায়াসোলফেট নরমাল (০.০২৫ CON) দ্রবণের সাথে একটি পরিষ্কার ডেলিভারি টিউব সংযুক্ত করে এবং টাইট্রেটরের চতুর্দিকে টাইট্রেশন কার্টিজ সংযুক্ত কর

১০. ডেলিভারি টিউরের নব এবার ঘুরাতে থাক যে পর্যন্ত ট্রাইট্রেন্ট পড়া শুরু করে । অতঃপর ডেলিভারি টিউবের । শেষ প্রান্ত মুছে ফেল এবং নবকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে শূন্যে আন ।

১১. বোতলের বাকি ১০ মিলি প্রস্তুতকৃত দ্রবণকে সোডিয়াম থায়াসোলফেট (০.০২৫ CON) টাইট্রেন্টদ্বারা টাইট্রেট কর যে পর্যন্ত না দ্রবণটি হালকা হলুদ বর্ণ ধারণ করে ।

১২. দুই ফোটা স্টার্চ ইনডিকেটর দ্রবণ ঢালার পর বোতলকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেশাতে থাক যতক্ষণ না দ্রবণ নীল রং ধারণ করে ।

১৩. পুনরায় টাইট্রেশন শুরু কর যতক্ষণ না দ্রবণ ঘন নীল থেকে রং বিহীন হয় ।

১৪. ডিজিটাল কাউন্টার উইন্ডো থেকে এবার এর নম্বর সংখ্যা বের করতে হবে এবং এ সংখ্যাকে ৪০দ্বারা ভাগ । করে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা (মিগ্রা/লি) বের কর ।

১৫. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর ।

২০২২

ব্যবহারিক- ৭: পানির পিএইচ পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পিএইচ হচ্ছে পানিতে হাইড্রোজেন আয়নের মাত্রার পরিমাপ যা ০-১৪ পর্যন্ত হয়। পিএইচ ৭ হলো নিরপেক্ষ। পিএইচের মান হাইড্রোজেন আয়নের কার্যকারিতা নির্দেশ করে। চিংড়ি চাষের জন্য পানির আদর্শ পিএইচ হচ্ছে ৭.৫-৯.০। পানির পিএইচ কমে গেলে পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পায় এবং চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও খাবার রুচি কমে যায়। আর পানির পিএইচ বেড়ে গেলে চিংড়ির ফুলকা ও চোখ নষ্ট হয়ে যায় এবং চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয়। পানির পিএইচ দু'ভাবে নির্ণয় করা যায়, যথা- (ক) পিএইচ মিটারের সাহায্যে এবং (খ) হ্যাককীট ব্যবহার করে।

ক. পিএইচ মিটারের সাহায্যে পানির পিএইচ নির্ণয়

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. পিএইচ মিটার
২. ব্যবহারিক খাতা
৩. পেনসিল
৪. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোনো চিংড়ি খামারে প্রবেশ কর।

২. খামারের যে কোনো একটি পুকুরের পানিতে পিএইচ মিটারের সংবেদনশীল অংশ কিছুক্ষণের জন্য ডুবিয়ে রাখ।

৩. পিএইচ মিটারের ডিজিটাল কেল থেকে পিএইচ এর মাত্রা পরিমাপ কর। কয়েকবার রিডিং নিয়ে গড় মান বের কর এবং সময়সহ ব্যবহারিক খাতায় লিখ।

৪. অনুশীলন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

খ. হ্যাককীটের সাহায্যে পানির পিএইচ নির্ণয়

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. ৪ মাত্রার পিএইচ ইনডিকেটর দ্রবণ
২. ১০০ এমএল গউই টিউব
৩. কালার ডিস্ক
৪. কালার ভিউং টিউব
৫. স্টপার
৬. কালার কমপারেটর বক্স
৭. ছিপিযুক্ত কাচের বোতল
৮. ব্যবহারিক খাতা
৯. পেনসিল
১০. ইরেজার, ইত্যাদি

২০২২

কাজের ধাপ

১. নমুনা পানি দিয়ে দুইটি টিউবের ৫ এমএল চিহ্ন পর্যন্ত পূর্ণ কর। পূর্বে ব্যবহৃত টিউব থাকলে তা ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে যেন এর মাঝে অন্য কোনো দ্রবণ না থাকে।

২. একটি টিউবে ৬ ফোটা ৪ পিএইচ ইনডিকেটর দ্রবণ নিয়ে ভালাভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দ্রবণটি নমুনা পানির সাথে মিশাও। এবার উভয় টিউবের সাথে স্টপার সংযুক্ত কর।

৩. কালার বক্সের ডান পার্শ্বের ছিদ্রে ইনডিকেটর মিশ্রিত টিউবটি এবং কালার বক্সের বাম পার্শ্বের ছিদ্রে অমিশ্রিত ইনডিকেটর টিউবটি রাখ।

৪. কালার বাক্সকে আলোর দিকে যেমন- আকাশ, জানালা অথবা ল্যাম্প-এর দিকে ধর এবং সামনের দু'টি ছিদ্র দিয়ে ভালোভাবে লক্ষ্য করে রং এর চাকতিটি ঘুরিয়ে অনুরূপ রঙের সাথে মিলাও।

৫. স্কেলের ছিদ্র দিয়ে পিএইচ এর মাত্রা নির্ণয় কর।

৬. অনুশীলন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

ব্যবহারিক- ৮: মাটির বৈশিষ্ট্য নির্ণয়

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. চিংড়ি চাষে মাটির পিএইচের গুরুত্ব অপরিসীম। মাটির পিএইচ এর উপর পুকুরের পানির পিএইচ অনেকাংশেই নির্ভরশীল। চিংড়ি চাষের জন্য পুকুরের মাটির পিএইচ ৫-৬.৫ এর মধ্যে থাকা উত্তম।

২. চিংড়ি খামারের জন্য দোআঁশ, বেলে দোআঁশ বা এঁটেল মাটির স্থান নির্বাচন করা দরকার। যে মাটিতে শতকরা ৮৫ ভাগের চেয়ে বেশি বালি কণা থাকে তাকে বেলে মাটি, শতকরা ৭৫ ভাগের কম বালিকণা ও শতকরা ২৫ ভাগের কম কাদাকণা যে মাটিতে থাকে তাকে দোআঁশ মাটি এবং যে মাটিতে শতকরা ৩৫ ভাগের বেশি কাদাকণা বা পলিকণা থাকে তাকে কাদা মাটি বলে।

৩.কষযুক্ত মাটি বা অ্যাসিড সালফেট সয়েল চিংড়ি চাষের জন্য সম্পূর্ণরূপে অনুপযাগেী। যে মাটির পিএইচ ৪ অথবা এর কম থাকে তাকে কষযুক্ত মাটি বা অ্যাসিড সালফেট সয়েল বলে। যেসব খামার বা পুকুরে অ্যাসিড সালফেট সয়েল থাকে সেসব খামার। পুকুরের মাটির উপরিভাগে কালো বা হলুদ লাল রঙের একটি আতরণ দেখা যায়।

ক. মাটির কণা নির্ণয়

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. দোআঁশ, বেলে দোআঁশ ও এঁটেল মাটি
২. পলিথিন ব্যাগ
৩. কাঁচ পাত্র
৪. পাতিত পানি
৫. ব্যবহারিক খাতা
৬. পেনসিল
৭. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ খামারে গিয়ে মাটি সংগ্রহ করে পলিথিন ব্যাগের সাহায্যে পরীক্ষাগারে নিয়ে আন।

২. হাতে আধা মুঠো মাটি নিয়ে চাপ দিয়ে গুড়া করে তাতে পরিমিত পানি মিশাও।

২০২২

৩. এবার মাটি দিয়ে দলা বানানারে চেষ্টা কর।

৪. দলা বানানো না গেলে অর্থাৎ মাটিকণা আলগা থেকে গেলে বুঝতে হবে এটা বেলে মাটি।

৫. রিং বানানো যায় তবে আংটি বানাতে গেলে ভেঙে যায় তবে বুঝতে হবে এটা দোআঁশ মাটি।

৬. মাটি দিয়ে ভালো রকম আংটি বানানো যায় তাহলে এটা এঁটেল মাটি।

৭. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

খ. মাটির পিএইচ নির্ণয়

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. সয়েল পিএইচ মিটার
২. ৪ টি পলিথিন ব্যাগ
৩. কাচ পাত্র
৪. পাতিত পানি
৫. ব্যবহারিক খাতা
৬. পেনসিল
৭. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ খামার থেকে অল্প পরিমাণ (প্রায় ১ কেজি) মাটি সংগ্রহ করে পলিথিন ব্যাগে করে সংগৃহীত মাটি পরীক্ষাগারে নিয়ে আন।

২. কাচ পাত্রে এক মুঠো মাটি নিয়ে পাতিত পানি দিয়ে ভিজিয়ে দ্রবণ তেরি কর। এবার সয়েল পিএইচ মিটারের নিম্নভাগের সুচালো অগ্রভাগ দ্রবণের মধ্যে স্থাপন কর।

৩. এবার সয়েল পিএইচ মিটারের কেল থেকে মাটির পিএইচ এর মাত্রা পর্যবেক্ষণ কর।

৪. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

গ. অ্যাসিড সালফেট সয়েল চিহ্নিতকরণ

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. কষযুক্ত মাটি
২. পলিথিন ব্যাগ
৩. কাঁচ পাত্র
৪. পাতিত পানি
৫. সয়েল পিএইচ মিটার
৬. ব্যবহারিক খাতা
৭. পেনসিল
৮. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোনো খামার থেকে আধা কেজি পরিমাণ মাটি সগ্রহ কর।

২. সংগৃহীত মাটি পলিথিন ব্যাগে করে পরীক্ষাগারে লও।

৩. মাটি সংগ্রহের সময় মাটির উপরের স্তরের রং ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৪. এক মুঠো সংগৃহীত মাটি একটি কাচ পাত্রে পাতিত পানি দিয়ে ভিজিয়ে কাদার মতো কর।

৫. এবার সয়েল পিএইচ মিটারের সুঁচালো অগ্রভাগ কাদার মধ্যে স্থাপন কর।

৬. সয়েল পিএইচ মিটারের কেল থেকে মাটির পিএইচ-এর মান পর্যবেক্ষণ কর।

৭. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

ব্যবহারিক- ৯: চিংড়ি খামারের বেড়ি বাঁধ নির্মাণ কৌশল

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. ভেড়ি বাঁধ খামারকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করে। ভেড়ি বাধের উচ্চতা সর্বোচ্চ জোয়ারের মাত্রা থেকে নূন্যতম ১ মিটার উপরে থাকা ভালো। প্রতি মিটার উচ্চতার জন্য বাঁধের ভূমির বিতার ৪-৫ মিটার হতে পারে। পুকুরের বাইরের দিকে বাঁধের ঢালু নিম্নরূপ হতে হবে।

২ ঃ ১= বাঁধের উচ্চতা ৪.২৬ মিটারের বেশি হলে এবং প্রচণ্ড ঢেউয়ের সম্ভাবনা থাকলে।

১ ঃ ১= বাঁধের উচ্চতা ৪.২৬ মিটারের কম হলে এবং জোয়ারের উচ্চতা ১ মিটারের বেশি হলে।

১ ঃ ২= বাঁধের উচ্চতা ১ মিটারের কম হলে এবং জোয়ারের উচ্চতা ১ মিটার বা তার কম হলে।

২. বাধকে টেকসই এবং কার্যকর করার জন্য বাঁধের প্রকৃত উচ্চতার চেয়ে ১৫-২০% উচ্চতা বেশি করতে হবে যাতে মাটি সংকোচনের ফলে বাধের উচ্চতা কমে না যায়। এজন্য বাঁধ নির্মাণের সময় মাটি নিবিড়করণ (Compaction) করে ফেলা ভালো। মাটি নিবিড়করণের জন্য পানি প্রয়োগ, শুকানো এবং রোলার বা দুরমুজ ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া বৃষ্টির পানিতে বাধ যেন ধসে না যায় সে জন্য নির্মাণের পরপরই বাঁধের ঢালে ঘাসের চাপড়া লাগাতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. বাঁশের খুটি	৪. কোদাল	৭. ব্যবহারিক খাতা
২. চুন/দড়ি	৫. ঝাকা	৮. পেনসিল
৩. মেজারিং টেপ	৬. রোলার বা দুরমুজ	৯. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. খামারের জন্য নির্বাচিত স্থানে গমন কর।

২. বাঁশের খুঁটি পুঁতে এবং চুন বা দড়ির সাহায্যে বাঁধ নির্মাণের স্থান চিহ্নিত কর।

৩. বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরুর আগেই বাঁধের দৈর্ঘ্য, বাঁধের চূড়া, ভিতরে ও বাইরের ঢালুতা ইত্যাদি বিষয়ে । সিদ্ধামত গ্রহণ করতে হবে।

৪. বাধের ভিতরের দিক থেকে মাটি কেটে বা অন্য জায়গা থেকে মাটি এনে বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু কর।

৫. প্রতি ২০-৩০ সেমি উচ্চতা পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণের পর দুরমুজ বা রালোর দিয়ে মাটি ভালোভাবে সমান করে নিতে হবে।

৬. প্রথমে বঁধের মোট উচ্চতার ২ অংশ নির্মাণ করে কয়েকদিন অপেক্ষা কর।

৭. কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর বাঁধের বাকি ১ অংশ নির্মাণ সম্পন্ন কর।

৮. পুকুর থেকে এমন দূরত্বে ভেড়ি বাঁধ নির্মাণ কর যেন ভেড়ি বাধের ভিতরের দিকে ১ মিটার প্রশস্ত বকচর সৃষ্টি

৯. বৃষ্টির পানিতে বাধ যাতে ধসে না যায়, সে জন্য নির্মাণের পরপরই বাঁধের ঢালে ঘাসের চাপড়া লাগিয়ে দাও।

১০. এবার বাধের চূড়া দুরমুজ বা রালোর দিয়ে সমান করে ফেল।

১১. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

ব্যবহারিক- ১০: ঘের/পুকুরের তলা শুকানো

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. পুকুরের তলদেশ ২-৫ সপ্তাহ সূর্যালোকে এমনভাবে শুকাতে হবে যেন তলার মাটিতে ৫-১০ সেমি ফাটল। সৃষ্টি হয়। তবে কষযুক্ত মাটি হলে ফাটল সৃষ্টি না করাই উত্তম। পুকুরের তলদেশ দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে গেলে যদি ১-২ ইঞ্চির বেশি গর্ত না হয় তবে পুকুরের তলদেশ শুকানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।
২. পুকুরের তলদেশ শুকানোর ফলে রাক্ষুসে মাছ ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণী দমন করা যায়। মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং মাটিতে বিদ্যমান হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস দূরীভূত হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. পাম্প মেশিন
২. পাম্প মেশিনের আনুষাঙ্গিক পদার্থসমূহ
৩. কোদাল ও পাত্র
৪. কোদাল
৫. ঝাকা
৬. রোলার বা দুরমুজ
৭. ব্যবহারিক খাতা
৮. পেনসিল
৯. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোনো পুকুরে গমন কর।

২. পুকুরের পাড়ে পাম্প মেশিন এমনভাবে স্থাপন কর যেন মেশিনের সরবরাহ পাইপের (Delivery pipe) মুখ পাড়। থেকে দূরে অবস্থান করে।

৩. এবার মেশিন স্টার্ট দিয়ে পুকুরের পানি নিষ্কাশন কর।

৪. পুকুরের তলদেশের নিচু এলাকায় পানি জমে থাকলে কোদাল দিয়ে নালা কেটে পানি মেশিনের সংগ্রহ পাইপের। (Suction pipe) গোড়ায় যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এতে পুকুরের সমস্ত পানি নিষ্কাশন করা সম্ভব হবে।

৫. পুকুরের সমস্ত পানি নিষ্কাশন করা শেষ হলে পাম্প মেশিন বন্ধ করে দাও।

৬. পুকুরের তলদেশ উত্তমরূপে শুকানোর জন্য ২-৫ সপ্তাহ সূর্যালোক ফেলে রাখ।

৭. এরপর পুকুরের তলদেশ দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে গেলে যদি ১-২ ইঞ্চির বেশি গর্ত না হয় তবে তলদেশ শুকানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

৮. এবার পুকুরের তলদেশ যথাযথভাবে শুকানো হয়েছে কিনা তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৯. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

১০.এবার বাঁধের চূড়া দুরমুজ বাঁ রোলার দিয়ে সমান করে ফেল।

১১.অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যাবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

ব্যবহারিক- ১১: চিংড়ি ঘেরের রাক্ষুসে মাছ পরিচিতি

প্রাসঙ্গিক তথ্য

রাক্ষুসে মাছ চিংড়ি ঘেরের জন্য অশনি সংকেতস্বরূপ। রাক্ষুসে মাছ চিংড়ি পোনার সবচেয়ে বড় শত্রু। অনেক সময় রাক্ষুসে মাছ চিংড়ির উৎপাদনকে দারুণভাবে ব্যহত করে। সাধারণত রাক্ষুসে মাছ প্রাণীভোজী হয়ে থাকে। এরা ঘেরে চিংড়ির পোনা খেয়ে ফেলে, ফলে চিংড়ি চাষি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাধারণত যে সব মাছ চিংড়ি বা অন্য মাছ খেয়ে ফেলে তাদেরকে রাক্ষুসে মাছ বলা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাক্ষুসে মাছের মুখ বড় এবং পরিপাকনালি ছোট হয়ে থাকে। কারণ খাদ্য শিকলের মাঝামাঝি থেকে এরা খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। অনেক রাক্ষুসে মাছের মুখে ধারালো দাঁত থাকে। আমাদের দেশে চিংড়ি ঘেরে যে সমস্ত রাক্ষুসে মাছ দেখা যায় সেগুলোর মধ্যে ফলি, টেংরা, ভেটকি, বায়োল, বেলে, শোল, প্রভৃতি মাছ উল্লেখযোগ্য।

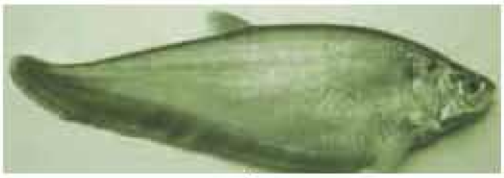

ফলি

টেংরা

বোয়াল

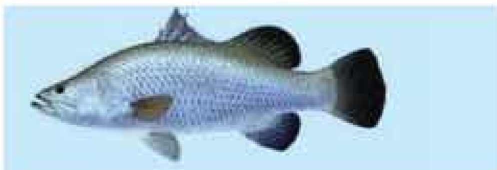

ভেটকি

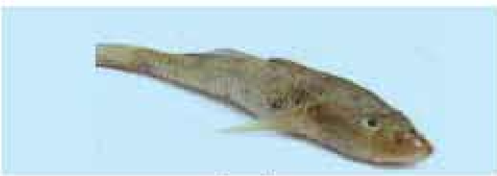

বেলে

শোল

চিত্র: চিংড়ি ঘেরের প্রধান প্রধান রাক্ষুসে মাছের প্রজাতিসমূহ

রাক্ষুসে মাছের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

ফলি মাছ

এই মাছের উভয় পার্শ্ব চাপা, মুখ চোখের মাঝ বরাবর বিস্তৃত এবং মুখের উপরের ও নিচের চোয়াল সমান। উভয় চোয়ালে দাঁত আছে। এদের কণ্ঠেও হুকের মত বাঁকা দাঁত আছে। পৃষ্ঠদেশীয় পাখনা ও লেজ অত্যন্ত ছোট। এই মাছের পরিপাকনালিও অত্যন্ত ছোট। এরা স্বভাবে মাংসভোজী বলে এদেরকে রাক্ষুসে মাছ বলা হয়।

টেক্সা মাছ

এই জাতীয় মাছের মাথা অপেক্ষাকৃত বড় এবং নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালের চেয়ে বড়। মুখ চোখ বরাবর বিস্তৃত। নিচের চোয়ালের নিচে একজোড়া পঁড়ি বা শুড় (Barbel) থাকে যা উদর পাখনা পর্যন্ত পৌঁছানো এবং উভয় চোয়ালে ভোতা পঁত আছে। লেজের পাখনা দু'ভাগে বিভক্ত তবে উপরের অংশ অপেক্ষাকৃত বড়। এদের পরিপাকনালি অপেক্ষাকৃত ছোট। বাংলাদেশের উপকূলীয় জলাশয়ে এদের প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

বায়োল মাছ

লম্বাকৃতির এই মাছের মাথা অনেকটা অবনত এবং নিচের চোয়ালের নিম্নাংশে দু জোড়া শুড় থাকে। নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড়। বায়োল মাছের মুখ চোখের পশ্চাদ্ভাগের পিছন পর্যন্ত বিস্তৃত এবং উপরের ও নিচের চোয়ালে দাঁত বিদ্যমান। কাটাবিহীন পৃষ্ঠ পাখনা আকারে অত্যত ছোট এবং পায়ু পাখনা (Anal fin) লেজের (Caudal fin) সাথে সংযুক্ত নয়। এরা অত্যন্ত লাভেী বা পেটুক (Voracious) প্রকৃতির মাছ এবং শিকারি স্বভাবের জন্য এরা রাক্ষুসে মাছ হিসেবে অতি পরিচিত।

ভেটকি মাছ

লম্বাকৃতির এই মাছের দেহ চ্যাপ্টা। অঙ্কীয় দেশের চেয়ে এদের পৃষ্ঠদেশ বেশি উত্তল। এদের মুখের ফাঁক খুব বড় এবং চোয়াল চোখের পিছন পর্যন্ত বিস্তৃত। উভয় চোয়ালে দাঁত অবস্থিত। এদের চোখ দেহের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট। এদের পৃষ্ঠদেশীয় পাখনা ও পায়ু পাখনার তৃতীয় কাঁটা অত্যন্ত লম্বা এবং শক্ত। উদর পাখনা বক্ষ পাখুনার চেয়ে ছোট। লেজ দেখতে অনেকটা গোলাকার। এদের পরিপাকনালি বেশ ছোট এবং স্বভাবে এরা মাসভাজী বা শিকারি। সাগর এবং উপকূলীয় জলাশয়ে এদের প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অনেক সময় মিঠা পানিতেও এদের পাওয়া যায়।

বেলে মাছ

এই মাছের অগ্রভাগ অনেকটা নলাকার এবং পশ্চাঙ্গ কিছুটা চ্যাপ্টা। এদের নিচের চোয়াল অপেক্ষাকৃত লম্বা এবং চোয়াল নিচের দিকে চোখের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। এদের ঠোট বেশ পুরু বা মোটা এবং লেজ অনেকটা গালাকার। এদের উভয় চোয়ালে দাঁত আছে এবং চোয়ালের সম্মুখভাগে ছেদন দাঁত অবস্থিত। বাংলাদেশের সর্বত্র এই মাছ পাওয়া যায়।

শোল মাছ

শোল মাছের অগ্রভাগ প্রায় নলাকার তবে পশ্চাঙ্গ কিছুটা চ্যাপ্টা। এদের মুখের ফাক (Cleft) অনেক বড় এবং চোয়াল চোখের পিছন পর্যন্ত বিস্তৃত। এদের উভয় চোয়ালে দাঁত থাকে। শোল মাছের লেজ গোলাকার। এই জাতীয় মাছ মাংসভোজী এবং এরা বিভিন্ন জীবিত প্রাণী যেমন- মাছ, ব্যাঙ, সাপ, পোকা-মাকড়, কেঁচো এবং

ব্যাঙাচি খেয়ে জীবন ধারণ করে থাকে। এদের পরিপাকনালী অত্যন্ত ছোট। এরা জলাশয়ের কাদার নিচে বাস করে এবং পানি ছাড়া কাদার মধ্যে এরা কয়েক মাস বেঁচে থাকতে পারে।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. ঝাকি জাল
২. ট্রে
৩. বালতি
৪. কাচি
৫. স্কালপেল
৬. নিডল
৭. আলপিন
৮. ফরসেপ
৯. কাচের জার
১০. ফরমালিন
১১. তুলি
১২. ব্যবহারিক খাতা
১৩. পেনসিল
১৪. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ পুকুর বা খামার থেকে বিভিন্ন জাতের রাক্ষুসে মাছ সংগ্রহ কর।

২. নমুনা মাছ সগ্রহের বিভিন্ন তথ্য, যেমন- চাষির নাম, খামারের অবস্থান, আয়তন, নমুনা সংগ্রহের তারিখ, প্রতিটি নমুনা মাছের ওজন প্রভৃতি লিপিবদ্ধ কর।

৩. বালতিতে করে সংগৃহীত নমুনা মাছ প্রয়োজনীয় বরফ মিশ্রিত করে পরীক্ষাগারে আন।

৪. বিভিন্ন জাতের মাছ আলাদা আলাদাভাবে ব্যবচ্ছেদ ট্রেতে রাখ।

৫. ফরসেপ ও নিডলের সাহায্যে বিভিন্ন জাতের মাছের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৬. এবার প্রত্যেক জাতের একটি করে মাছকে আলপিন দিয়ে ব্যবচ্ছেদ ট্রেতে আটকাও।

৭. স্কালপেল ও কাচি দিয়ে প্রত্যেক জাতের মাছ ব্যবচ্ছেদ করে পরিপাকনালি পর্যবেক্ষণ কর।

৮. নমুনা মাছ সংগ্রহের তারিখসহ মাছের নাম কাগজে লিখে তা কাচ জারের গায়ে আঠা দিয়ে আটকাও।

৯. প্রত্যেক জাতের মাছের বৈশিষ্ট্যগুলো আলাদা আলাদাভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

১০. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখ।

ব্যবহারিক- ১২: রোটেননের পরিমাণ নির্ণয় ও প্রয়োগ পদ্ধতি অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

ডেরিস নামক এক ধরনের পাহাড়ি গাছের শিকড় থেকে হালকা বাদামি রঙের এই রোটেনন পাউডার উৎপাদন করা হয়। এই পাউডারের বিষক্রিয়ার ফলে মাছ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায় তবে এই বিষক্রিয়ায় মৃত মাছ খাওয়ায় মানব দেহের কোনো অসুবিধা হয় না। রোটেনন প্রয়োগে চিংড়ির কোনো ক্ষতি হয় না এবং সূর্যকিরণে এর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। চিংড়ি ঘেরে সাধারণত রাক্ষুসে মাছ দমনের জন্য রোটেনন পাউডার ব্যবহার করা হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. রোটেনন পাউডার
২. দুটি ছোট ড্রাম
৩. বালতি
৪. ছোট মগ
৫. ব্যালেন্স
৬. মেজারিং টেপ
৭. মেজারিং পোল
৮. ক্যালকুলেটর
৯. ব্যবহারিক খাতা
১০. পেনসিল
১১. ইরেজার, ইত্যাদি

২০২২

কাজের ধাপ

প্রথম পর্যায়: রোটেননের পরিমাণ নির্ণয় ।

১. নিকটস্থ কোনো চিংড়ি খামারে গিয়ে ফিতা ও মেজারিং পোলের সাহায্যে পুকুরের পানির উপরিভাগের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এবং পানির গভীরতা পরিমাপ কর ।

২. এবার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ গুণ করে পুকুরের আয়তন বের কর ।

৩. প্রতি ১৮-২৫ গ্রাম/শতাংশ/ফুট হিসেবে মোট রোটেননের পরিমাণ বের কর ।

৪. এবার খাতায় ছক আকারে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গতীরতা, আয়তন ও মোট রোটেননের পরিমাণ লিপিবদ্ধ কর ।

৫. অনুশীলনকৃত কার্যক্রমটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর ।

উদাহরণ

ধরা যাক, পুকুরের পানির উপরিভাগের দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট, প্রস্থ ৬০ ফুট এবং পানির গভীরতা ৩ ফুট । তাহলে পুকুরের আয়তন= ৩০০ × ৬০= ৬০০ বর্গফুট= ৪১ শতাংশ । মোট পরিমাণ= আয়তন × গভীরতা × প্রতি শতাংশে রোটেননের পরিমাণ= ৪১ × ৩ × ২৫=৩০৭৫ গ্রাম= ৩.০ কিলোগ্রাম

দ্বিতীয় পর্যায়: রোটেনন প্রয়োগ পদ্ধতি

১. মোট নির্ধারিত পরিমাণ পাউডারের ১/৩ ভাগ ১ টি ছোট ড্রামে নিয়ে অল্প পানিতে মিশিয়ে ভালোভাবে নেড়ে মন্ড তৈরি কর ।

২. এবার মন্ড দিয়ে ছোট ছোট বল বানিয়ে সেগুলো পুকুরের বিভিন্ন অংশে নিক্ষেপ কর ।

৩. অবশিষ্ট ২/৩ ভাগ পাউডার অন্য একটি ড্রামে নিয়ে পানি দিয়ে ভালোভাবে দ্রবণ তৈরি কর ।

৪. উক্ত দ্রবণের সাথে আরও অধিক পরিমাণ পানি মিশিয়ে তা মগ দিয়ে পুকুরের সমস্ত পানিতে উত্তমরূপে ছিটিয়ে দাও ।

৫. অনুশীলনকৃত কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখ ।

ব্যবহারিক- ১৩ঃ পুকুরে চুন প্রয়োগের পরিমাণ নির্ণয় ও প্রয়োগ পদ্ধতি অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পুকুরের পুষ্টি গুণাগুণ বৃদ্ধি এবং রোগ-জীবাণু ও বাজে গ্যাস প্রতিরোধের জন্য চুন ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া পুকুরের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় চুনের গুরুত্ব অপরিসীম। বাজারে সাধারণত তিন প্রকার চুন পাওয়া যায়। যেমন

১. পাথুরে চুন (Lime stone): $CaCO_3$
২. কলিচুন (Slaked Lime) : $Ca(OH)_2$
৩. পোড়া চুন (Quick Lime) : CaO

মূল্য ও কার্যকারিতা বিবেচনায় পুকুরে সাধারণত পাথুরে চুন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। চিংড়ি ঘেরে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. চুন
২. দুটি ছোট ড্রাম
৩. বালতি
৪. ছোট মগ
৫. ব্যালেন্স
৬. মেজারিং টেপ
৭. মেজারিং পোল
৮. ক্যালকুলেটর
৯. ব্যবহারিক খাতা
১০. পেনসিল
১১. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

ক. প্রথম পর্যায়ঃ চুন প্রয়োগের পরিমাণ নির্ণয়

১. নিকটস্থ কোনো পুকুর বা খামারে গিয়ে মেজারিং টেপ ও মেজারিং পালের সাহায্যে পুকুরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ (ফুট) পরিমাপ কর।

২. এবার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ গুণ করে উক্ত গুণফলকে ৪৫.৬ দিয়ে ভাগ করে শতাংশে পুকুরের আয়তন নির্ণয় কর। মনে রাখতে হবে ১ শতাংশ = ৪৩৫.৬ বর্গ ফুট (প্রায়)।

৩. এবার ব্যবহারিক খাতায় ছক আকারে পুকুরে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, আয়তন ও চুনের পরিমাণ লিপিবদ্ধ কর।

৪. অনুশীলন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

পুকুরের দৈর্ঘ্য (ফুট)	পুকুরের প্রস্থ (ফুট)	আয়তন (শতাংশ)	চুনের পরিমান (কেজি)	মন্তব্য
১০০	৬০	১৪	১৪	৪৩৫.৬ বর্গ ফুট = ১ শতাংশ এবং ১০০০ গ্রাম= ১ কেজি

উদাহরণঃ মনে কর একটি পুকুরের দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট ও প্রস্থ ৬০ ফুট।
পুকুরের আয়তন = ১০০ × ৬০ = ৬,০০০ বর্গ ফুট= ৬,০০০ /৪৩৫.৬= ১৩.৭৭ শতাংশ
= ১৪ শতাংশ= ১.০ কেজি × ১৪ = ১৪ কেজি

খ. দ্বিতীয় পর্যায় : পুকুরে চুন প্রয়োগ পদ্ধতি।

১. পরিমাপকৃত চুন টিনের ড্রাম বা বালতি বা মাটির চাড়িতে ১২-২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখ। চুন গোলাবার সময় তাপ সৃষ্টি হয় বিধায় পাস্টিকের পাত্রে চুন গুলানো উচিত নয়।

২. চুন ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর ড্রামে বেশি পানির সাথে মিশিয়ে তরল কর।

৩. এবার চুনের দ্রবণ মগ দিয়ে সমস্ত পুকুরে ভালোভাবে ছিটিয়ে দাও।

৪. সর্বত্র সমানভাবে চুন প্রয়োগ করতে হবে, বাতাসের অনুকূলে চুন প্রয়োগের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. এবার অনুশীলনকৃত কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

ব্যবহারিক- ১৪ পুকুরের তলদেশে চাষ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

চিংড়ির পুকুরের মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য পুকুরের তলদেশে চাষ দেয়া হয়। পুকুরের তলদেশের মাটির ৬ ইঞ্চির অধিক গভীরে চাষ দেয়া উচিত নয়। কষযুক্ত মাটিতে চাষ না দেয়াই উত্তম। কষযুক্ত মাটি চাষ দিলে কষযুক্ত মাটি তলদেশের উপরিভাগে চলে আসে, ফলে পুকুরের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়।

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোনো পুকুর বা খামারে গমন কর।

২. কষযুক্ত মাটি কিনা তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৩. মাটি কষযুক্ত না হলে পুকুরের তলদেশে চাষের উপযোগী হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ কর।

৪. এবার পাওয়ার টিলার বা লাঙল দিয়ে কিভাবে চাষ দিচ্ছে তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৫. পাওয়ার টিলারের বা লাঙলের ফলা মাটির ৬ ইঞ্চির নিচে প্রবেশ করছে কি না তা পর্যবেক্ষণ কর।

৬. এক শতাংশ জমি চাষ দিতে মোট কত সময় লাগছে তা খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

৭. অনুশীলনকৃত কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

ব্যবহারিক- ১৫: পুকুরে সার প্রয়োগের পরিমাণ নির্ণয়

প্রাসঙ্গিক তথ্য

চিংড়ির খামারে সাধারণত দু'ধরনের সার ব্যবহার করা হয়, যেমন- জৈব ও অজৈব সার। জৈব সার হল্মে গোবর, কম্পোস্ট ইত্যাদি এবং অজৈব সার হলো- ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি ইত্যাদি। পুকুর প্রস্তুতকালীন জৈব ও অজৈব সার আলাদা আলাদাভাবে বা উভয় প্রকারের সার একত্রে মিশ্রিত করে প্রয়োগ করা যায়। চুন প্রয়োগের ৭ ১০ দিন পর জৈব ও অজৈব সারের মিশ্রণ পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণ অবস্থায় প্রতি শতাংশে গোবর ৮ ১০ কেজি, ইউরিয়া ১০০ গ্রাম এবং টিএসপি ৫০ গ্রাম প্রয়োগ করা হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. ইউরিয়া সার
২. টিএসপি সার
৩. গোবর সার
৪. বালতি
৫. হাফ ড্রাম
৬. ছোট মগ
৭. মেজারিং টেপ
৮. মেজারিং পালে
৯. ব্যালান্স
১০. ব্যবহারিক খাতা
১১. পেনসিল
১২. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

ক. সার প্রয়োগের পরিমাণ নির্ণয়

১. নিকটস্থ কোনো খামার বা পুকুরে গিয়ে মেজারিং টেপ ও মেজারিং পালের সাহায্যে পুকুরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ (ফুট) পরিমাপ কর।

২. এবার পরিমাপকৃত দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ গুণ করে উক্ত গুণফলকে ৪৩৫.৬ দিয়ে ভাগ করে শতাংশে পুকুরের আয়তন নির্ণয় কর (১ শতাংশ = ৪৩৫.৬ বর্গফুট)।

৩. শতাংশ প্রতি ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০ গ্রাম টিএসপি ও ৫ কেজি গোবর সার হিসেবে মোট ইউরিয়া টিএসপি ও গোবর সারের পরিমাণ নির্ণয় কর।

৪. অনুশীলন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

পুকুরের দৈর্ঘ্য (ফুট)	পুকুরের প্রস্থ (ফুট)	আয়তন (শতাংশ)	সারের পরিমাণ			মন্তব্য
			ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	গোবর (কেজি)	
১০০	৬০	১৪	১৪০০	৭০০	১৪০	১০০০ গ্রাম= ১ কেজি ৪৩৫.৬ বর্গ ফুট = ১ শতাংশ

উদাহরণ: মনে কর, পুকুরের দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট ও প্রস্থ ৬০ ফুট। তাহলে

পুকুরের আয়তন = ১০০ × ৬০ = ৬,০০০/৪৩৫.৬ বর্গ ফুট= ১৩.৭শতাংশ= ১৪ শতাংশ

মোট ইউরিয়া সারের পরিমাণ = ১০০ গ্রাম × ১৪= ১৪০০ গ্রাম

মোট টিএসপি সারের পরিমাণ = ৫০ গ্রাম × ১৪= ৭০০ গ্রাম

মোট গোবর সারের পরিমাণ = ১০ কেজি × ১৪= ১৪০ কেজি

গ. পুকুরে সার প্রয়োগ পদ্ধতিঃ

১. পুকুরে সার প্রয়োগের ১ দিন আগে টিএসপি সার বালতি বা হাফ ড্রামে ভিজিয়ে রাখ।

২. সার ব্যবহারের দিন ইউরিয়া ও গোবর সার আলাদা আলাদা ড্রাম বা বালতিতে গুল।

৩. এবার ইউরিয়া, টিএসপি ও গোবর সার একত্রে একটি বড় ড্রামে বেশি পানির সাথে মিশিয়ে দ্রবণ। তৈরি কর।

৪. সারের দ্রবণ বালতিতে নিয়ে পুকুরের উপরিভাগে ছোট মগের সাহায্যে সর্বত্র উত্তমরূপে ছিটিয়ে দাও।

৫. অনুশীলন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

সাবধানতাঃ

১. টিএসপি সার সহজে গুলে না। তাই ব্যবহারের আগের দিন পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে।

২. চুন প্রয়োগের ৭-১০ দিন পর সারের মিশ্রণ পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে।

ব্যবহারিক- ১৬ঃ ঘেরের পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

চিংড়ি ঘেরের পানিতে বিভিন্ন পুষ্টিকর উপাদানের উপস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবে যে সব খাদ্য তৈরি হয় তাকে প্রাকৃতিক খাদ্য বলে। প্রাকৃতিক খাদ্যের উপর নির্ভর করে আমাদের দেশে উন্নত সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হয়। প্রাকৃতিক খাদ্য দুধরনের উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন (Phytopankton) ও প্রাণী প্ল্যাংকটন (Zooplankton)।

চিত্রঃ প্রাকৃতিক খাদ্য (প্রাণী প্ল্যাংকটন)

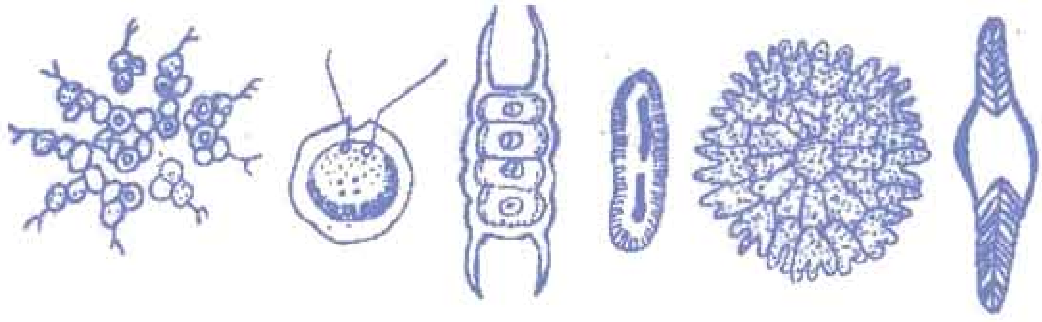

চিত্রঃ প্রাকৃতিক খাদ্য (উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন)

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. ছিপিসহ কাচের বোতল
২. প্ল্যাংকটন নেট
৩. ফানেল
৪. ড্রপার
৫. জেট বোতল
৬. পরিস্রুত পানি
৭. স্লাইড কভারসহ গ্লাস
৮. মাইক্রোস্কোপ
৯. ব্যবহারিক খাতা
১০. পেনসিল
১১. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোনো চিংড়ি খামারে গমন কর।

২. খামারের যে কোনো পুকুর থেকে ১০ লিটার পরিমাণ পানি প্ল্যাংকটন নেট দিয়ে ছেঁকে সংগৃহীত প্ল্যাংকটন জেট বোতল ও ফানেলের সাহায্যে বোতলে নিয়ে পানিসহ বোতল পরীক্ষাগারে নিয়ে আস।

৩. বোতলটি সামান্য একটু বেঁকে নিয়ে ড্রপার দিয়ে বোতল থেকে পানি নিয়ে গ্লাস স্লাইডের উপর এক ফোঁটা নমুনা রাখ এবং স্লাইড কভার দিয়ে পানি ঢেকে দাও।

৪. এবার মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে প্রাণী ও উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৫. উপরে অঙ্কিত প্রাণী ও উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন চিত্রের সাথে মিলিয়ে দেখে প্রাণী ও উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন শনাক্ত কর।

৬. এবার পর্যবেক্ষণকৃত প্রাণী প্ল্যাংকটন ও উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনের ছবিগুলো পেনসিল দিয়ে ব্যবহারিক খাতায় আঁক।

৭. অনুশীলনকৃত কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

ব্যবহারিক- ১৭: সেক্কি ডিস্ক তৈরি ও পানির স্বচ্ছতা পরীক্ষাকরণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

খামারের পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য অর্থাৎ প্ল্যাংকটনের পরিমাণের ওপর চিংড়ির উৎপাদন নির্ভরশীল। সাধারণত পানির স্বচ্ছতা পরিমাপ করে পুকুরের পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। পানির স্বচ্ছতা ২৫-৪০ সেমি-এর মধ্যে থাকলে বুঝতে হবে পানিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক খাদ্য অর্থাৎ প্ল্যাংকটন বিদ্যমান আছে। সাধারণত সেক্কি ডিস্ক দিয়ে পানির স্বচ্ছতা পরীক্ষা করা হয়। সেকি ডিক হচ্ছে লাহো বা ভারী টিনের তৈরি একটি গোলাকার চাকতি বিশেষ। এই গোলাকার চাকতির চারটি সমান অংশে ভাগ করে পর্যায়ক্রমিকভাবে সাদা ও কালো রং লাগিয়ে চিহ্নিত করা হয়। এই চাকতির কেন্দ্রে সুতা বা একটা শক্ত কাঠের লাঠি স্থাপন করে এই সুতা বা লাঠি সেন্টিমিটারে দাগাঙ্কিত করা হয়। তবে ২৫ সেমি ও ৪০ সেমি- এ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দাগাজ্জিত করা হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. একটি গোলাকার চাকতি	৪. তুলি	৭. ব্যবহারিক খাতা
২. মোটা সুতা	৫. কেল	৮. পেনসিল
৩. সাদা ও কালো রং	৬. অমুছনীয় মার্কিং পেন	৯. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

ক. প্রথম পর্যায়: সেক্কি ডিস্ক তৈরি

১. লাহোর বা ভারী টিনের একটি গোলাকার চাকতি সংগ্রহ করে তার উপরিভাগ কেল দিয়ে মেপে সমান চারভাগে বিভক্ত কর।

২. এবার গোলাকার চাকতির উপরিপৃষ্ঠের চারটি অংশকে তুলির সাহায্যে সাদা ও কালো রং দিয়ে চিহ্নিত কর।

৩. চাকতিটির কেন্দ্র বিন্দুতে একটি ছোট ছিদ্র করে এই ছিদ্র দিয়ে একটি মোটা সুতা ঝুলিয়ে দাও।

৪. এবার স্কেল দিয়ে সুতাটিকে সেন্টিমিটারে অমুছনীয় কালি দিয়ে দাগাঙ্কিত কর।

৫. সুতাটির ২৫ সেমি ও ৪০ সেমি-এ বিশেষভাবে অমুছনীয় কালি দিয়ে চিহ্নিত কর।

৬. অনুশীলন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

খ. দ্বিতীয় পর্যায়: সেক্কি ডিস্কের ব্যবহার

১. নিকটস্থ কোনো পুকুর পাড়ে গমন করে সাবধানে পুকুর পাড় থেকে বা পানিতে নেমে সেক্কি ডিস্কটি আস্তে আস্তে পানিতে ছেড়ে দাও। সেক্কি ডিকটি পানিতে ছেড়ে দেয়ার সময় গোলাকার চাকতিটির ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখ।

২. গোলাকার চাকতিটি পানিতে উঠা-নামার সময় যখন চাকতির সাদা-কালো রং অস্পষ্টভাবে দেখা যাবে তখন পানির উপরিতল থেকে সুতার পরিমাপ গ্রহণ কর। পানির উপরিতল থেকে সুতার যে পরিমাপ পাওয়া যাবে সেটাই সেকি ডিক রিডিং। এই সেক্তি ডিক পানির স্বচ্ছতা নির্দেশ করে।

৩. এবার সেক্কি ডিস্ক রিডিং খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

৪. অনুশীলনকৃত কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর। ২০২২

ব্যবহারিক- ১৮: প্রাকৃতিক উৎস থেকে বাগদা পোনা সংগ্রহ ও শনাক্তকরণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকাসমূহে অর্থাৎ সাতক্ষীরা থেকে কক্সবাজার জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলীয় অঞ্চল, সাগর এলাকা, নদ-নদী ও খাল-বিলে বাগদা চিংড়ির পোনা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। সাধারণত ডিসেম্বর থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত উপকূলীয় নদীসমূহে বাগদার পোনা পাওয়া যায়। বেহুন্দী জাল, ঠেলা জাল, টানা জাল ও ছাঁকনি থেকে বাগদা পোনা সংগ্রহ করা হয়।

২. বাগদা চিংড়ির পোস্ট লার্ভা বা পিএল অন্যান্য চিংড়ির পোস্ট লার্ভার চেয়ে আকারে বড় হয়। দেহের গঠন সরু এবং লম্বাটে হয়ে থাকে। চক্ষু তুলনামূলকভাবে বড়। পিএল-এর দেহের দৈর্ঘ্য বরাবর লেজ পর্যত বাদামি রঙের দাগ দেখা যায়। জুভেনাইল অবস্থায় এই দাগ সবুজ বর্ণ ধারণ করে এবং পেটের দিকে তখন এটি একটি কাঠির মত দেখায়। খড়গ বা শুড় সোজা এবং ডগাটি সামান্য উপর দিকে বাঁকানো থাকে। খড়গের উপর তলে ৫টি দাঁত দেখা যায়। ১ম তিন জোড়া পায়ের শেষ প্রান্তে ছোট চিমটা আছে। ২য় পা ১ম পায়ের চেয়ে সামান্য লম্বা এবং ৩য় পায়ের চাইতে ছোট বা সমান।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. টিনের পালা
২. সিলভারের পাতিল
৩. ঝিনুক
৪. বাগদা পোনা
৫. মেজারিং ফ্লাক
৬. ম্যাগনিফাইং গাস
৭. ড্রপার
৮. পরিসুত পানি
৯. ফরসেপ
১০. গাস স্লাইড
১১. ট্রে
১২. ব্যবহারিক খাতা
১৩. পেনসিল
১৪. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. উপকূলীয় অঞ্চলের কোনো নদীর তীরবর্তী পোনা বিক্রয় কেন্দ্রে গমন কর।

২. পোনা বিক্রয় কেন্দ্রের কোনো পোনা ব্যবসায়ী নিকট থেকে সুস্থ, সবল পোনা সংগ্রহ কর।

৩. টিনের থালায় পানিসহ কিছু পোনা নিয়ে সেগুলো সুস্থ সবল কিনা তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৪. এবার বিক্রয় কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত পোনাগুলো পানিভর্তি মেজারিং ফ্লাকে করে পরীক্ষাগারে নিয়ে আস।

৫. পরীক্ষাগারে এসে মেজারিং ফ্লাস্ক থেকে কিছু পোনা পানিসহ টিনের থালায় রাখ।

৬. ড্রপারের সাহায্যে ১ টি পোনা পানিসহ ট্রেতে রক্ষিত গাস স্লাইডের উপরিতলে রাখ এবং গাস স্লাইডের উপর এক ফোটা পরিশ্রত পানি দাও।

৭. এবার আঁতশ কাচ দিয়ে পোনাটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৮. পোনার শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

৯. পেন্সিল দিয়ে পোনার চিত্র ব্যবহারিক খাতায় অঙ্কন কর।

১০. অনুশীলনকৃত কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

ব্যবহারিক- ১৯: বাগদা খামারে বাঁধ ও খাল নির্মাণ কৌশল পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. বাঁধ: পুকুরের পানি ধারণ ও বন্যা বা জোয়ারের পানির অনুপ্রবেশ বন্ধ করাই বাঁধ নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য। যে এলাকায় পুকুর নির্মাণ করা হবে সেই এলাকার ৫-১৫ বৎসরের সর্বোচ্চ জোয়ারের উচ্চতা জেনে বাঁধের উচ্চতা নির্ধারণ করা উচিত। বাঁধের মাটি ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে বাঁধের উচ্চতা কমে যায় বলে বাঁধ নির্মাণের সময় তা প্রয়োজনের চেয়ে ০.৬-০.৭ মিটার অতিরিক্ত উঁচু করা দরকার। বাঁধের ঢাল ভিতরের দিকে ১:১ এবং বাইরের দিকে ১:২ অনুপাতে রাখা যায়।

২. খাল: যে সব বাগদা পুকুর পানি সরবরাহের উৎসের নিকটবর্তী নয়, সে সমস্ত পুকুরে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশনের জন্য পৃথক নালা নির্মাণ করা উচিত। পুকুরের পানি সম্পূর্ণ নিষ্কাশনের জন্য খালের তলদেশ পুকুরের তলদেশ থেকে কিছুটা নিচু থাকা প্রয়োজন।

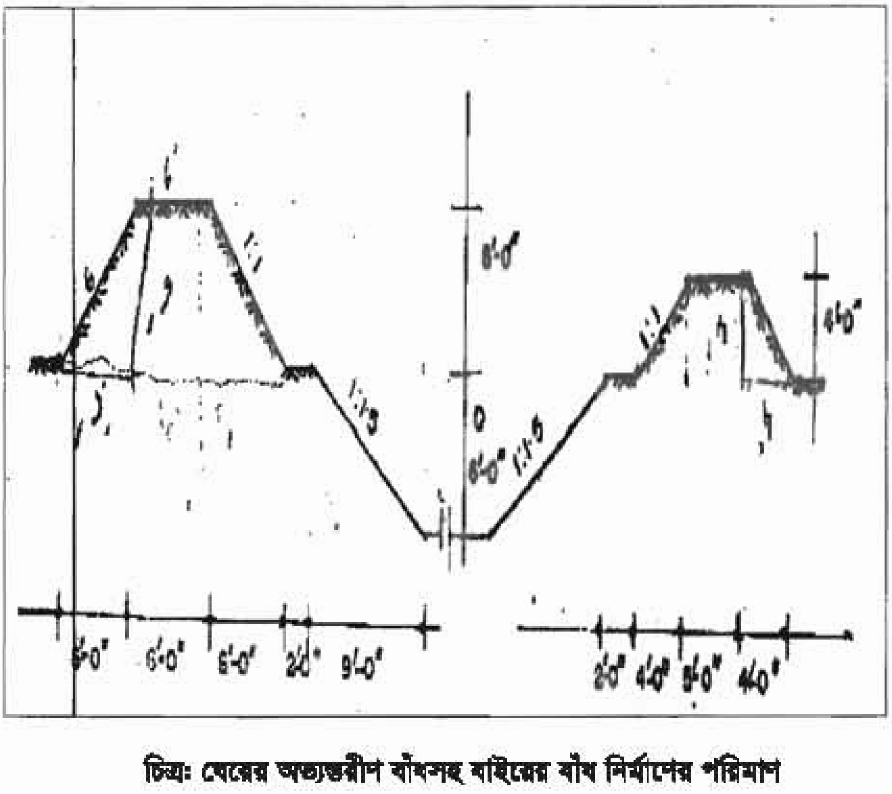

চিত্র: ঘেরের অভ্যন্তরীণ বাঁধসহ বাইরের বাঁধ নির্মাণের পরিমাণ

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. মেজারিং টেপ
২. মেজারিং পোল
৩. ব্যবহারিক খাতা
৪. পেনসিল
৫. ইরেজার, ইত্যাদি

১. নিকটস্থ কোনো বাগদা খামারে গমন কর।

২. নির্মাণাধীন পুকুরের বাধ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৩. মেজারিং পালে ও মেজারিং টেপ দিয়ে বাঁধের বাইরের ও ভিতরের দিকের ঢাল পরিমাপ কর এবং এই চালের। অনুপাত খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

৪. বাধের উচ্চতা, চূড়া ইত্যাদি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে এগুলো পরিমাপ কর।

৫. বাধের মাটি যথাযথভাবে নিবিড়করণ (Compaction) করা হয়েছে কিনা তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা।

৬. বাঁধ বৃষ্টির পানিতে যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য ঘাসের চাপড়া লাগানো হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ কর।

৭. এবার সরবরাহ খালের তলদেশের উচ্চতা পুকুরের চেয়ে কিছুটা উঁচু এবং নিষ্কাশন খালের তলদেশের উচ্চতা পুকুরের তলদেশের চেয়ে কিছুটা নিচু কিনা তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৮. খালের তলদেশের প্রশস্ততা ও খালের গভীরতা মেজারিং পালে ও মেজারিং টেপ দিয়ে পরিমাপ কর।

৯. সরবরাহ ও নিষ্কাশন খাল দিয়ে পুকুরে প্রয়োজনমত যথাসময়ে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন করা সম্ভব কিনা তা পর্যবেক্ষণ কর।

১০. কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-১

দ্বিতীয় পত্র

তাত্ত্বিক

২০২২

প্রথম অধ্যায়

বাগদা চিংড়ি আহরণ ও বাজারজাতকরণ

চিংড়ির চাষের শেষ ধাপ হচ্ছে চিংড়ি আহরণ। সঠিক সময়ে চিংড়ি আহরণ ও বাজারজাত করতে না পারলে চিংড়ি চাষে আশানুরূপ লাভ পাওয়া যায় না। সাধারণত চিংড়ির গড় ওজন ও বাজারদরের উপর লক্ষ্য রেখে চিংড়ি আহরণ করা হয়। তবে অনেক সময় চিংড়ির রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিলে চিংড়ির ওজন ও বাজারদর বিবেচনা না করেই চিংড়ি আহরণ করা হয়।

চিংড়ি ধরার সময়কাল

চিংড়ি খুবই স্পর্শকাতর। নতুন পানির স্পর্শ পেলেই এরা নতুন অক্সিজেনযুক্ত পানিতে এসে একত্রিত হয়। দিনে প্রচণ্ড রোদের সময় পানি ঢাকোনো হলে এরা গেটের সম্মুখে চলে আসে। অনেক সময় পানি গরম হয়ে গেলে চিংড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মারা যেতে পারে। পানির গভীরতা কম এমন স্থানে চিংড়ি চলে আসার সম্ভাবনা থাকলে এ সময় চিংড়ি ধরা বন্ধ করা উচিত। চিংড়ি প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমার পর দেহ বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক নিয়মে খোলস বদলায়। এ সময় চিংড়ি অত্যন্ত নরম থাকে। নরম চিংড়ির বাজার চাহিদা ও বাজারদর কম থাকে। এছাড়াও খাবারের অভাব বা চিংড়ির খাদ্যে ক্যালসিয়ামের অভাব হলে চিংড়ির খোলস নরম হতে পারে। এ সব কারণেই চিংড়ি ধরার পূর্বে নমুনা পরীক্ষা করে নেয়া ভালো। চিংড়ি ধরার পূর্বে চিংড়ি বাজারজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আগাম প্রস্তুত রাখা উচিত। যাতে সময়মত চিংড়ি বাজারজাত করা সম্ভব হয়। সময়মত চিংড়ি বাজারজাত করা সম্ভব না হলে গুণগত মান বিনষ্ট হয় এবং বাজারে চাহিদা থাকে না।

চিংড়ি আহরণ পদ্ধতি

চিংড়ি চাষের সময় ও চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে চিংড়ি আহরণের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। চিংড়ি আহরণের ক্ষেত্রে চিংড়ির ঘেরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, জমি ব্যবহারের পরবর্তীকালীন লক্ষ্য, পরবর্তী ফসলের সময়, চিংড়ির বাজারদর, পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা, প্রক্রিয়াজাতকরণের সুবিধা প্রভৃতি বিবেচনা করে চিংড়ি আহরণ করা উচিত। সাধারণত চিংড়ির বয়স ৩ থেকে ৪ মাস হলে চিংড়ি আহরণ করা আরম্ভ হয়। চিংড়ির খামারে বা ঘেরে পর্যাপ্ত খাবার বিদ্যমান থাকলে এবং ঘেরের পরিবেশ চিংড়ির বৃদ্ধির অনুকূল হলে ৪ থেকে ৫ মাসের মধ্যে ১৫ থেকে ৩০ টি চিংড়ি মাথাবিহীন অবস্থায় ১ পাউন্ড ওজনের হয়ে থাকে। এ সময় প্রতিটি চিংড়ির ওজন ৩০ থেকে ৫০ গ্রাম হয়ে থাকে। আমাদের দেশে প্রধানত দু'ভাবে চিংড়ি আহরণ করা হয়ে থাকে, যেমন- ক. আংশিক আহরণ ও খ. সম্পূর্ণ আহরণ।

ক. আংশিক আহরণ: এ পদ্ধতিতে ঘেরের চিংড়ি ১৫ থেকে ২০ গ্রেডের মধ্যে এলেই অমাবস্যা ও পূর্ণিমার জোয়ারে নতুন পানি ঢাকোনোর সময় বড় আকারের চিংড়ি ধরা আরম্ভ হয়। জোয়ারের সময় নির্দিষ্ট স্থানে চিংড়ি আটকিয়ে ঝুঁকি জাল দিয়ে বা অন্য কোনো প্রকার ছোট জাল ব্যবহারের মাধ্যমে আংশিক চিংড়ি ধরা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে শুধু বড় আকারের চিংড়ি ধরে ছোট চিংড়িসমূহ বড় হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

চিত্র: চিংড়ি আহরণ পদ্ধতি

সুবিধা

- সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে বাজারজাত করা যায়।
- গ্রেড অনুযায়ী চিংড়ির আকার মোটামুটি একই রকম করা যায়।
- বাজারজাতকরণের ঝুঁকি কম থাকে।
- ঘেরের ছোট চিংড়ি বড় হতে সুযোগ পায়।
- পরিবহন পাত্র ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য জিনিসপত্র কম লাগে।

অসুবিধা

- চিংড়ি ধরার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শ্রম ব্যয় হয়।
- কিছুটা সময় অপচয় হয়।
- পরিবহন খরচ বেশি লাগে।

চিত্রঃআহরণকৃত বাগদা চিংড়ি

খ. সম্পূর্ণ আহরণঃ এ পদ্ধতিতে খামারের পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে গেটে জাল পেতে ছোট-বড় সব রকম চিংড়ি ধরা হয়। চিংড়ি সম্পূর্ণভাবে ধরার জন্য ব্যাগ নেট, বেহুন্দি জাল, হাপা নেট প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘেরের পানি সম্পূর্ণ নিষ্কাশনের পর স্কুপ নেট (Scoop net) বা হাতের মাধ্যমেও চিংড়ি ধরা যেতে পারে।

সুবিধা

- খামারে নতুন ফসলের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সুবিধা হয়।
- চিংড়ি ধরার কাজে শ্রম বিনিয়োগ কম লাগে।
- ফসল পর্যায়ক্রম (Crop rotation) করতে সুবিধা হয়।
- একসাথে সমস্ত চিংড়ি বাজারজাত করা যায়।

অসুবিধা

- অনেক চিংড়ি ছোট অবস্থায় থেকে যায় বা বড় হওয়ার সুযোগ পায় না।
- খামারে মোট উৎপাদন কিছুটা কম হয়ে থাকে।
- ছোট চিংড়ির বাজার চাহিদা কম হয়ে থাকে।
- চিংড়ি ধরার কাজে বেশি শ্রম বিনিয়াগের প্রয়োজন পড়ে।

চিংড়ি আহরণ সরঞ্জাম

বাগদা চিংড়ি ৩ থেকে ৪ মাসের মধ্যেই আহরণের উপযুক্ত হয়ে থাকে। মুক্ত জলাশয় বিশেষ করে খাল-বিল, নদী-নালা, প্লবিত ধানক্ষেত, হাওর-বাওড়, সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল ও গভীর সমুদ্র থেকে চিংড়ি আহরণের ক্ষেত্রে আহরণ নীতিমালায় উপকরণ ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও অনেক সময় এ সকল নীতিমালা পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। জলাশয়ের উৎসের বৈচিত্র্যতা ও চিংড়ি আহরণ উপকরণের কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের বাহন ও উপকরণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চিংড়ি আহরণ বলতে প্রধানত বাজারজাতকরণের উপযোগী চিংড়ি ধরাকে বোঝানো হয় এবং চিংড়ি ধরার জন্য যেসব উপকরণ ব্যবহার করা হয় তাকে আহরণ উপকরণ বলা হয়। চিংড়ি আহরণ উপকরণসমূহকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে, যেমন- ক. চিংড়ি আহরণ বাহন বা ক্রাফট (Crafts) এবং খ. চিংড়ি আহরণ উপকরণ বা গিয়ার (Gears)।

চিংড়ি আহরণ উপকরণসমূহকে এক কথায় ক্রাফট ও গিয়ার বলা হয়। মূলত একটি অপরটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। চিংড়ি আহরণ পদ্ধতি সাধারণত জলাশয়ের প্রকৃতি ও ধরনের উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশে চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়ায় চিংড়ি সম্পদযুক্ত জলাশয় ও চাষকৃত জলাশয় থেকে বাজারে আসে। জলাশয়ের ধরন, প্রকৃতি ও কারিগরি বৈশিষ্ট্য ও উপযাগিতা অনুসারে চিংড়ি আহরণ বাহন ও উপকরণ উভয়েরই প্রয়োজন হয়। কখনও কখনও বাহনের প্রয়োজন হয় না। বাণিজ্যিকভাবে মুক্ত জলাশয় ও বৃহৎ চিংড়ি ঘের থেকে চিংড়ি আহরণের ক্ষেত্রে বাহন ও উপকরণ উভয়েরই প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই চিংড়ি ধরার বা আহরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ, জাল ও বড়শি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কৌশলগত দিক থেকে এসব আহরণ উপকরণের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। বাংলাদেশে ব্যবহৃত কতিপয় চিংড়ি আহরণ উপকরণের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. ফাঁদ: ফাঁদের মাধ্যমে চিংড়িকে জীবন্ত অবস্থায় ফাঁদের অভ্যন্তরে আটকে রেখে পানির উপরিভাগে তুলে চিংড়ি আহরণ করা হয়। সাধারণত অগভীর জলাশয়ে বা জোয়ার-ভাটার অঞ্চল বা জলাশয়ে পানি প্রবেশের মুখে ফাঁদ পেতে মাছ বা চিংড়ির পরিভ্রমণ পথে বাধার সৃষ্টি করা হয়। ফাদ তৈরির মৌলিক দিক হিসেবে ফাঁদের মধ্যে চিংড়ি পানির গতির মাধ্যমে সহজেই ফাদের মুখ দিয়ে ফাঁদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু চিংড়ি পুনরায় উক্ত প্রবেশ পথ দিয়ে বের হতে পারে না। উল্লেখ্য ফাঁদের পশ্চাদ্ভাগ বন্ধ থাকে এবং চিংড়ি সংগ্রহের সময় ফাঁদের পিছন দিক খুলে বা নির্দিষ্ট পথে চিংড়ি সংগ্রহ করা হয়। ফাঁদের মাধ্যমে সাধারণত পারিবারিক মৎস্য চাহিদা মিটানো হয়। চিংড়ির প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে কখনও কখনও তা সংশ্লিষ্ট আহরণকারীর পেশা হিসেবেও গণ্য হয়।

বাংলাদেশে ব্যবহৃত অধিকাংশ ফাঁদই বাঁশের সাহায্যে তৈরি করা হয়। উন্নত বিশ্বে প্লাস্টিক নির্মিত সরু দণ্ডের মাধ্যমে ফাঁদ নির্মাণ করা হয়। এলাকা বা অঞ্চলভেদে এবং চিংড়ি আহরণ উৎসের ধরন অনুসারে ফাঁদের আকৃতি ও প্রকৃতি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বাংলাদেশে চিংড়ি ধরার জন্য প্যারন, ডারকি, বেনকি, ইচা চাই, আন্থকা প্রভৃতি ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নিচে চিংড়ি ও অন্যান্য ছোট আকৃতির মাছ আহরণের ফাদের বিবরণ দেয়া হলো:

ক. অ্যান্টা (Anta)

গঠন প্রকৃতিঃ আকৃতিতে আয়তকার এবং সাধারণত উচ্চতা প্রস্থের চেয়ে কিছুটা বেশি। মূলত বাশ দিয়ে অ্যান্টা তৈরি করা হয়। ফাঁদের উচ্চতা অংশের একদিকে চিংড়ি ও অন্যান্য জলজ প্রাণী প্রবেশের জন্য এমনভাবে প্রবেশ পথ তৈরি করা হয়, যাতে অতি সহজেই পানির গতির মাধ্যমে চিংড়ি ফাঁদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু সহজে বের হতে পারে না। প্রবেশ পথ লম্বায় প্রায় অ্যান্টার মোট দৈর্ঘ্যের সমান হয়ে থাকে। ফাঁদের একাংশে চিংড়ি আহরণের জন্য নির্দিষ্ট স্থান রাখা হয়। নির্দিষ্ট স্থান বন্ধ ও খালোর জন্য সহজ ব্যবস্থা রাখা হয়।

ব্যবহার পদ্ধতিঃ সাধারণত, এ ধরনের ফাঁদের মাধ্যমে ছোট মাছ ও চিংড়ি ধরা হয়। গতিশীল পানিতে চিংড়ি ধরার জন্য এ ধরনের ফাঁদ জলাশয়ে পানি প্রবেশের মুখে বা মোহনাঞ্চলের নদী-নালা বা মুক্ত জলাশয়ে পানির গতির। বিপরীত দিকে মুখ করে প্রতিস্থাপন করা হয়। নির্দিষ্ট সময় পরে ফাঁদ পানির উপরে তুলে চিংড়ি আহরণ করা হয়। মুক্ত জলাশয়ে ফাঁদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাঁশের খুঁটির মাধ্যমে নির্দিষ্ট গভীর-তায় স্থাপন করা হয়। কোথাও কোথাও চিংড়ির গতি নির্দিষ্ট পথে পরিচালনার জন্য ফাঁদের দু'পাশে ১২০° কোণ করে বানার ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে একই সাথে অনেকগুলো ফাঁদ বিভিন্ন গভীরতায় স্থাপন করা হয়।

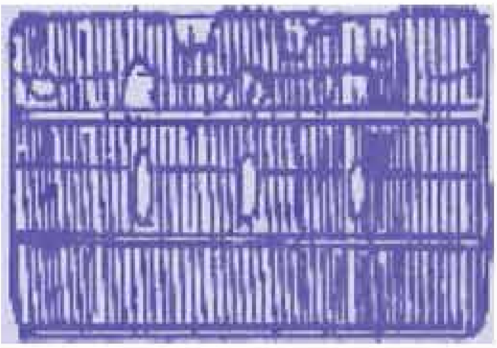

চিত্রঃ অ্যান্টা

বিস্তৃতঃ বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলায় এ ধরনের ফাঁদ ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। এছাড়া ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশে এ ধরনের ফাঁদের প্রচলন রয়েছে।

খ. বেনকি (Benki)

গঠন প্রকৃতিঃ আকৃতিতে আয়তকার, নিচের অংশ বেশ চ্যাপ্টা, তবে উপরের অংশ সরু হয়ে থাকে। অগ্রবর্তী ও পশ্চাত্বর্তী অংশ কিছুটা লম্বা এবং চিংড়ি প্রবেশের জন্য এক। বা একাধিক প্রবেশ পথ থাকে। ফাঁদের উপরের অংশ কিছুটা লম্বা এবং চিংড়ি প্রবেশের অংশে চিংড়ি আহরণ পথ এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে পথের ঢাকনা সহজেই খালো, এবং বন্ধ করা যায়।

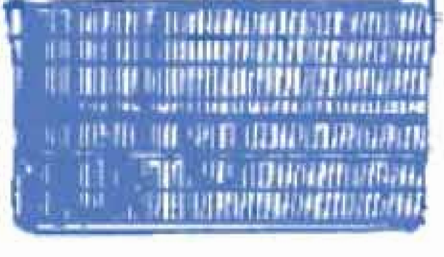

চিত্রঃ বেনকি ফাঁদ

ব্যবহার পদ্ধতিঃ বেনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহজপ্রাপ্য বাঁশের কাঁদি দিয়ে বিভিন্ন আকারের তৈরি করা হয়। ফাঁদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে জলাশয়ের ধরন ও প্রকৃতি আন্টা ফাঁদের অনুরূপ। তবে এ ধরনের ফাঁদ এককভাবে বা একাধিক ফাঁদ কৌণিকভাবে সংযোগে করে একত্রে মাছ আহরণের জন্য স্থাপন করা হয়। সাধারণত এ ফাঁদের মাধ্যমে চিংড়ি ও ছোট প্রজাতির মাছ ধরা হয়।

বিস্তৃতিঃ বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলায় এ ধরনের ফাঁদ ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে বেনকি ফাঁদের বিভিন্ন নাম লক্ষ্য করা যায়, যেমন- বেঞ্চি (Benchi), ঢেউর (Dheur), ধাইর (Dhiar) ইত্যাদি।

গ. ডারকি (Darki)

গঠন প্রকৃতিঃ আকৃতিগত দিক থেকে এটি আয়তকার হয়ে থাকে এবং এলাকাভেদে বিভিন্ন আকারের ডারকি প্রধানত বাঁশের চর সাহায্যে তৈরি করা হয়। ফাঁদের দরজা এর বক্ষ পাশের (উত্তরদিকে) তলদেশে অবস্থিত। ফলে উত্তরদিক থেকেই অর্থাৎ পানির গতিপথ পরবর্তীত হলেও এ ফাঁদ লম্বালম্বিভাবে তলদেশ থেকে উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। পার্শ্বভাগে মাছ আহরণের দরজা বিদ্যমান।

ব্যবহার পদ্ধতিঃ হাওর-বাঁওড়, নদী-নালা, খাল-বিল প্রভৃতি জলাশয়ে পানি প্রবেশ ও বের হওয়ার পথে এই ফাঁদ পেতে চিংড়ি সংগ্রহ করা হয়। প্রবহমান পানিতেও চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ ধরার ক্ষেত্রে এ ফাঁদের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়।

বিস্তৃতিঃ বাংলাদেশের সকল জেলায় এ ধরনের ফাঁদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, গোপালগঞ্জ প্রভৃতি জেলাসমূহে এ ফাঁদের প্রচলন বেশি দেখা যায়।

ঘ. দোয়ার

গঠন প্রকৃতিঃ দেখতে অনেকটা আয়তকার, তলদেশ প্রশস্ত ও শীর্ষদেশ সরু এবং পাশের দু প্রান্ত একই রেখা বরাবরে অবস্থান করে। এ ধরনের ফাঁদে দুটি ফাঁদ দরজা থাকে। ফাঁদ দরজা দুটো একই পাশে বা উভয় পাশে হতে পারে। ফাঁদ দরজা ফাঁদের তলদেশ থেকে শীর্ষদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। ফাঁদের উপরিভাগে মাছ আহরণের একটি ছিদ্র থাকে, যা অতি সহজেই খোলা এবং বন্ধ করা যায়।

ব্যবহার পদ্ধতিঃ সাধারণত প্রবহমান পানি এবং প্লাবনভূমি থেকে চিংড়ি আহরণের ক্ষেত্রে দোয়ার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফাঁদ নালা বা জলাশয়ে পানি উঠা-নামার স্থানে প্রতিস্থাপন করা হয়। ফাঁদের সম্মুখভাগের দিকে গাছের ডাল-পালা বা বানা দিয়ে এমনভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়, যাতে মাছ ও চিংড়ি প্রবহমান পানির গতির মাধ্যমে ফাঁদে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। গ্রামাঞ্চলে বানার পরিবর্তে খেজুর গাছের শাখা-প্রশাখাও ব্যবহার করা হয়।

বিস্তৃতিঃ বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে এ ধরনের ফাঁদের সাহায্যে প্লাবনভূমির মাছ আহরণ করা হয়।

ঙ. ইচা চাই (Icha chai)

গঠন প্রকৃতিঃ ইচা চাই অনেকটা ড্রাম আকৃতির এবং স্থানীয়ভাবে এটি বাঁশের চটা দিয়ে তৈরি করা হয়। পশ্চাদ্ভাগ অগ্রভাগের চেয়ে কিছুটা সরু। এ ফাঁদে পর পর দুটি ফাঁদ দরজা থাকে। ফাঁদের পশ্চাৎ দিকে মাছ আহরণের দরজা থাকে।

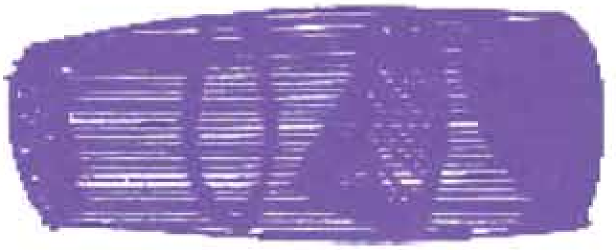

চিত্রঃ ইচা চাই

ব্যবহার পদ্ধতিঃ সাধারণত প্রবহমান পানি ও প্লাবনভূমি থেকে চিংড়ি আহরণ করার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা হয়। নালা ও জলাশয়ের পানি উঠানামার স্থানে এ ধরনের ফাঁদ ব্যবহার হয়। ফাঁদের সম্মুখভাগের দিকে গাছের ডালপালা বা বানা দিয়ে এমনভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয় যাতে চিংড়ি ও অন্যান্য প্রাণী প্রবহমান পানির গতির মাধ্যমে ফাঁদে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়।

বিস্তৃতিঃ বাংলাদেশের সকল জেলায় এ ফাঁদের ব্যবহার দেখা যায়। তবে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে এ চাঁইয়ের প্রচলন বেশি। সাধারণত এ চাঁইয়ের মাধ্যমে ইচা ও অন্যান্য ছোট মাছ ধরা হয়।

ছ. আহুকা (Ahuka)

স্থানীয় নামঃ বরিশাল, পটুয়াখালী, বগুড়া, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া ও রাজশাহী এবং পাবনা অঞ্চলে হানেচা (Honcha), ময়মনসিংহ অঞ্চলে উচা (Ucha), নোয়াখালী এবং রংপুর অঞ্চলে ঝাই (Jhaoi) নামে পরিচিত।

চিত্রঃ আহুকা

গঠন প্রকৃতিঃ আকৃতিগত দিক থেকে ত্রিকোণাকৃতির এবং বাঁশের মাদুরের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এটি লম্বায় ১.২৫ থেকে ৩ মিটার পর্যন্ত এবং প্রস্থে ৮০ সেমি থেকে ১২০ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। মূল ফাঁদের পশ্চাৎভাগ বন্ধ থাকে। ফাঁদ হাতের মাধ্যমে পরিচালনার জন্য এক খণ্ড বাঁশ মূল ফাঁদের সম্মুখভাগের মধ্যবর্তী অংশে এবং পশ্চাৎভাগের সাথে সংযুক্ত থাকে। বাঁশ খণ্ডের পিছনের অংশ ফাঁদের হাতল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফাঁদের হাতল ফাঁদের মোট দৈর্ঘ্যের প্রায় অর্ধেকের সমান।

ব্যবহার পদ্ধতিঃ স্বল্প গভীর জলাশয়ে চিংড়ি ধরার ক্ষেত্রে এ ধরনের ফাঁদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ফাঁদের মাধ্যমে চিংড়ি ধরার ক্ষেত্রে প্রধানত হাতের মাধ্যমে ফাঁদ পরিচালনা করা। ফাঁদের অগ্রভাগ মাটির সাথে বা পানির তলদেশে পানির কাছাকাছি স্থাপন করে দ্রুত গতিতে সম্মুখের দিকে টানা হয় এবং কিছু সময় পর পর ফাঁদের মাথা পানির উপরিভাগে তুলে ফাঁদে চিংড়ি বা মাছ ধরা পড়েছে কি-না তা পরীক্ষা করে দেখা হয়। সাধারণত ছোট আকৃতির চিংড়ি ধরার জন্য এ ধরনের ফাঁদ ব্যবহার করা হয়। পারিবারিক পর্যায়ে চিংড়ি বা মাছ আহরণের ক্ষেত্রে এ ধরনের ফাঁদ ছোট-বড় সকলেই ব্যবহার করতে সক্ষম।

বিস্তৃতিঃ বরিশাল, পটুয়াখালী, বগুড়া, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী এবং রংপুর অঞ্চলে এটি পাওয়া যায়।

২. জালঃ চিংড়ি আহরণে জন্য বিভিন্ন ধরনের জাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে চিংড়ি/মাছ ধরার জন্য সাধারণত যে সমস্ত জাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার বিবরণ নিচে দেয়া হলো।

ক. বেহুন্দি জাল

স্থানীয় নাম: বেহুন্দি জাল, বিন্দি জাল, বিউটি জাল, খারে জাল ইত্যাদি।

ব্যবহারিক উপযোগিতা ও স্থান: খুলনা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং বরিশাল অঞ্চলের উপকূলবর্তী এলাকায় এর সর্বাধিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মূলত এ জালের সাহায্যে জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত চিংড়ি ও চিংড়ির পোনা ধরা হয়।

জাল তৈরি উপকরণ: সাধারণত নাইলন সুতা জাল তৈরি করা হয়।

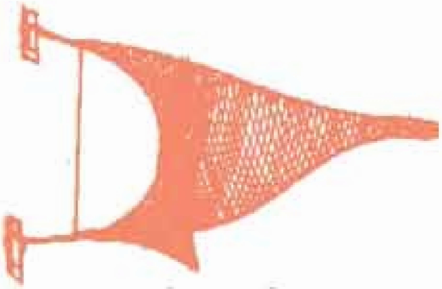

চিত্র: বেহুন্দি জাল

জালের ধরন ও প্রকৃতি: আকৃতিগত দিক থেকে এ ধরনের জাল মাচোকৃতি বা নলাকৃতির। লম্বায় বা দৈর্ঘ্যে ১৫ মিটার থেকে ৬০ মিটার এবং প্রস্থ ১৮ থেকে ৪৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ জালের ফাঁসের আকার ১.২৫ সেমি থেকে ২.৫ সেমি হয়ে থাকে। অন্যান্য থলে জালের মতো এ জালের মুখের অগ্রভাগে পাখনা বা ডানা বিদ্যমান এবং ডানার দৈর্ঘ্য ৯ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। জালের থলের দৈর্ঘ্য ২০ মিটারের অধিক এবং জালের মুখের দিকের ফাসের আকৃতি ৪ সেমি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

মাছ ও চিংড়ি আহরণের কৌশল হিসেবে এ ধরনের জাল উপকূলবর্তী অঞ্চলের জোয়ার-ভাটা প্রভাবিত নদ নদীসমূহে স্রোতের বিপরীতে নৌকার মাধ্যমে স্থাপন করা হয়। একটি বড় ধরনের জাল প্রতিস্থাপনে ২০ থেকে ৩০ জন জেলের প্রয়োজন হয়। অগভীর অঞ্চলে জাল প্রতিস্থাপনের জন্য দুটি বাঁশ বা কাঠের খুঁটি ব্যবহার করা হয়। জালের ডানা প্রতিস্থাপনের জন্য দৃঢ় কাঠের ফ্রেমের প্রয়োজন হয়। অপেক্ষাকৃত গভীর পানিতে এ ধরনের জাল প্রতিস্থাপনের জন্য নোঙরের ব্যবহার করা হয়। জালের মুখ খোলা রাখার জন্য বাঁশের পুল বা খুঁটি ব্যবহার করা হয়।

আহরণকৃত চিংড়ি প্রজাতি: হরিণ চিংড়ি, ছটকা চিংড়ি, কুচো চিংড়ি, রোপ্রাই চিংড়ি, চাকা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি, ইত্যাদি।

খ. বেহুন্তি জাল

স্থানীয় নাম: বিউটি জাল।

ব্যবহারিক উপযোগিতা ও স্থান: বরিশাল, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও খুলনা অঞ্চলের উপকূলবর্তী এলাকায় এ ধরনের জালের মাধ্যমে চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ আহরণ করা হয়। জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এ জালের প্রচলন অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

জাল তৈরির উপকরণ: সুতা বা নাইলন তন্তু দিয়ে এ ধরনের জাল তৈরি করা হয়।

জালের ধরন ও প্রকৃতি: আকৃতিগত দিক থেকে এটি নলাকৃতি বা মোচাকৃতির। এ জালের মুখের দু'পাশে মুখের ব্যাসের সমান প্রস্থ বিশিষ্ট পাখনা বা ডানা বিদ্যমান। ডানা দৈর্ঘ্যে উভয়দিকে ৪ থেকে ৬ মিটার পর্যন্ত হতে

২০২২

পারে। এ ধরনের জালের দৈর্ঘ্য ১২ থেকে ১৫ মিটার এবং প্রস্থ ১১ থেকে ১২ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এ জালের ফাঁসের আকার সম্মুখভাগে প্রায় ১.২৫ সেমি। জাল পরিচালনা ও প্রতিস্থাপনের জন্য ৩ থেকে ৪ জন আহরণকারী প্রয়োজন হয় এবং বাঁশের খুঁটি ও কাঠের ফ্রেমের মাধ্যমে স্রোতের বিপরীতে প্রতিস্থাপন করা হয়।

গ. চাঁর জাল

ব্যবহারিক উপযোগিতা ও স্থানঃ সাধারণত মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এ জালের সাহায্যে চিংড়ি ধরা হয়। চট্টগ্রাম, খুলনা, পটুয়াখালী ও বরিশাল অঞ্চলের উপকূলবর্তী এলাকায় এ ধরনের জাল দিয়ে চিংড়ি পোনা ধরা হয়।

জালের ধরন ও প্রকৃতিঃ আকৃতিগত দিক দিয়ে এ জাল আয়তকার এবং নৌকার সাহায্যে পরিচালনা করা হয়। জালের লম্বা দিক বাঁশের খুঁটির সাহায্যে দৃঢ় করা হয় এবং জালের খর্বাকার দিক নৌকার সম্মুখভাগের সাথে সংযুক্ত থাকে। আয়তনগত দিক থেকে এ জালের দৈর্ঘ্য ৪.৬ থেকে ৫.৫ মিটার, প্রস্থ ৩.৬ থেকে ৪.৬ মিটার এবং জালের ফাঁসের আকার ০.৬ থেকে ১.২৫ সেমি হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলে মশারির নেট দিয়ে এ জাল তৈরি করা হয়।

জাল পরিচালনা পদ্ধতিঃ চিংড়ি ও অন্যান্য ছোট মাছ ধরার সময় জালের খুঁটি হাতের সাহায্যে জালের অগ্রভাগ পানির নিচে পেতে রাখা হয় এবং কিছু সময় পর পর মাছের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে পানির উপরিভাগে তোলা হয় এবং মাছ আহরণ করা হয়। প্রকৃতিগতভাবে এ ধরনের জাল ছাঁকি জালের (Dip net) অন্তর্ভুক্ত।

ঘ. খুচইন জাল

ব্যবহারিক উপযোগিতা ও স্থানঃ বরিশাল, পটুয়াখালী ও অন্যান্য উপকূলবর্তী অঞ্চলে এ ধরনের জাল দিয়ে অগভীর জলাশয়ের মাছ ও চিংড়ি এবং চিংড়ি পোনা ধরা হয়।

চিত্রঃ খুচইন জাল

জালের ধরন ও প্রকৃতিঃ আকৃতিগত দিক থেকে এ ধরনের জাল ইংরেজি অক্ষর v এর অনুরূপ। সাধারণত তিনটি বাঁশের খুঁটি সংযুক্ত করে এ জালের অবকাঠামো বা ফ্রেম তৈরি করা হয় এবং অবকাঠামোর সাথে ঘন ফাঁসের মশারি নেট বা নাইলনের সুতা দিয়ে জাল তৈরি করা হয়। আকৃতিগত দিক থেকে জালের মুখ ফ্রেমের আয়তন অনুসারে ত্রিকোণাকার হয়ে থাকে। জালের দৈর্ঘ্য সাধারণত ১.০ থেকে ১.৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

জাল ব্যবহার পদ্ধতি : এ জাল সাধারণত জলজ ভাসমান উদ্ভিদের তলদেশে স্থাপন করে হঠাৎ করে উপরের দিকে তুলে জালের মধ্য থেকে জলজ উদ্ভিদসমূহ সরিয়ে ফেলে মাছ আহরণ করা হয়। চিংড়ির পোনা আহরণের জন্য খুলনা অঞ্চলে জালের আকৃতি ডিম্বাকার বা চামুচাকৃতি হয়ে থাকে।

ঙ. আটলা জাল

ব্যবহারিক উপযোগিতা ও স্থানঃ উপকূলবর্তী অঞ্চলে বিশেষ করে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ ধরনের জালের প্রচলন অধিক দেখা যায়। সাধারণত এ জালের সাহায্যে ছোট আকৃতির মাছ ও চিংড়ি ধরা হয়।

জালের ধরন ও প্রকৃতিঃ আকৃতিগত দিক থেকে এ ধরনের জাল আয়তকার। জাল দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথাক্রমে ৪.৬ মিটার ও ৩.০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ জালের ফাঁসের আকৃতি ০.৬০ সেমি এর মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

চ. চরপাতা জাল

ব্যবহারিক উপযোগিতা ও স্থানঃ খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে এ জালের প্রচলন বেশি। দেখা যায়। সাধারণত জোয়ার-ভাটা বাহিত অগভীর নদীসমূহে পানির গতিপথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এ জালের সাহায্যে মাছ ধরা হয়।

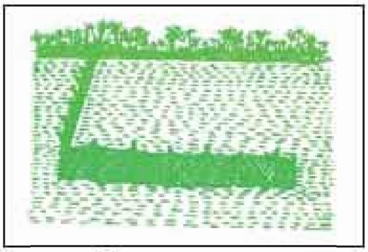

চিত্রঃ চরপাতা জাল

জালের ধরন ও প্রকৃতিঃ এ ধরনের জাল দৈর্ঘ্যে ৬.০ থেকে ১২.০ মিটার এবং প্রস্থে ৩.০ থেকে ৩.৬ মিটার হয়ে থাকে। জালের ফাঁসের আকার ১.২৫ থেকে ২.৫৪ সেমি হয়ে থাকে। জালের উপরিভাগে ও পার্শ্বদেশে শক্ত দড়ি লাগানো থাকে, যাতে পানির অধিক গতিবেগের কারণে জাল ছিড়ে না যায়। ভাটার সময় এ জালের নিম্নপ্রান্ত জলাশয়ের তলদেশে খুঁটির সাহায্যে স্থাপন করা হয় এবং উপরের অংশ প্রান্তভূমির উপর ফেলে রাখা হয়। জোয়ারের সময় জালের উপরের প্রান্ত তুলে খুঁটির উপরের প্রান্তের সাথে বাঁধা হয়। পানি কমিয়ে হাতের সাহায্যে জালের মধ্য থেকে মাছ/চিংড়ি সংগ্রহ করা হয়।

চিংড়ির আহরণ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

চিংড়ি অত্যন্ত পচনশীল পদার্থ। সাধারণত চিংড়ি ধরার ৩ থেকে ৫ ঘণ্টার মধ্যেই চিংড়ির পচনক্রিয়া শুরু হয়। সেজন্য আহরণকৃত চিংড়ি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাজারজাত করা উচিত। তবে চিংড়ি ধরার পরে বাজারজাতকরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চিংড়ির গুণগতমান বজায় রাখার জন্য নিচে উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ। করা যেতে পারে

১. আহরণকৃত চিংড়ির সাময়িক সংরক্ষণ স্থানের ঘরের মেঝে অবশ্যই পাকা হওয়া উচিত।

২. সংরক্ষণ স্থানে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হয়।

৩. চিংড়ি বাজারজাত করতে বা বিক্রয় স্থানে পৌঁছাতে ২ থেকে ৩ ঘণ্টা দেরি হলে পূর্ব থেকেই বরফের ব্যবস্থা করে রাখতে হয়।

৪. চিংড়ি পরিবহনের জন্য ঝুঁড়ি, পাতা, দড়ি ও চটের ব্যবস্থা করতে হয়।

৫. ধৃত চিংড়ি পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হয়।

৬. ছোট বড় অনুযায়ী চিংড়ি গ্রেড আলাদা করতে হয়।

৭. চিংড়ির মাথায় মূলত ব্যাকটেরিয়া অবস্থান করে। কোনো কারণে চিংড়ি দুর্বল হয়ে পড়লে বা মারা গেলে . ব্যাকটেরিয়াজনিত পচনক্রিয়া শুরু হয় এবং ধৃত চিংড়ির পচন ধরে। এ কারণেই যথাশীঘ্র চিংড়ির মাথা আলাদা করতে হয়।

৮. পরিষ্কার ঠান্ডা (৬ থেকে ৮ সে) পানিতে ৫ থেকে ১০ মিনিট চিংড়ি ভিজিয়ে রাখলে চিংড়ির গুণগত মান। ভালো থাকে। এ প্রক্রিয়াকে চিলিং বলা হয়।

৯. চিলিং করার পর পরিবহন করার পূর্বে পরিবহন পাত্র ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হয়।

১০. চিংড়ি বরফজাত করার পূর্বে পাত্রের তলায় ও পাশে নরম জাতীয় কলার পাতা কিংবা ভেজা চট বিছিয়ে। দিতে হয়, যাতে করে চিংড়ির গায়ে চাপ না লাগতে পারে।

১১. পাত্রে চিংড়ি ভরার সময় পাত্রের তলায় প্রথমে বরফ এবং পরে চিংড়ি পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজাতে হবে। এ। ক্ষেত্রে চিংড়ি ও বরফের অনুপাত ২৪১ হওয়া উচিত।

১২. পাত্রের মুখ ভেজা চট দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে দিতে হয়।

১৩. অতঃপর স্থানীয় বাজারে বা চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অল্প সময়ের মধ্যে পাঠাতে হবে।

চিংড়ির দীর্ঘকালীন সংরক্ষণ পদ্ধতি

সাধারণ অর্থে দীর্ঘকালীন সময়ের জন্য চিংড়ি সংরক্ষণকে প্রক্রিয়াজাতকরণ বলা হয়। এ পদ্ধতিতে গুণগত ও অবস্থানগত গঠনের কোনো পরিবর্তন হয় না। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াজাত করা গুণগত মানসমৃদ্ধ চিংড়ি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়। চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা করা হলো

ক. তাজা বা অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ (Preservation at fresh condition)

খ. সিদ্ধ করা (Cooking)

গ. কৌটাজাতকরণ (Canning)

ক. তাজা বা অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ

চিংড়ির মৃত্যুর পর প্রধানত দুটি কারণে চিংড়ি নষ্ট হয়ে থাকে, যেমন- (১) রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণে নষ্ট হওয়া ও (২) ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণুর আক্রমণে নষ্ট হওয়া। রাসায়নিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিংড়ির মৃত্যুর পর দেহের কোষ থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড নিঃসৃত হয়। ফলে চিংড়ির খাদ্যগুণ ও স্বাদ বিনষ্ট হয় এবং ওজন হ্রাস পায়। অপরদিকে ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণুর আক্রমণে চিংড়ির মাংসল অংশে এনজাইমের জলায়ন (hydrolysis) ক্রিয়ার সাহায্যে নানা ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিড নিঃসৃত হয়, যা বজারণ পদ্ধতিতে (Auto oxidation) কার্বনিল যৌগ উৎপন্ন করে, ফলে মাংসল অংশের পচনক্রিয়া শুরু হয় ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। এ কারণেই চিংড়ি ধরার ৫ থেকে ৬ ঘণ্টার মধ্যে চিংড়ির প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা উচিত।

বরফের সাহায্যে দীর্ঘমেয়াদিভাবে চিংড়ি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে চিংড়ি ও বরফের অনুপাত ১ঃ১ (ওজনে) হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজে ব্রফ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বরফের টুকরো অত্যন্ত ছোট বা পাতলা আবরণের মত হওয়া উচিত। অনেক সময় ব্যাকটেরিয়াযুক্ত অপরিশোধিত পানি দিয়ে তৈরি বরফ ব্যবহারে বা ব্যাকটেরিয়াযুক্ত পাত্র ব্যবহারে চিংড়ির মান নষ্ট হতে পারে। এক্ষেত্রে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণে ক্লোরিন মিশ্রিত

২০২২

পরিশোধিত পানির সাহায্যে তৈরি বরফ ব্যবহার করা উচিত এবং চিংড়ি সংরক্ষণ ও পরিবহনে ব্যবহৃত সকল প্রকার প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ ক্লোরিন মিশ্রিত পানি (৫ থেকে ১০ পিপিএম) দিয়ে ধায়ো উচিত। এ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত চিংড়ির ব্যাকটেরিয়াদ্বারা আক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকে। চিংড়ি দীর্ঘকালীন সময়ের জন্য সংরক্ষণে সমুদ্রের পরিষ্কার লোনা পানি ০° থেকে ১° সে তাপমাত্রায় ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া যায়। অনেক সময় গ্লুকোজ সিরাপ বা কর্ন সিরাপ প্রয়োগ করে তাপমাত্রা আরও কমানো হয়। এ ধরনের সংরক্ষণ পদ্ধতিতে চিংড়ির আকার অপরিবর্তিত থাকে এবং খরচও অপেক্ষাকৃত কম হয়।

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জেট ফ্রিজিং পদ্ধতিতে চিংড়ি সংরক্ষণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে ক্রায়াজেনিক নাইট্রোজেন (Cryogenic nitrogen) মাইনাস ৩২ক্ক ফারেনহাইট তাপমাত্রায় মাল্টিজুম (Multi-zoomed) ফ্রিজারের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে সাত হাজার ফুট হারে সঞ্চালিত করা হয়। ফলে ঠান্ডা জমানো হাওয়া এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে চিংড়ি কোষের মধ্যে সঞ্চালিত হয় এবং অতি দ্রুত চিংড়ি সংরক্ষিত হয়।

খ. সিদ্ধ করা

এ পদ্ধতিতে প্রতি পাউন্ডে ১০০ টির অধিক সংখ্যক চিংড়ি লবণ জলে সিদ্ধ করা হয় এবং পরে ফ্রিজে সংরক্ষণ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় এক সাথে বেশ কিছু পরিমাণ চিংড়ি বড় তারের ঝুড়িতে রেখে সেগুলো ফুটন্ত ব্রাইন বা লোনা জলে ১ থেকে ২ মিনিট সিদ্ধ করা হয় এবং পরে তারের পাত্রটি তুলে কোন বড় তারের জালের উপর ভালভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে অতি দ্রুত সেগুলো ঠান্ডা হয়। এ প্রক্রিয়াকে বাঞ্চিং (Blanching) বলা হয়। বঞ্চিং চিংড়িগুলো অল্প সময়ের জন্য ২০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ঠান্ডা জলে ডুবানো হয়। এ প্রক্রিয়াকে গেজিং (Glazing) বলা হয়।

গ. কৌটাজাতকরণ

মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে কৌটাজাতকরণ একটি প্রচলিত প্রথা। এ প্রক্রিয়ায় ঠান্ডা করা চিংড়ি ব্রাইন বা লবণ জল সহযোগে বায়ু নিরোধক পাত্র বা ক্যান-এ আবদ্ধ করে রপ্তানি করা হয়। ক্যান বা আবদ্ধ পাত্রে চিংড়ির গুণগতমান অবিকৃত রাখার উদ্দেশ্যে লবণ জলে সাইট্রিক অ্যাসিড (০.২%) মিশানো হয়। এ সময়ে দ্রবণের পিএইচ (pH) এর মান ৬.৪ থেকে ৬.৬ হয়ে থাকে। ক্যানগুলো পরবর্তী ধাপে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ০.৭ কিলোগ্রাম ব্যাসযাগে ও ১১৫.৩৭ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ১৮-২০ মিনিট প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। কৌটাজাতকরণের ক্ষেত্রে লাহো বা তামার তৈরি ক্যান পরিহার করা উচিত। আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কৌটাজাতকরণ প্রক্রিয়ায় বা লবণ জলে প্রতি কিলোগ্রাম চিংড়ির জন্য ২৫০ মিলিগ্রাম ডাইসাডিয়াম যৌগ ব্যবহার করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়াজাতকৃত চিংড়ি বা মাছ বিভিন্ন অবস্থায় রপ্তানি করা হয়, যেমন - মস্তকবিহীন, সম্পূর্ণ খোসা ছড়ানো, লেজ ছাড়া বাকি অংশের খোলস ছড়ানো, প্রভৃতি। মস্তকবিহীন চিংড়ি গ্রেড অনুসারে প্যাকিং করা হয়।

গ্রেডঃ গ্রেড হলো প্রতি পাউন্ড চিংড়িতে কত সংখ্যক চিংড়ি বিদ্যমান। যেমন: গ্রেড ইউ-৫ এর অর্থ হলো প্রতি পাউন্ডে ৫ টি বা তার কম সংখ্যক চিংড়ি বিদ্যমান। রপ্তানিতে চিংড়ির প্রচলিত গ্রেডগুলো হলো- ইউ-১০, ইউ-১১ থেকে ১৫, ইউ-১৬ থেকে ২০, ইউ-২১ থেকে ২৫, ইত্যাদি।

২০২২

চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি

সাধারণ অর্থে প্রক্রিয়াজাতকরণ বলতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিংড়িকে দীর্ঘসময় গুণগতমান সম্পন্ন অবদায় সংব্রক্ষণ প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়। চিংড়ির সুষ্ঠু বিপণনের ক্ষেত্রে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে চিংড়ি নষ্ট বা পচে যাওয়ার উৎপাদকসমূহ বিশেষ করে অ্যামাইনো অ্যাসিডের ক্রিয়া, ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য ক্ষতিকর জীবাণুর আক্রমণ রাধে করা হয় এবং চিংড়ি সম্পদকে অবিকৃত অবস্থায় বিপণনের জন্য দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। ব্যবসায়িকভাবে প্রক্রিয়াজাতকৃত চিংড়ি বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয় এবং দূরত্ব নির্বিশেষে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য বাজারজাত করা হয়ে থাকে।

চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের ধাপ

চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রধানত ৪টি ধাপ অনুসরণ করা হয়। উদ্দেশ্যগত দিক থেকে এই চারটি ধাপ অনুসরণের মাধ্যমে চিংড়ি জীবাণুমুক্ত করে সংরক্ষণ করা হয়। চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের ধাপসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো

- ক) আহরণাত্তের চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী করা।
- খ) জীবাণুমুক্ত করা ও পচন রাধে করা।
- গ) বাক্সে প্যাক করা।
- ঘ) হিমাগারে সংরক্ষণ করা।

ক. আহরণাত্তের চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগীকরণ

চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রথম ধাপ হলো তাজা বা টাটকা চিংড়ি সংগ্রহ করে মাথা ছাড়ানো। সাধারণত প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় চিংড়ি নিয়ে আসার পূর্বেই ফড়িয়া বা বেপারি বা আড়তদারগণ চিংড়ির মাথা ছাড়িয়ে ফেলে। সরাসরি খামার বা বাজার থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় আসত চিংড়ি আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াজাত কারখানায়ও চিংড়ির মাথা ছাড়ানো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে চিংড়ি পরিবহন ও সাময়িক সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বরফ সমৃদ্ধ গাড়ি বা পরিবহন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

মাথা ছাড়ানোর উদ্দেশ্য হলো চিংড়ির মৃত্যুর পর মাথা সর্বপ্রথম ব্যাকটেরিয়াদ্বারা আক্রান্ত হয়, কেননা চিংড়ির মাথা ও তার কলাসমূহ মাংসপেশীর চেয়ে অধিক নরম। ফলে মাথা দ্রুত ব্যাকটেরিয়া দিয়ে আক্রান্ত হয়। এছাড়াও চিংড়ি দেহের গঠনগত কারণে পরিবেশ থেকেই মাথার খোলসের মধ্যে কোনো না কোনো ধরনের ব্যাকটেরিয়া বিদ্যমান থাকে। সেগুলো চিংড়ির মৃত্যুর পর পরই অধিক সক্রিয় হয়ে উঠে এবং চিংড়ির পচনক্রিয়া শুরু হয়।

খ. জীবাণুমুক্ত করা ও পচন রোধ করা

বরফে সংরক্ষণ করা: মাথা ছাড়ানোর পর চিংড়ি লেজসহ বাঁশ, কাঠ বা পাস্টিকের তৈরি কঁকা বা বাক্সের মধ্যে বরফ দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। উদ্দেশ্যগত দিক থেকে এ প্রক্রিয়ায় চিংড়ি ব্যাকটেরিয়া মুক্ত থাকে এবং পচনক্রিয়া সংগঠিত হতে পারে না। বরফ দিয়ে চিংড়ি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে চিংড়ি ও বরফের অনুপাত ১ঃ১ রাখা হয়। সাধারণত বাজার থেকে বা নির্দিষ্ট এলাকা থেকে চিংড়ি সংগ্রহকারীরা এভাবে চিংড়ি সাময়িক সংরক্ষণ করে ২-৩ দিন পর পর প্রক্রিয়াজাত কারখানায় সরবরাহ করে থাকে। ২০২২

মাথা ছাড়ানো চিংড়ি পরিষ্কার পানিতে ধৌত করা : চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত কারখানায় পৌঁছানোর পর মাথা ছাড়ানো বরফ সমৃদ্ধ চিংড়িকে ছিদ্রযুক্ত টেবিলের উপর রাখা হয় এবং পরিষ্কার পানি দিয়ে ধায়ো হয়। চিংড়ি ধোয়ার কাজে প্রধানত গভীর নলকূপের পানি ব্যবহার করা হয়। উল্লেখ্য চিংড়ির পরিষ্কার বা ধোয়ার কাজটি যাতে দ্রুত শেষ করা সম্ভব হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

চিংড়ি বাছাই ও ওজন করা: পরিষ্কার পানিতে চিংড়ি ধোয়ার পর গ্রেড অন্যায়ী চিংড়ি বাছাই ও ওজন করা হয়। চিংড়ি বাছাই-এর ক্ষেত্রে চিংড়ির গুণগতমান যথার্থ রয়েছে কী না তা পরীক্ষা করে নেয়া হয়। চিংড়ির গ্রেড নির্ধারণের পদ্ধতি নিচে উল্লেখ করা হলো

গ্রেড	মাথাবিহীন অবস্থায় প্রতি পাউন্ডে চিংড়ির সংখ্যা
ক	১ থেকে ২০
খ	২১ থেকে ৩০
গ	৩১ থেকে ৫০
ঘ	৫১ থেকে ৭০

উল্লেখ্য চিংড়ির গুণগতমান যথার্থ থাকা সত্ত্বেও যদি চিংড়ির খোলস ভেঙে যায় বা খোলসের রঙের পরিবর্তন হয়, তাহলে বাছাই করার সময় এ ধরনের চিংড়ি বাদ দেয়া হয়, যা পিএন্ডডি নামে অভিহিত।

ঠান্ডা ঘরে সংরক্ষণ: চিংড়ির প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় চিংড়ির গুণগতমান অক্ষুন্ন রাখার জন্য বাছাইকৃত চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের পরবর্তী ধাপে যাওয়ার পূর্বে ০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত ঘরে রাখা হয়। প্রক্রিয়াজাত কারখানায় এ ধরনের সাময়িক সংব্রক্ষণ ঘরকে চিল কক্ষ বলা হয়। চিংড়ি আহরণের উৎসের উপর ভিত্তি করে এ ধরনের কক্ষে ৩টি প্রকোষ্ঠ থাকে

ক) সুস্বাদু পানির চিংড়ি সংরক্ষণ কক্ষ (গলদা চিংড়ি)।
খ) লোনা পানির চিংড়ির সংরক্ষণ কক্ষ (মূলত বাগদা চিংড়ি)।
গ) লোনা পানির অন্যান্য চিংড়ির সংরক্ষণ কক্ষ।

উল্লেখ্য, গলদা চিংড়ি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে স্বাদু বা মিঠা পানির বরফ এবং লোনা পানির চিংড়ি সংরক্ষণের জন্য লবণাক্ত পানির বরফ ব্যবহার করা হয়। কখনও চিংড়ি বাছাই ও ওজন নেওয়া দ্রুত সম্ভব না হলে এ ধরনের কক্ষে সংগৃহীত চিংড়ির সংরক্ষণ করা হয়।

ক্লোরিন মিশ্রিত পানিতে ধোয়া: চিল রুমে সাময়িক সংব্রক্ষিত চিংড়ি পরবর্তীতে ক্লোরিন মিশ্রিত পানিতে (৫ থেকে ১০ পিপিএম) পোয়া হয়। বর্তমানে অধিকাংশ চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় চিংড়ি সংরক্ষণের জন্য সেন্ডো কীপ (Sendo Keep) পাউডার মিশ্রিত ব্যবহার করা হয়। ক্লোরিন মিশ্রিত পানির মাধ্যমে চিংড়িকে বিশুদ্ধ বা জীবাণুমুক্ত করা হয়ে থাকে।

২০২২

বাছাইকৃত চিংড়ি পুনঃপরীক্ষা: চিংড়িকে ক্লোরিন মিশ্রিত পানিতে জীবাণুমুক্ত করার পর পুনরায় চিংড়িকে গ্রেড অনুসারে ওজন ও বাছাই করা হয়। এ সময় চিংড়ির উদরাংশের পাতলা পর্দা ও শেষ ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয় এবং নির্দিষ্ট ওজন অনুসারে স্ত্রী ও পুরুষ আলাদাভাবে বরফ পানিতে ধোয়ার জন্য ছিদ্রযুক্ত টেবিলে রাখা হয়। বরফ পানিতে উত্তমরূপে ধোয়ার পর ড্রেসিং টেবিলে সাজানো হয়।

চিংড়ি ড্রেসিং ও হিমায়িতকরণ পদ্ধতি: চিংড়ি ড্রেসিং করার ক্ষেত্রে ৩০ সেমি × ২০ সেমি মাপের টিনের ট্রেতে ৭০ সেমি × ৭৫ সেমি মাপের পলিথিন পেপার বিছানো হয়। অতঃপর ব্লক বাক্সে চিংড়িগুলো লম্বালম্বিভাবে দু'টি সারিতে এমনভাবে সাজানো হয়, যাতে দুটি সারির চিংড়ির লেজগুলো পরস্পর মুখোমুখি থাকে। পরবর্তী ধাপে ট্রে সমেত চিংড়িগুলো ৫ প্রকোষ্ঠ বা ৩ প্রকোষ্ঠ ট্রেতে রাখা হয় এবং পুনরায় বরফ মিশ্রিত পানি চিংড়ির উপর দেয়া হয়। ট্রেগুলো বরফের পানি দিয়ে পূর্ণ হলে পলিথিন পেপার ভাঁজ করে চিংড়ির প্যাকিং বক তৈরি করা হয় এবং প্লেট বা এয়ারব্লাস্ট ফ্রিজারের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী সংরক্ষণ করা হয়। ফ্রিজারে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৫ প্রকোষ্ঠ লম্বা ট্রে ব্যবহার করা হয়। এয়ারব্লাস্ট ফ্রিজারে সাধারণত লম্বা ট্রে-এর পরিবর্তে ছোট ট্রে ব্যবহার করা হয়। ফ্রিজারের চিংড়ি হিমায়িতকরণের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা মাইনাস ৩৭° থেকে মাইনাস ৪০° সেন্টিগ্রেড–এ রাখা হয়। এভাবে হিমায়িতকরণ প্রক্রিয়া ১২ থেকে ১৩ ঘন্টা চলমান থাকে।

গ. বাক্সে প্যাক করা

প্রক্রিয়াজাতকৃত চিংড়ি হিমায়িত করার পর বর্গাকৃতির চিংড়ির বকগুলো দ্রুত পলিথিন ব্যাগে ভরে সিল করা হয় এবং পরবর্তী ধাপে পলিথিন ব্যাগগুলো মাস্টার কার্টুনে ঢাকোনো হয়। মাস্টার কার্টুনে ২০ থেকে ৫০ কেজির অধিক চিংড়ির বক করা হয় না এবং কার্টুনগুলো সিনথেটিক গজ দিয়ে প্যাক করা হয়। পরবর্তী ধাপে কার্টুনের উপর চিংড়ির নাম, ওজন, গ্রেড প্রভৃতি উল্লেখ করা হয়।

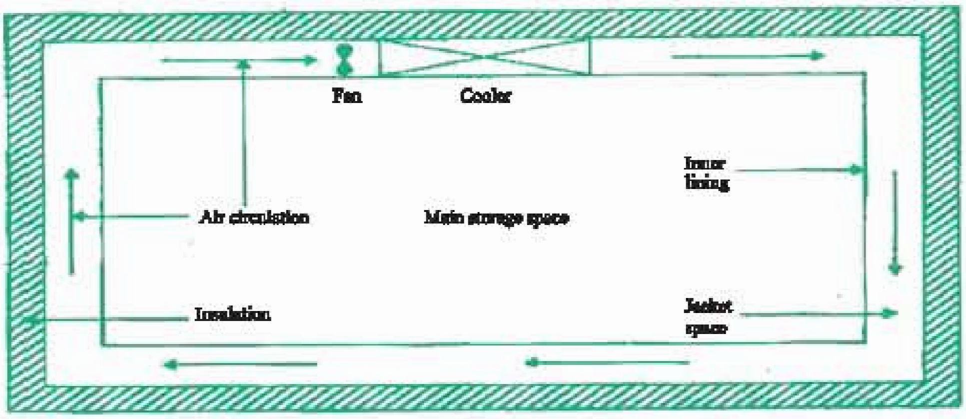

চিত্র: একটি জ্যাকেট হিমাগার

ঘ. হিমাগারে সংরক্ষণ করা

পরবর্তী ধাপে মাস্টার কার্টুনগুলো মাইনাস ২০° সেন্টিগ্রেডের নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়। হিমাগারে এ অবস্থায় চিংড়ি বহুদিন সংরক্ষণ করা হয়।

বাগদা চিংড়ি প্যাকিং ও পরিবহন

আদিকাল থেকেই মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য পরিবহন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্যাকিং ব্যবস্থা চালু রয়েছে। কাঠের বাক্স, চামড়া ও কাপড়ের ব্যাগ, মাটির পাত্র ও ঝাঁকি তৈরির জন্য রশি ব্যবহার করা হয়। প্যাকিং করার উদ্দেশ্য হলো যথাযথ সংরক্ষণ, সুষ্ঠু পরিবহন ও হ্যান্ডলিং-কে সহজতর করা ও সর্বোপরি পণ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। প্রথম দিকে মৎস্য পণ্য বহন করার পাত্র ছিলো কাঠের ঝুঁড়ি, বাঁশের ঝুড়ি ও কাঠে খোদানো পাত্র। বর্তমানে ধাতুর তৈরি পাত্রের সাথে সাথে কাচ, কাগজ ও প্লাস্টিকদ্বারা তৈরি পাত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্যাকিং প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ—

ক) প্যাকিং প্রযুক্তি এমন হবে যাতে ফ্যাট অক্সিডেশন বন্ধ হয়।

খ) হিমায়িত মৎস্য পণ্য জলশূন্য করা বন্ধ করবে যাতে ফ্রোজেন অবস্থায় গঠন ঠিক থাকে।

গ) ব্যাকটেরিয়াল এবং রাসায়নিক পচন বন্ধ করবে।

ঘ) চিংড়ি থেকে গন্ধ বের হওয়া বন্ধ করবে।

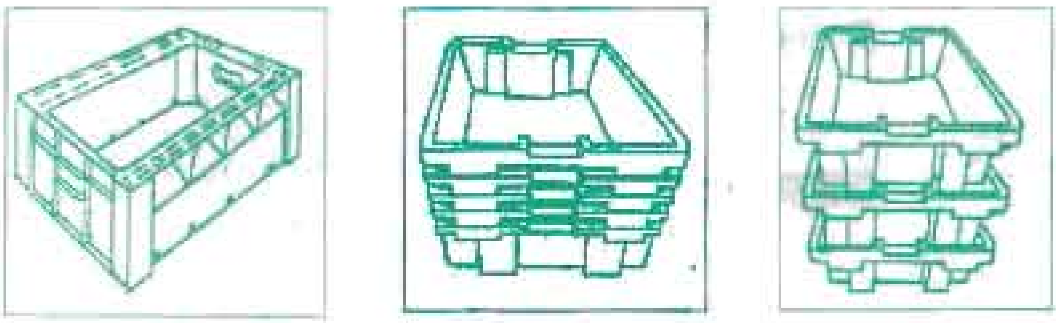

ক খ গ

চিত্র: বিভিন্ন ডিজাইনের প্লাস্টিক বাক্স

তাজা চিংড়ি প্যাকিং

তাজা চিংড়ি সাধারণত কাঠের বাক্স, প্লাস্টিক বাক্স বা খাপযুক্ত বাক্সে প্যাকিং করা হয়। গ্রীষ্ম-শীত অঞ্চলে তাজা চিংড়ি প্যাকিং-এর ক্ষেত্রে কাঠের বাক্স ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে যুক্তরাজ্যে কাঠের বাক্সের পরিবর্তে প্লাস্টিক বাক্স ব্যবহৃত হচ্ছে, কারণ প্লাস্টিক বাক্স হালকা, শক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত। চিংড়ি বাক্সের জন্য নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত।

ক) বাক্সের বৈশিষ্ট্য এমন হবে যাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ চিংড়ি রাখা যায়।

খ) যখন চিংড়িতে পূর্ণ থাকবে তখন যাতে খুব সহজেই পরিবহন করা যায় এবং ব্যবহারের পর সহজেই পরিষ্কার করা যায়।

গ) বাক্স এমনভাবে তৈরি হবে যাতে চিংড়ি নিরাপদে পাশাপাশি করে রাখা যায়।

ঘ) চিংড়ি খোয়া যাওয়া, পচন, পরিবেশ দূষণ ও ছোটখাটো চুরি থেকে রক্ষা পাবে।

ঙ) বাক্সের আকৃতি এমন হবে যাতে বাক্সের ভিতরের চিংড়ির পরিমাপ সহজেই নির্ণয় করা যায় এবং বিক্রয় । কেন্দ্রে সহজেই প্রদর্শন করা যায় ।

চ) যদি বরফ ব্যবহৃত হয় তবে গলিত বরফ বের হওয়ার সুযোগ থাকতে হবে ।

ছ) বাক্স তৈরির উপকরণ সহজপ্রাপ্য ও কম দামি হতে হবে ।

পাইকারি বিক্রির ক্ষেত্রে প্যাকিং

এক্ষেত্রে তাজা মাছ ও ফ্রোজেন চিংড়ি প্যাকিং করা হয় । সাধারণত রেসিন করা কাগজের মণ্ডের বাক্স ব্যবহৃত হয় তবে ফাইবার বোর্ড বাক্স ও করুগেটেড বোর্ড কার্টুন বেশি ব্যবহৃত হয়, কারণ এগুলোর উপর পলিথিনে আবৃত থাকে । কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিক পূর্ণতার জন্য পলিস্টাইরিন লাইনিং ব্যবহৃত হয় ।

চিত্র: চিংড়ির উন্নতমানের প্যাকিং পদ্ধতি

ব্লক ফ্রোজেন প্যাকিং: এই পদ্ধতিতে চিংড়ি (খোলস ছাড়ানো) ফাইবার বোর্ড কার্টুন দিয়ে প্যাকেট করা হয় । সমস্ত প্যাকেটটি প্লেট ফ্রোজেন । প্যাকেট শক্ত হওয়াতে পণ্যকে রক্ষা করে এবং শক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে বক ফ্রোজেন প্যাক খুব সহজেই স্টোর ও পরিবহন করা যায় । এ পদ্ধতির অসুবিধা হলো প্যাকেটের একটা চিংড়ি বের করতে হলে সমস্ত বরফ গলাতে হয় ।

আইকিউএফ (Individual Quick Freezing): প্যাকেট করা বস্তুর বৈশিষ্ট্য হলো ফ্রোজেন, গেজড ও পলিথিনদ্বারা আবৃত বাক্সে ভর্তি । এই পদ্ধতিটি খুব উপযোগী কারণ খুব সহজেই খুচরা বিক্রির জন্য নতুনভাবে প্যাকেট করা যায় । সরবরাহকারীদের নিকটও খুব উপযোগী কারণ প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ করা যায় । আইকিউএফ পদ্ধতিতে খোলস ছাড়ানো চিংড়ি ও মাছ প্যাকেট করা হয় ।

লেয়ারড প্যাক: পলিকোটেড ফাইবার বোর্ড বাক্সদ্বারা প্যাক করা হয় । ফিলেটগুলো পলিথিন লেয়ারদ্বারা পৃথক করা এবং প্রয়োজন অনুসারে ফিলেটগুলো আলাদা করা যায় । লেয়ারড প্যাক, আইকিউএফ প্যাক এর চেয়ে গাদাগাদি করে রাখা, গুদামজাত করা ও পরিবহন করা সহজ ।

স্যাটার প্যাকিং: সাধারণত হাটেল ও রেস্তারোয় মৎস্যজাত পণ্যের এই প্যাকেটগুলো ব্যবহৃত হয়, কারণ সমস্ত প্যাক থেকে ডিফ্রোস্টেটিং ছাড়া ফিলেটগুলো আলাদা করা যায় ।

সচরাচরভাবে ব্যবহৃত প্যাকিং পাত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো-

পাত্র	শক্তি	শুরুতে ব্যয়	ওজন	স্থায়িত্বশীলতা	পুনরায় ব্যবহার	স্থাস্থ্য সম্মত
বেতের পাত্র	শক্ত	সস্তা	খুব বেশি	ভালো	হ্যাঁ	কম
ঝুঁড়ি	মোটামুটি শক্ত	সস্তা	হালকা/ মধ্যম	সুন্দর	না	কম
কার্টুন	দুর্বল	সস্তা	হালকা	কম	না	ভালো
ধাতুর তৈরি প্যান	শক্ত	ব্যয়বহুল	মধ্যম	ভালো	হ্যাঁ	ভালো
প্লাস্টিকের তৈরি প্যান	মোটামুটি	মোটামুটি	মধ্যম	ভালো	না	ভালো
গ্লাস বাক্স	শক্ত	ব্যয়বহুল	খুব ভালো	ভালো	হ্যাঁ	ভালো
পাটের ব্যাগ	মোটামুটি	মোটামুটি	হালকা	ভালো	হ্যাঁ	কম
কাগজ	দুর্বল	খুবই সস্তা	খুব হালকা	কম	না	কম
পাতা	দুর্বল	খুবই সস্তা	খুব হালকা	কম	না	কম

চিংড়ি পরিবহন

বাগদা চিংড়ি পরিবহনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে

ক) পরিবহনের সময় ও দূরত্ব অনুসারে প্রয়োজনীয় বরফ ব্যবহার করতে হবে, যাতে গন্তব্য স্থানে পৌছার , পরও চিংড়ির গায়ে বরফ থাকে ।

খ) হাগেলার চাটাই, ছালার চটে মুড়িয়ে বশ নির্মিত ঝুড়িতে ও বরফবিহীন অবস্থায় চিংড়ি পরিবহন পরিহার করা ।

গ) ইনসুলেটেড/তাপ নিরোধক পাত্র বা পাস্টিকের ঝুড়িতে বরফ মিশ্রিত করে চিংড়ি পরিবহনের ব্যবস্থা করা ।

ঘ) পরিবহনকালে পাত্র বা বাক্সে চিংড়ি রাখার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে উপরের চিংড়ির চাপে বা বাক্সের ডালা লাগাবার সময় অধিক চাপ না পড়ে । অধিক চাপে নিচের চিংড়ি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কেননা চিংড়ির মাংসপেশী অন্যান্য উচ্চতর প্রাণীর চাইতে নরম ।

ঙ) ডিপো থেকে পরিবহনের ভাড়া সাশ্রয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব না দিয়ে ট্রাকে বরফ সহকারে চাটাই বা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে যতদ্রুত সম্ভব চিংড়ি কারখানায় স্থানান্তর করা ।

চ) অপর্যাপ্ত ও নিম্নমানের বরফ ব্যবহার করে খালো ট্রাকে তূপাকারে অধিক পরিমাণ চিংড়ি পরিবহন না করা । পরিবহনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে ।

ছ) চিংড়ি বোঝাই ট্রাকে চাটাই বা ত্রিপলের উপর ট্রাকের সাহায্যকারীরা অবাধে চলাফেরা করার ফলে চিংড়ি থেতলে যায়, নরম হয়, সতেজতা হারায় এবং পচনকারী অণুজীবদ্বারা সহজেই সংক্রমিত হয় । চাটাই বা ত্রিপলের উপর দিয়ে ট্রাকের সাহায্যকারীরা অবাধে চলাফেরা করতে না পারে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা ।

চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়ার বর্তমান প্রেক্ষাপট

আমাদের দেশে চিংড়ি সম্পদ বিপণনের ক্ষেত্রে এখনও কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি বলেই প্রতীয়মান হয়। মূলত চিংড়ি উৎপাদনকারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা, সম্পদ সংরক্ষণ সুযোগ-সুবিধা ও মধ্য সুবিধাভোগীদের (ফড়িয়া, আড়তদার, বেপারী) ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। খুব কম পরিমাণ চিংড়িই চিংড়ি উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে সরাসরি ক্রেতার হাতে পৌছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মধ্য- একটা ধারাবাহিক পর্যায়ের মাধ্যমে তা বাজারে আসে। আমাদের দেশে চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক পর্যায় বা ধাপসমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো

ক. চিংড়ি উৎপাদনকারী ও আহরণকারী বা জেলে সম্প্রদায়

আমাদের দেশে চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়ায় সাধারণত দু'টি উৎস থেকে সরাসরি বাজারে চিংড়ি আসে, যেমন-খামারে উৎপাদিত চিংড়ি (পুকুর, স্বাদু পানির জলাশয় ও উপকূলবর্তী চিংড়ি খামার) এবং প্রাকৃতিক জলসম্পদ থেকে আহরিত চিংড়ি (নদী-নালা, খাল-বিল, সমুদ্র ও সমুদ্র উপকূলীয় জলাশয়)। চিংড়ি উৎপাদনকারী ও আহরণকারী বা জেলে সম্প্রদায় অনেক সময় সরাসরিভাবে চিংড়ি বিপণন করে থাকে।

খ. মধ্যস্বত্বভোগী (দালাল, ফড়িয়া, নিকারী)

আমাদের দেশে মৎস্যসম্পদ থেকে আহরিত ও অন্যান্য মাছ সরাসরি বাজারে বিক্রয় অর্থাৎ উৎপাদক কর্তৃক বাজার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নেই বললেই চলে। অধিকাংশ আহরিত চিংড়ি দালাল বা নিকারীদের মাধ্যমে ধনী ব্যবসায়ী বা আড়তদারের নিকট এসে পৌঁছে। কখনও কখনও দালালদের মাধ্যমে সরাসরি খুচরা বিক্রয়কারীর নিকট পৌছে থাকে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি আহরণের ক্ষেত্রে নিকারীরা মৎস্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে চিংড়ি আহরণকারীদের (জেলে) অগ্রিম ধার দিয়ে থাকেন। ফলে আহরণকারীগণ চুক্তিভিত্তিক ধার্যকৃত মূল্যে উৎপাদিত মাছ বিক্রয় করতে বাধ্য থাকেন। এক্ষেত্রে প্রকৃত চিংড়ি উৎপাদক আহরণকারীরা যেমন আহরিত চিংড়ির প্রকৃত মূল্য থেকে বঞ্চিত হন, তেমনি পরাক্ষেভাবে ক্রেতারাও অধিক মূল্যে চিংড়ি ক্রয় করে থাকেন। এক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীরাই উৎপাদিত চিংড়ি বিপণনের মাধ্যমে অধিক লাভবান হয়ে থাকে।

গ. চালানী

চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়ায় এরা হল প্রকৃত মৎস্য ব্যবসায়ী বা মহাজন। এরা নিকারী বা দালালদের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন এলাকা থেকে চিংড়ি সগ্রহ করে মহাজন বা শহরের বড় ব্যবসায়ীদের নিকট পৌছে দিয়ে থাকেন। দালাল বা নিকারীরা এদের কাছ থেকে মূলধন ও অন্যান্য সংরক্ষণ উপকরণ পেয়ে থাকেন।

ঘ. আড়তদার

চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়ায় চালানী, দালাল বা চিংড়ি উৎপাদনকারী ও আহরণকারীদের মাধ্যমে আহরিত চিংড়ি আড়তদারের কাছে পৌছে। আড়ত বলতে মূলত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত চিংড়ি সংব্রক্ষণ ও বিক্রয় কেন্দ্রকে বুঝানো হয়। এখান থেকেই মাছ বা চিংড়ি উন্মুক্ত ডাকের মাধ্যমে পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতার নিকট বিক্রয় করা হয়। বিক্রীত টাকার উপর আড়তদার নির্দিষ্ট হারে কমিশন পেয়ে থাকেন। কমিশনের পরিমাণ এলাকাভেদে ও আড়তের সুযোগ-সুবিধা অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে। মূলত আড়তদার পাইকারি বিক্রেতার নিকট চিংড়ি বিক্রয় করে থাকেন।

২০২২

ঙ. পাইকারি বিক্রেতা

পাইকারি বিক্রেতা দর কষাকষির মাধ্যমে খুচরা বিক্রেতার কাছে মাছ বিক্রয় করে। খুচরা বিক্রেতা ভাক্তো বা ক্রেতার কাছে মাছ বা চিংড়ি পৌছে দেন। এক্ষেত্রেও দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগীদের বিচরণ লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমানে চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়ায় রপ্তানি একটি প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা হিসেবে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মৎস্য ও মৎসজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশও ইতিমধ্যে বিশ্ব বাজারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু এ উন্মুক্ত বিশ্ববাজারে বাংলাদেশকে টিকে থাকতে হলে সংশিষ্ট সকলকে ক্রেতাদের চাহিদানুযায়ী চিংড়ির গুণগতমান উন্নতকরণের লক্ষ্যে চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়াকে অধিকতর কার্যক্ষম করতে হবে। এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপসমূহের মধ্যে বিরাজমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা প্রয়োজন এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে চিংড়ি বিপণন নীতিমালা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

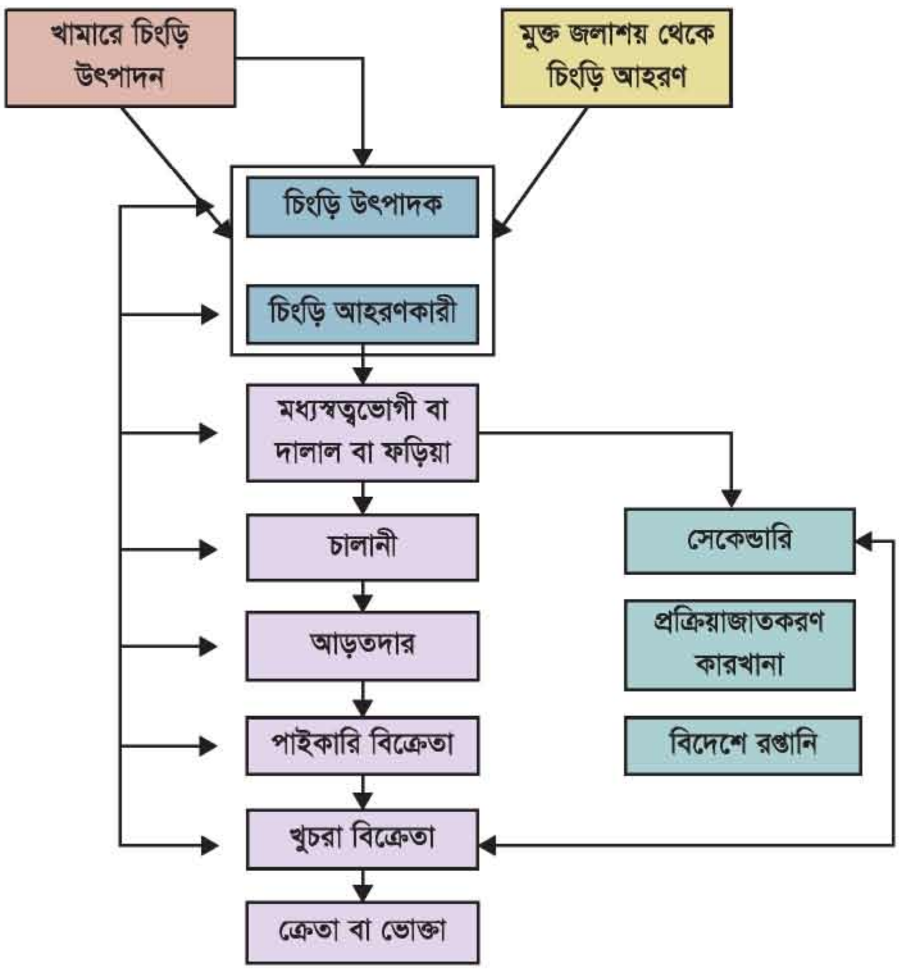

২০২২

চিত্র: চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়া

চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়ায় প্রধান প্রধান সমস্যা ও সমাধানের সম্ভাব্য উপায়

চিংড়ির বিপণন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে এখনও উপযুক্ত কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। চিংড়ি রপ্তানিযোগ্য পণ্য হওয়ায় মূলত চিংড়ি চাষ সমৃদ্ধ উপকূলবর্তী এলাকায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ প্যান্ট বা শিল্প গড়ে উঠেছে। বর্তমানে (২০০৩ পর্যন্ত) আমাদের দেশে হিমায়িত খাদ্য শিল্প খাতে ১৩৩টি কারখানা বিদ্যমান। যার মধ্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত ৬০টি এবং ইইউ অনুমোদনকৃত ৫৩ টি। ২০০৭-২০০৮ সালের প্রাপ্ত তথ্যানুসারে বাংলাদেশে ১৩৩টি চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা থেকে প্রায় ৭৫,০০০ মে. টন চিংড়ি এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়ায় প্রধান প্রধান সমস্যা ও তা থেকে উত্তোরণের সম্ভাব্য উপায়সমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো

ক. চিংড়ি উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্যা

আমাদের দেশে চিংড়ির বিপণন প্রক্রিয়া মূলত আহরণকৃত চিংড়ির উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে রপ্তানিকৃত চিংড়ির মধ্যে ৭০ ভাগই গলদা চিংড়ি। গলদা চিংড়ির উৎপাদন এখনও আমাদের দেশে প্রাকৃতিক উৎস নির্ভর। তাছাড়া উপকূলবর্তী অঞ্চলে গলদা চিংড়ি চাষের খামার বৃদ্ধি পেলেও হেক্টর প্রতি চিংড়ি উৎপাদন খুবই কম। ফলে চিংড়ির চাষের অভীষ্ট এলাকায় এখনও চিংড়ির দ্রুত সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর পর্যাপ্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা গড়ে উঠেনি। এছাড়াও বিক্ষিপ্তভাবে খামার স্থাপনের কারণেও চিংড়ি উৎপাদনকারীরা উপযুক্ত মূল্যে বাজারে বিক্রয় করতে পারে না এবং ধীরে ধীরে চিংড়ি চাষের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে যা ভবিষ্যতের চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের অন্তরায়স্বরূপ।

খ. পরিবহন সমস্যা

বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ব্যাপক আকারে ঘেরে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারিত হলেও গলদা চিংড়ি চাষের খামারের সংখ্যা খুবই নগণ্য এবং চিংড়ি উৎপাদন এলাকার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালো নয়। ফলে ক্রেতা বা ভাক্তোদের অবস্থান অনেকটা এলাকাভিত্তিক হিসেবেই গড়ে উঠেছে। অপরদিকে চিংড়ি দ্রুত পচনশীল পণ্য হওয়া সত্ত্বেও বিপণন প্রক্রিয়াকে সুসংগঠিত করার জন্য তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত কোনো পরিবহন ব্যবস্থাও গড়ে উঠেনি। বর্তমানে চিংড়ি পরিবহনের জন্য রেলপথ, সড়কপথ ও নৌ-পরিবহনে যে সকল ব্যবস্থা আছে তা ত্রুটিপূর্ণ বা সুষ্ঠুভাবে চিংড়ি বিপণন উপযোগী নয়।

গ. দীর্ঘ বিপণন প্রক্রিয়াগত সমস্যা

আমাদের দেশে মৎস্যসম্পদ বিপণনের ক্ষেত্রে ফড়িয়া, বেপারী, দালাল ও আড়তদারগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। এদের মাধ্যমেই তা পুনরায় পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাদের মাধ্যমে ক্রেতা বা ভাক্তোদের হাতে পৌছে। ফলে পচনশীল চিংড়িসম্পদ দীর্ঘসময় ধরে হাত বদলের কারণে বিভিন্ন উপায়ে পণ্যের গুণগতমান বিনষ্ট হয়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রক্রিয়ায় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই যেমন- ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি বিপণন প্রতিও বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে।

ঘ. প্রক্রিয়াজাতকরণ সমস্যা

চিংড়িসম্পদের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অভ্যন্তরীণ বাজারে চিংড়ি বিপণনের ক্ষেত্রে শুধু বরফ ব্যবহার করে হিমায়িতকরণের মাধ্যমে ক্রেতার কাছে পৌছানাে হয়। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে দেখা গেছে, প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় সরবরাহকৃত চিংড়ির প্রায় ২৫ শতাংশেরও অধিক চিংড়ি বিবর্ণ, অপরিষ্কার এবং কালো দাগযুক্ত। সংশ্লিষ্ট চিংড়ি সরবরাহকারীদের অনভিজ্ঞতা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার কারণেই চিংড়ির গুণগতমান নষ্ট হয় এবং বাজার মূল্য

২০২২

কম হয়ে থাকে। ফলে একদিকে সরবরাহকারীরা যেমন ব্যবসায়িক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অপরদিকে দেশও প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সাধারণত আমাদের দেশে এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলের ঘের এবং মুক্ত জলাশয় থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ বাজারজাতকরণের উপযুক্ত চিংড়ি আহরণ করা হয়। এসময়ে আমাদের দেশের আবহাওয়া উষ্ণ থাকার কারণে এবং চিংড়ি দ্রুত প্রক্রিয়াজাত কারখানায় সরবরাহ না করার ফলে অধিকাংশ চিংড়ির গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ট্রলারে আহরিত চিংড়ি অনেক সময় অসচেতনতার কারণে দিনের সূর্যালোকে উত্তপ্ত ডেকে ফেলে রাখা হয়। ফলে চিংড়ির দেহে কালো দাগ দেখা দেয়, যা চিংড়ি রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হয়ে দাড়ায়। চিংড়ি বিপণনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সমস্যাসমূহ ছাড়াও চিংড়ি হিমায়িতকরণ ও চিংড়ি উৎপাদন এলাকায় প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগত সমস্যা, প্রযুক্তিগত সমস্যা, বিশ্ববাজারে চিংড়ির অস্থিতিশীল মূল্য, বিপণন প্রক্রিয়ার সাথে সংশিষ্ট প্রক্রিয়ায় অর্থসংস্থানগত সমস্যা, চিংড়ির সংরক্ষণের উপযুক্ত স্থানগত সমস্যা প্রভৃতি অন্যতম। দক্ষ বিপণন প্রক্রিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে উপরোক্ত সমস্যাসমূহকে প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে

চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়া উন্নয়নের সম্ভাব্য পথ

বাংলাদেশের চিংড়ি বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহ খুব দ্রুত সমাধান করা সম্ভব নয়। তবে স্বল্প ও কল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপরোক্ত সমস্যাসমূহের সমাধান করা যেতে পারে। চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়া উন্নয়নের সম্ভাব্য কয়েকটি সুপারিশ নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

ক. চিংড়ি চাষের ভূ-প্রাকৃতিক ও কারিগরি উপযোগিতার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট এলাকায় চিংড়ি চাষ এমনভাবে সমপ্রসারণ করতে হবে যাতে উক্ত এলাকায় চিংড়ি উৎপাদন ও সরবরাহের উপর ভিত্তি করে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর বাজার ব্যবস্থা গড়ে উঠে। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর বাজার সৃষ্টির ক্ষেত্রে চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়ার সাথে সংশিষ্ট সকল পর্যায়ের লাভ-ক্ষতি বিশেষণ করে নিতে হবে।

খ. চিংড়ি পরিবহন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাপানুকূল সড়ক-যান, নৌ-যান এবং রেল বগির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে চিংড়ি উৎপাদন এলাকার সাথে সড়ক ও রেল যোগাযোগের উন্নয়নও অপরিহার্য।

গ. বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদ প্রতিযোগিতামূলক করার ক্ষেত্রে মৎস্য রপ্তানি পণ্যের যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর আইন প্রণয়নের পাশাপাশি চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের উপকরণ সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে এবং চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

ঘ. চিংড়ি উৎপাদন এলাকার কাছাকাছি আধুনিক সুবিধা সমৃদ্ধ সংরক্ষণাগার স্থাপন করতে হবে যাতে চিংড়ির গুণগতমান নষ্ট না হয়।

ঙ. চিংড়ি সংক্ষণ কারখানা বা প্রক্রিয়াজাতকরণ প্যান্টে যাতে সর্বাধিক তাজা চিংড়ি সরবরাহ করা যায় সে ধরনের প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে অহঃরড়ীরফবহঃ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

চ. চিংড়ি উৎপাদন ও বাজারে সরবরাহ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে চিংড়ি চাষিদের মধ্যে অধিক উৎপাদনশীল প্রযুক্তি সমপ্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে চিংড়ি বিপণন প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সময়ে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

২০২২

ছ. চিংড়ি সম্পদের সার্বিক বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে চিংড়ি চাষ এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি, বিপণন কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রদান, প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর উপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এ ছাড়াও চিংড়ি সম্পদ বিপণন প্রক্রিয়ার একটি নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে, যাতে এই নীতিমালার মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের স্বার্থ অক্ষুন্ন থাকে এবং চিংড়ি সম্পদের সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. প্রচলিত পদ্ধতিতে চাষকৃত চিংড়ি সাধারণত কোন সময় আহরণ করা হয়?

২. খুলনা অঞ্চলে সাধারণত কোন্ সময় চিংড়ি আহরণ করা হয়?

৩. চিংড়ি আহরণ উপকরণকে এক কথায় কি বলা হয়?

৪. ডারকি কোন্ এলাকায় বেশি ব্যবহৃত হয়?

৫. বেহুন্দি জালের স্থানীয় নাম কি?

৬. চারপাতা জাল দৈর্ঘ্যে কত মিটার হয়ে থাকে?

৭. কত ওজনের চিংড়ি বাজারজাতকরণের জন্য লাভজনক?

৮. বাগদা চিংড়ি কয়টি পদ্ধতিতে আহরণ করা হয় ?

৯. অনবরত চাষ পদ্ধতিতে পোনা মজুদের কয় মাস পর থেকে সাধারণত চিংড়ি আহরণ করা শুরু হয়?

১০. আহরণকৃত চিংড়ি বরফ মিশ্রিত পানিতে কত সময় ডুবিয়ে রাখতে হয়?

১১. পরিবহন সময় ১২-১৮ ঘণ্টা হলে বরফ ও চিংড়ি ব্যবহারের অনুপাত কত হবে?

১২. বিপণন প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগী কাদের বলা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. চিংড়ি আহরণের ক্ষেত্রে আংশিক আহরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২. চিংড়ি আহরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আহরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৩. চিংড়ির আহরণাত্তের পরিচর্যা বর্ণনা কর।

৪. বাংলাদেশের চিংড়ি বিপণন ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

৫. বাংলাদেশের চিংড়ি বিপণনে প্রধান সমস্যাসমূহ উল্লেখ কর।

৬. যেসব কারণে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত কারখানায় পৌঁছার পূর্বেই চিংড়ির গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায় তা বর্ণনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাগদা চিংড়ির আহরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২. বাগদা চিংড়ির আহরণ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা বর্ণনা কর।

৩. বাগদা চিংড়ির বাজারজাতকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪. বাগদা চিংড়ির প্যাকিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৫. চিংড়ির গুণগতমান অক্ষুন্ন রাখার কৌশল বর্ণনা কর।

২০২২

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাগদা চিংড়ির গুণগতমান সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

চিংড়ির পচন ও পচনের কারণসমূহ

মাছ বা চিংড়ির মৃত্যুর পর যে প্রক্রিয়ায় বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন- স্বাভাবিক গঠন, স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ ইত্যাদির। অবনতি ঘটে তাকে পচনক্রিয়া বলে। পচন সংঘটিত হয় মূলত অণুজীবের কর্মতৎপরতা ও দেহ অভ্যন্তরস্থ জৈব পদার্থে বিদ্যমান এনজাইমের বিক্রিয়ার ফলে। মাছ বা চিংড়ির মৃত্যুর পর তার পেশীতে পর্যায়ক্রমে সংঘটিত জটিল রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে দেহ শক্ত হয়ে যাওয়ার পরপরই পচন শুরু হয়। চিংড়ি আহরণ করার পর এবং প্রক্রিয়াজাত করার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মাঝে নিম্নলিখিত কারণে চিংড়ির পচন হয়ে থাকেঃ

ক. এনজাইমের বিক্রিয়া ঘটিত পচন

খ. র‍্যানসিডিটি

গ. ব্যাকটেরিয়ার কর্মতৎপরতা ঘটিত পচন

ক. এনজাইমের বিক্রিয়া ঘটিত পচন: জীবিত অবস্থায় যেসব এনজাইম বিপাকীয় কাজে সহায়তা করে সেগুলো মাছের মৃত্যুর পর দেহ অভ্যন্তরস্থ কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও চর্বির ব্যাপক ভাঙ্গন ঘটায়, ফলে দেহে পচন শুরু হয়। এই পচনকে স্বয়ংক্রিয় পচনও বলা হয়। এনজাইমের বিক্রিয়ার ফলে পেশী দুর্বল হয়ে যায়, ফলে ব্যাকটেরিয়ার কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়। এনজাইমের বিক্রিয়ার ফলে পেশীর প্রোটিন ভেঙে বিভিন্ন অ্যাসিড ও নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থে রূপান্তরিত হয়, যা থেকে পরবর্তীতে বিভিন্ন দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী পদার্থ উৎপন্ন হয়।

খ. র‍্যানসিডিটি: চর্বিযুক্ত মাছের ক্ষেত্রে এ ধরনের রাসায়নিক পচন হয়ে থাকে। মাছের চর্বি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড দ্বারা গঠিত হওয়ায় বাতাসের অক্সিজেনের উপস্থিতিতে এগুলো জারিত হয়। এর ফলে মাছ বিবর্ণ হয়ে যায় এবং মাছ বা চিংড়ির স্বাদ বা গন্ধ অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। বিশুদ্ধ লবণ ব্যবহার করে চর্বিযুক্ত মাছ চিংড়ির র‍্যানসিডিটি কমানো যায়।

গ. ব্যাকটেরিয়ার কর্মতৎপরতা ঘটিত পচন: তাজা মাছের দেহে কোন ব্যাকটেরিয়া না থাকলেও মাছ বা চিংড়ির ফুলকা, অন্ত্র ও ত্বকীয় শ্লেষ্মায় প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটেরিয়া থাকে। এই ব্যাকটেরিয়া মাছ বা চিংড়ির পচনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জলীয় পরিবেশ ব্যাকটেরিয়ার ক্রমবিকাশের জন্য একটি উত্তম মাধ্যম, ফলে মাছ বা চিংড়ি আহরণের সময়ই ব্যাকটেরিয়া দেহের বিভিন্ন অংশে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। প্রকৃতিগতভাবেই মাছ বা চিংড়ি জীবিত অবস্থায় ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে দেহে একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বজায় রাখে, যা মৃত্যুর পর আর কার্যকর থাকে না। ফলে দেহ অভ্যন্তরস্থ এনজাইমের স্বয়ংক্রিয় বিক্রিয়ায় ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পেশী ব্যাকটেরিয়ার প্রবেশ উপযোগী হয় এবং বংশবৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিবেশ লাভ করে। মাছ বা চিংড়ির দেহস্থিত ব্যাকটেরিয়া ছাড়াও অবতরণ কেন্দ্র ও আহরণান্তের পরিচর্যাকালীন সময়ে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া মাছ বা চিংড়ির দেহে প্রবেশ করে। মাছ বা চিংড়ির দেহে পচন সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়াগুলো হলো- এ্যারামোব্যোক্টর, সিউডামোনাস, মাইক্রোকক্কাস ইত্যাদি।

পচন রোধের উপায়সমূহ

১. অণুজীব কর্তৃক সৃষ্ট পচনকে বাধা দেয়ার জন্য নিম্নেলেখিত কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে

ক) অণুজীবকে চিংড়ি বা খাদ্যে ঢুকাতে না দেওয়া বা দূরে রাখা।

খ) অণুজীবকে অপসারণ করা।

গ) অণুজীবের বৃদ্ধি ও কার্যাবলিতে বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। যেমন- খুব ঠান্ডা করে বা শুষ্ক করে এনোরোবিক অবস্থা সৃষ্টি করে (অক্সিজেনের অভাব ঘটিয়ে), রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে ইত্যাদি।

ঘ) অণুজীবসমূহকে ধ্বংস করার মাধ্যমে।

২. চিংড়ির স্বপচন (Self decomposition) বন্ধকরণের লক্ষ্যে নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে-

ক) ড্রেসিং এর মাধ্যমে পরিপাকীয় এনজাইমের অপসারণ।

খ) সত্যিকারের রাসায়নিক বিক্রিয়াকে বাধা দেয়া বা বিলম্ব করা।

গ) চিংড়ির এনজাইমকে ধ্বংস করে বা সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করে।

ঘ) পোকা মাকড়, অন্যান্য প্রাণী, যান্ত্রিক কারণ ইত্যাদির ফলে খাদ্য বিনষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

নিম্ন তাপমাত্রায় মাছ বা চিংড়ি সংরক্ষণ

তাপমাত্রার ওপর ভিত্তি করে নিম্ন তাপমাত্রায় মাছ বা চিংড়ি সংরক্ষণ পদ্ধতিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

ক) শীতলীকরণ: এই প্রক্রিয়ায় মাছ বা চিংড়ির দেহের তাপমাত্রা ০° সে এর কাছাকাছি আনা হয় এবং সপ্তাহখানেক পর্যন্ত মাছ চিংড়ির গুণগতমান ভাল অবস্থায় থাকে।

খ) হিমায়িতকরণ: এই প্রক্রিয়ায় মাছ বা চিংড়ির দেহের তাপমাত্রা মাইনাস ৩০° থেকে মাইনাস ৪০° সে এর কাছাকাছি রাখা হয় এবং মাছ বা চিংড়ির গুণগতমান ৬ থেকে ২৪ মাস পর্যন্ত ভালো অবস্থায় থাকে।

ক. শীতলীকরণ প্রক্রিয়ায় চিংড়ি সংরক্ষণ

চিলিং বা শীতলীকরণ এমন একটি পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে চিংড়ির দেহের তাপমাত্রা কমিয়ে হিমায়ন বিন্দুর প্রায় কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়। তবে কখনই এর নিচে নয়। হিমায়ন বিন্দু বিভিন্ন প্রজাতিতে ০.৬° থেকে ২° সে এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়। তবে সচরাচর একে ১° সে ধরা হয়।

অতি শীতলীকরণ (Supper chilling)

চিংড়ির দেহের তাপমাত্রা কমিয়ে হিমায়ন বিন্দুর ঠিক নিচের তাপমাত্রায় নিয়ে আসাকে অতি শীতলীকরণ বুঝায়। এখানে চিংড়ির মাংস হিমায়িত হতে শুরু করে।

২০২২

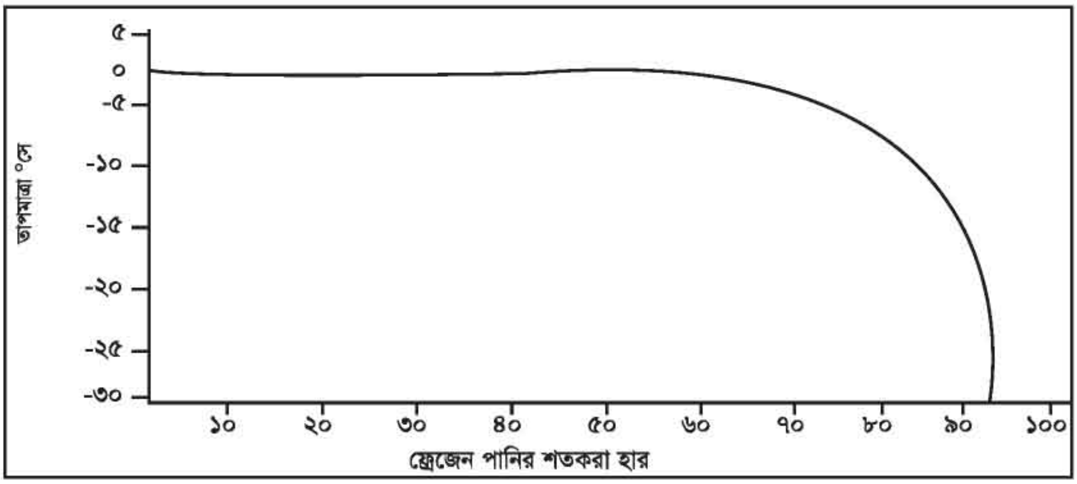

চিত্র: বিভিন্ন তাপমাত্রায় চিংড়ির মাংসে পানির পরিমাণ

চিলিং এর উদ্দেশ্য

চিলিং সাধারণত চিংড়ি বা অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্য সল্প সময়ের জন্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। কারণ এটি —

ক) অণুজীবের বৃদ্ধির হারকে কমিয়ে দেয়।
খ) চিংড়ির মৃত্যুর পর বিভিন্ন বিপাকীয় কার্যাবলিকে হ্রাস করে।
গ) রাসায়নিক কর্মকাণ্ডের ফলে চিংড়ির পচনকে রোধ করে।

চিলিং বা শীতলীকরণ পদ্ধতি

চিংড়ি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে শীতলীকরণ সবচেয়ে পরিচিত সংরক্ষণ পদ্ধতি। সাধারণত চিংড়িকে স্বল্প সময়ের জন্য সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে শীতলীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। সাধারণত নিম্নোক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে চিলিং করা হয়। যথা —

১. বরফের সাহায্যে চিংড়ি শীতলীকরণ
২. শীতল পানিতে চিংড়ি নিমজ্জনের মাধ্যমে
   ক) রেফ্রিজারেটেড সামুদ্রিক পানি (Refrigerated Sea Water- RSW)
   খ) শীতল সামুদ্রিক পানি (Chilled Sea Water- CSW)
৩. শুষ্ক বরফ (কঠিন CO_2) এর মাধ্যমে
৪. শীতলীকরণ কক্ষে চিংড়ির উপর দিয়ে ঠান্ডা বাতাস প্রবাহের মাধ্যমে
   ক) সমুদ্রে বরফ দিয়ে চিংড়ি শীতলীকরণ (Chilling of fish with ice at sea)
   খ) তুপাকারে শীতলীকরণ (Bulk chilling)

যেখানে চিংড়ি ধরা হয় এবং যে জলযানের মাধ্যমে চিংড়ি ধরা হয় তার উপর যে শীতলীকরণ করা হয় তাকে তুপাকারে শীতলীকরণ বলে। একটি উপযুক্ত ফিসরুম বিশিষ্ট ফিসিং ভেসেলে নিম্নরূপে চিংড়িকে মজুত করা হয়।

প্রথমে ফিসরুমের তলদেশ বরফ দিয়ে ১৯০ থেকে ১৯৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত গভীরভাবে আবৃত করে দিতে হয়। তবে বরফের গভীরতা বা পুরুত্ব নির্ভর করে ফিসরুমে ব্যবহৃত নিরোধক, জাহাজের দৈর্ঘ্য এবং সমুদ্রের পানির তাপমাত্রার উপর যদি ফিসরুম ধাতব পদার্থের তৈরি হয়। যদি মেঝে অন্তরিত (insulated) না হয়, তবে তলায় বরফের স্তরের পুরুত্ব বৃদ্ধি করা হয়। তখন এই বরফের স্তরের উপর চিংড়ি রাখতে হবে। তারপর আবার চিংড়ির উপর বরফের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে চিংড়ির মধ্যে বরফের গুঁড়ো থাকবে। প্রতিটি চিংড়ি একে অপরের সাথে লেগে থাকলে ঠান্ডা হতে যত সময় লাগবে তার চেয়ে কম সময় লাগবে যখন প্রতিটি চিংড়ি বরফের গুঁড়ো দিয়ে পৃথক থাকে। এরপর বরফের দ্বিতীয় স্তর দেওয়া হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আগেরগুলো ভর্তি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত খুঁড়ো বরফ ছিটিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে বরফের সর্বশেষ যে স্তরটি হয় তার পুরুত্ব ৫ সেন্টিমিটার হতে হবে। প্রতি আধা মিটার পর পর বরফের সাপোর্ট দিতে হবে। চিংড়ির বাক্সে বা ফিসরুমে চিংড়ির স্তর বেশি হওয়া উচিত নয়। কারণ এতে অতিরিক্ত চিংড়ির চাপে তলার চিংড়ি ফেটে যেতে পারে এবং চিংড়ির দেহের তরল পদার্থ বের হয়ে আসতে পারে। ফলে চিংড়ি ওজনে কমে যেতে পারে।

বাক্স শীতলীকরণ (Box chiling)

সমুদ্রের তীরে আসার পর বাক্সে চিলিং করা চিংড়ি সুপ করা চিংড়ির চেয়ে ভাল থাকে এবং ভূমিতে বা তীরে আসার পরও চিংড়ি সুরক্ষিত অবস্থায় থাকবে। এক্ষেত্রে বাক্সের ডিজাইন বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বাক্সটি এমন আকৃতির হতে হবে, যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ বরফসহ চিংড়ি ধারণ করতে পারে। এই অবস্থায় বরফ চিংড়িকে ভূমিতে আসা পর্যন্ত ঠান্ডা রাখে। আবার একইভাবে বাক্স এত প্রশস্ত হবে না যাতে একে নড়াচড়া করতে অসুবিধা হয়। বাক্সে এমনভাবে ড্রেনের ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে করে গলিত পানি গড়িয়ে বাক্সের একপাশে বা শেষ প্রান্তে এসে জমা হয়। বাক্সে চিংড়ি বোঝাই করার সময় বাক্সের তলায় প্রায় ৫ সেন্টিমিটার গভীর বরফের স্তর থাকে এবং শেষ স্তরের পুরুত্বও প্রায় ৫ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। বাক্সটি এত বেশি বোঝাই করা উচিত নয়, যাতে করে এটি ফেটে যেতে পারে।

সতর্কতাঃ

১. চিংড়ির স্তরের পুরুত্ব যেন বেশি না হয়। পুরুত্ব বেশি হলে ভিতরের চিংড়িগুলো ঠাণ্ডা হতে সময় বেশি লাগবে।

২. তুপাকার শীতলীকরণের সাহায্যে অতিরিক্ত স্তর (support layer) দিতে হবে।

৩. বাক্স শীতলীকরণের দৈর্ঘ্য ২৫ সেন্টিমিটারের বেশি হওয়া উচিত নয়। এর চেয়ে বড় হলে পরিবহনে। অসুবিধা হবে।

৪. শীতল পানিতে চিংড়ি নিমজ্জনের মাধ্যমে চিংড়িকে শীতল করা যায়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই এই পদ্ধতিতে চিংড়ি শীতলীকরণ করা হয়ে থাকে। নিচে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ ২০২২

রেফ্রিজারেটেড সামুদ্রিক পানি

এক্ষেত্রে সমুদ্রের পানিকে ঠান্ডা করে ব্যবহার করা হয়। সমুদ্রের পানিতে শতকরা ৩.৫ ভাগ লবণ থাকে। যদি সমুদ্রের পানিকে রেফ্রিজারেটেড করা হয় তাহলে সহজে তাপমাত্রা কমানো সম্ভব। এক্ষেত্রে তাপমাত্রা ২° সে থেকে মাইনাস ১০° সে পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে।

রেফ্রিজারেটেড সামুদ্রিক পানির সুবিধা

ক) খুব দ্রুত ঠান্ডা হয় কারণ এর ক্ষেত্রফল বেশি হয়।

খ) চিংড়ির একটির উপর অন্যটিকে রেখে জড়তা কমিয়ে দেয়।

গ) নিম্ন তাপমাত্রায় জমাট বাধা সম্ভব।

ঘ) অল্প সময়ে, কম শ্রমে অধিক পরিমাণে চিংড়িকে দ্রুত পরিচর্যা করা যায়।

রেফ্রিজারেটেড সামুদ্রিক পানির অসুবিধা

ক) চিংড়ির দেহের মধ্যে অধিক পরিমাণে লবণ প্রবেশ করে, কারণ সমুদ্রের পানিতে অতিরিক্ত লবণ থাকে। ফলে প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণে অসুবিধা হয়।

খ) চিংড়ির ওজন বেড়ে যায়, কারণ পানি ও লবণ দেহে প্রবেশ করে।

গ) প্রোটিনের পরিমাণ কমে যায়।

ঘ) অল্প সময়েই অ্যানারোবিক হ্যালোফিলিক ব্যাকটেরিয়া চিংড়ি পচাতে শুরু করে।

শীতল সামুদ্রিক পানি (Chilled Sea Water-CSW)

সমুদ্রের পানির সাথে কিছু পরিমাণ বরফ মিশিয়ে এটা তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে কিছু ঠান্ডা আসে রেফ্রিজারেটর থেকে এবং কিছু আসে বরফ থেকে। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত চিংড়ি ও বরফের অনুপাত সাধারণত ৩ঃ১ অথবা ৪ঃ১ হয়ে থাকে। শীত সামুদ্রিক পানি পদ্ধতিতে পর্যাপ্ত ঠান্ডা করার জন্য কী পরিমাণ বরফ প্রয়োজন তা সহজে নির্ণয় করা যায়। নিচে এ সম্পর্কিত হিসাব-নিকাশ দেওয়া হল।

ধরা যাক, ৮ টন বা ৮ হাজার কেজি চিংড়িকে ২৪° সে থেকে মাইনাস ১৭ সে তাপমাত্রায় ঠান্ডা করতে হবে এবং চিংড়ি ও বরফের অনুপাত হবে ৪ঃ১। চিংড়ি ও পানির মিশ্রণের ফলে তাদের একত্রে ওজন হবে ১০ টন (১০ হাজার কেজি) এবং কি পরিমাণ তাপ বর্জন করবে তা নিচের সুত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

আমরা জানি, $H = mst$

= ভর × আপেক্ষিক তাপ × তাপমাত্রায় পার্থক্য

= ১০০০০ × ১ × {২৪-(-১)}

= ১০০০০ × ১ × (২৪+১)

= ১০০০০ × ১ × ২৫

= ২৫০০০০ কিলোক্যালরি

এখানে, স = মাছের ভর

s = আপেক্ষিক তাপ (১ হলো মাছ ও পানির আপেক্ষিক তাপ):

t= তাপমাত্রার পার্থক্য

H = বর্জিত তাপ

২০২২

আমরা জানি, বরফ গলনের সুপ্ততাপ ৮০ কিলোক্যালরি ।

অতএব প্রয়োজনীয় বরফের ওজন = ২৫০০০০/৮০ = ৩১২৫ কেজি ।

অতএব মাইনাস ১৭° সে তাপমাত্রার জন্য ৩ টনের কিছু বেশি বরফ দরকার হবে ।

বরফের সাহায্যে শীতলীকরণ (Chilling with ice)

বরফ একটি আদর্শ শীতলীকরণ মাধ্যম । একটি নির্দিষ্ট ওজনের বা আয়তনের বরফের ঠাণ্ডাকরণ ক্ষমতা খুব বেশি নিরাপদ, তুলনামূলকভাবে সস্তা এবং চিংড়ির ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসে চিংড়িকে দ্রুত শীতল করে । কার্যকর শীতলীকরণের জন্য বরফকে অবশ্যই গলতে দিতে হবে । অধিকন্তু গলিত বরফ চিংড়িকে আর্দ্র ও চকচকে রাখে ।

আমরা জানি, পানি থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ সরিয়ে নিলে পানি বরফে পরিণত হয় এবং একই পরিমাণ তাপ যোগ করা হলে বরফ পুনরায় পানিতে পরিণত হয় । কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় আসতে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োজন হয় তাকে সুপ্ত তাপ বলে । ১ কেজি বরফ গলতে ৮০ কিলোক্যালরি তাপের প্রয়োজন হয় । তাই ৮০ কিলোক্যালরি তাপমাত্রাকে বরফ গলনের সুপ্ততাপ বলে । বরফ গলতে বেশি তাপের প্রয়োজন হয় বলে এটি ভালো ঠাণ্ডাকরণ বাহক হিসেবে কাজ করে । এখানে উল্লেখ্য ১ কেজি পানির তাপমাত্রা ১০ সে বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় সেই পরিমাণ তাপকে ১ কিলোক্যালরি বলা হয় ।

পানির আপেক্ষিক তাপ ১ এবং অন্যান্য পদার্থের আপেক্ষিক তাপ ১ অপেক্ষা কম । নিচে কয়েকটি পদার্থের আপেক্ষিক তাপ উল্লেখ করা হলো —

পদার্থ	আপেক্ষিক তাপ
বরফ	প্রায় ০.৫
ওয়েট ফিস	প্রায় ০.৯৬ (সাধারনত এক ধরা হয়)
হিমায়িত মাছ	প্রায় ০.৪
অধিকাংশ ধাতব পদার্থ	প্রায় ০.১

চিত্রঃ বরফের সাহায্যে চিংড়ি শীতলীকরণ

বরফ কিভাবে চিংড়িকে ঠান্ডা করে

শীতলীকরণ করার জন্য যখন ব্রফকে চিংড়ির সংস্পর্শে রাখা হয়, তখন গরম বা উষ্ণ চিংড়ি থেকে তাপ বরফে স্থানান্তরিত হয়। এভাবে চিংড়ির তাপমাত্রা কমতে থাকে এবং বরফ গলতে থাকে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চিংড়িকে শীতল করার জন্য কি পরিমাণ তাপ অপসারণ করতে হবে এবং কি পরিমাণ প্রয়োজন তা সহজেই হিসাব করা যায়।

কোনো পদার্থ ঠান্ডা হতে কি পরিমাণ তাপ বর্জন করে তা আপেক্ষিক তাপ ব্যবহার করে বের করা যায়। যেমন—

বর্জিত তাপ= বস্তুর ওজন × তাপমাত্রার পার্থক্য × আপেক্ষিক তাপ

উদাহরণ: ১০ কেজি মাছ যার তাপমাত্রা ২৫ সে মাছের আপেক্ষিক তাপ ১। এখন এই ১০ কেজি মাছকে ২৫° সে, থেকে ০° সে. তাপমাত্রায় ঠান্ডা হতে বর্জিত, তাপ হলো

= ১০ × ২৫ × ১ = ২৫০ কিলোক্যালরি।

কিন্তু ১ কেজি বরফ গলতে ৮০ কিলোক্যালরি তাপ গ্রহণ করে। সুতরাং ১০ কেজি মাছ ঠাণ্ডা হতে

= ২৫০/৮০ = ৩.১২ কেজি বরফ প্রয়োজন হবে।

বরফের প্রকারভেদ

ক) ব্লক আইস (Block ice): এটি মৎস্য শিল্পে ব্যবহৃত বরফের মধ্যে অন্যতম এবং বহুল পরিচিত। আমাদের দেশে এটি বেশি ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজন অনুসারে একখণ্ড বরফের ওজন ১২-১৫০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে বাজারের উপর নির্ভর করে এর আকৃতি দেয়া হয়। চিংড়ি শীতলীকরণের জন্য ব্লক আইসকে গুঁড়ো করে ব্যবহার করা হয়।

খ) ফ্লেক আইস (Flake ice): এটি তুলার ন্যায় নরম। এটি খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফের গুঁড়ো যা দেখতে পাউডারের ন্যায়।

গ) টিউব আইস (Tube ice): এই ধরনের বরফ একটা উলম্ব নলের ভিতরের গাত্রে তৈরি করা হয় যা ফাঁপা সিলিন্ডার আকৃতির হয়ে থাকে। এর পুরুত্ব প্রায় ১০-১২ মিটার ও আকার ৫০দ্ধ৫০ বর্গ মিমি। নল থেকে বরফ বের করার পর একে বরফ কাটা নলের সাহায্যে সুবিধামত খণ্ডে (সাধারণত ৫০ মিমি) কাটা হয়।

ঘ) প্লেট আইস (Plate ice): এটি দেখতে প্লেটের ন্যায়। একটি উলম্ব প্লেটের এক মুখে এ ধরনের বরফ তৈরি হয় এবং অপর মুখে পানি প্রবাহিত করে একে প্লেট থেকে বের করে আনা হয়। এই বরফে সর্বানুকূল পুরুত্ব হলো ১০-১৫ মিমি। তবে বরফ খণ্ডের আকার পরিবর্তনশীল।

শীতলীকরণের সময় চিংড়ির পরিবর্তন

২০২২ **ক) প্রোটিন ও ওজনে কম হওয়া:** বরফ দিয়ে চিংড়ি শীতল করতে থাকলে চিংড়ির ওজন ক্রমান্বয়ে। কমতে থাকে। ব্যাপকভাবে মুক্ত তরল ও ড্রিপ গঠনের (drip formation) কারণে হিমায়িত ফিলেট ও

স্টেক (fillets & steaks) ওজনে কমে যায়। কারণ ড্রিপ গঠনের ফলে কিছু দ্রবণীয় প্রোটিন, লবণ ও অন্যান্য পুষ্টিকারক দ্রব্য দেহ থেকে বেরিয়ে আসে।

খ) বিবর্ণতা (Discoloration): চিলিংয়ের সময় চিংড়ির উপর বরফের অতিরিক্ত চাপের কারণে চিংড়ির ক্ষতি হয়। দেহ থেতলে যায়, গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং বিবর্ণ হয়ে থাকে।

গ) পচনশীলতা (Rancidity): বরফ দিয়ে দীর্ঘদিন শীতলীকরণের জন্য পচা গন্ধ চিংড়ির গুণাগুণ নষ্ট করে দেয়।

ঘ) কুঞ্চিত হওয়া (Shrinkage): কুঁচকে যাওয়া একটি সাধারণ ঘটনা যা চিংড়ির বরফ দিয়ে প্যাকেট করার সময় ঘটে থাকে। বিশেষ করে উপরের স্তরে এটা ঘটে।

খ. হিমায়িতকরণ প্রক্রিয়ায় চিংড়ি সংরক্ষণ।

হিমায়িতকরণ হলো চিংড়ি সংরক্ষণের এমন একটি পদ্ধতি যাতে চিংড়ির দেহের প্রাথমিক তাপমাত্রাকে কমিয়ে মাইনাস ৪০° সে এর নিচে আনা হয়, ফলে চিংড়ির কলার বেশিরভাগ পানি জমে বরফে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে প্রায় ৮৫ শতাংশ পানি বরফে রূপান্তরিত হয়। যদিও মাইনাস ৮°সে তাপমাত্রায় চিংড়িকে হিমায়িতকরণ করা হয় তথাপিও এনজাইমেটিক কর্মতৎপরতা মাইনাস ২০° সে তাপমাত্রা পর্যন্ত চলতে থাকে। ফলে চিংড়ির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই চিংড়ির গুণগতমান ভালো রাখার জন্য মাইনাস ৩৫° সে থেকে মাইনাস ৪০° সে তাপমাত্রায় চিংড়িকে ফ্রোজেন করা হয়। হিমায়িতকরণের আধুনিক পদ্ধতিতে দ্রুত দেহের তাপমাত্রা নিচে নেমে আসে এবং চিংড়ির দেহকলার অভ্যন্তরস্থ সর্বশেষ তাপমাত্রা হয় মাইনাস ৪০° সে।

হিমায়িতকরণের উদ্দেশ্য।

হিমায়িতকরণের মাধ্যমে কোনো একটি দ্রব্যের গুণগত মান অপরিবর্তিত রাখা হয়। নিম্নলিখিত কারণে চিংড়ির ফ্রিজিং বা হিমায়িত করা হয়ে থাকে। যথা—

ক) অণুজীবদ্বারা খাদ্য বতুর পচনকে রাধে করে বা বাধা দেয়।

খ) এনজাইমের কার্যাবলিকে রাধে করে বা বাধা দেয়।

গ) রাসায়নিক বিক্রিয়া রাধে করে বা বাধা দেয়।

আংশিক হিমায়িতকরণ (Partial freezing): আংশিক হিমায়িতকরণ হলো চিলিং এবং হিমায়িতকরণ তাপমাত্রার মধ্যবর্তী একটি তাপমাত্রা অর্থাৎ যখন চিংড়ির দেহের তাপমাত্রাকে কমিয়ে মাইনাস ৩° সে বা মাইনাস ৪° সে এ আনা হয়, তখন তাকে আংশিক হিমায়িতকরণ বলে।

ফ্রোজেন (Frozen): ফ্রোজেন হলো তাপমাত্রাকে কমিয়ে কমপক্ষে মাইনাস ৮° সে থেকে মাইনাস ১০° সে এ নিয়ে আসা।

ফ্রোজেন উৎপাদ (Frozen product): যখন কোনো বস্তুর তাপমাত্রা কমিয়ে মাইনাস ৮° থেকে মাইনাস ১০° সে এর মধ্যে নিয়ে আসা হয়, তখন সেই বতুকে ফ্রোজেন উৎপাদ বলে।

চিলিং স্টোরেজ (Chiling storage): চিংড়িকে হিমায়িতকরণ তাপমাত্রার উপরে রেখে গুদামজাত করাকে চিংড়ির চিলিং স্টোরেজ বলে। চিলিং স্টোরেজের ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কারণ এটি স্বল্পমেয়াদি সংরক্ষণ পদ্ধতি হিসেবে খুবই ফলপ্রসূ। ২০২২

সারণি: চিলিং ও ফ্রিজিং এর মধ্যে পার্থক্য

চিলিং	ফ্রিজিং
১. তাপমাত্রা কমিয়ে ফ্রিজিং পয়েন্টের নিকট নিয়ে আসা	১. তাপমাত্রা কমিয়ে মাইনাস ৮° সে থেকে মাইনাস ৩০° বা মাইনাস ৪০° সে এ নিয়ে আসা
২. দেহস্থ পানির অণুগুলো বরফে পরিণত হয় না	২.দেহস্থ পানির অণুগুলো বরফে পরিণত হয়
৩. এটি স্বল্পকালীন সংরক্ষণ পদ্ধতি	৩. এটি দীর্ঘকালীন সংরক্ষণ পদ্ধতি
৪. মাছ ধরার যান্ত্রিক যানে এর সুযোগ-সুবিধা থাকে	৪. ট্রলারে ও মাদারশীপে সাধারণত এ সুযোগ সুবিধা থাকে
৫. চিলিং সাধারণত বরফের মাধ্যমে করা হয়	৫. ফ্রিজিং সরাসরি ফ্রিজারের মাধ্যমে করা হয়

হিমায়িতকরণের শ্রেণিবিন্যাস

হিমায়িতকরণ মূলত দু'প্রকার, যথা

ক) ধীরগতি হিমায়িতকরণ (slow freezing), এবং

খ) দ্রুত হিমায়িতকরণ (quick freezing)।

ক) ধীরগতি হিমায়িতকরণ (slow frezing)

এই পদ্ধতিতে ধীরে ধারে চিংড়ির দেহ থেকে তাপমাত্রা কমিয়ে হিমায়িতকরণ তাপমাত্রায় নিয়ে আসা হয়। সাধারণত তাপমাত্রা কমিয়ে মাইনাস ২৫° সে বা তার নিচে রাখা হয়। তাই এই তাপমাত্রা মাইনাস ১৫° থেকে মাইনাস ৩০° সে বা এর নিচে রাখা হয়। হিমায়িতকরণ হতে সময় লাগে ৩ থেকে ৭২ ঘণ্টা।

ধীরগতি হিমায়িতকরণের সুবিধা

- মাইনাস ১° থেকে মাইনাস ৮° সে পর্যন্ত তাপমাত্রা ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণের জন্য খুবই অসুবিধাজনক। তাপমাত্রা খুব ধীরে ধীরে কমে বিধায় চিংড়ির দেহের অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া মারা যায়।

ধীরগতি হিমায়িতকরণের অসুবিধা

- যেহেতু এটি ধীর প্রক্রিয়া তাই চিংড়ির দেহে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়া ও ব্যাক্টেরিয়ার কর্মতৎ-পরতা চলতে থাকে, ফলে কিছুটা হলেও চিংড়ির গুণাগুণ নষ্ট হয়।
- ধীর হিমায়নের ফলে বরফের বড় কেলাস (crystal) উৎপন্ন হয় যা পেশীকে নষ্ট করে ফেলে বলে চিংড়ির বাজার দর কমে যায়।
- বেশি লবণ বেরিয়ে আসে ফলে প্রোটিন ডিনেচারেশন (denateration) হয়।

খ) দ্রুত হিমায়িতকরণ (quick freezing)

এই পদ্ধতিতে খুব দ্রুত চিংড়ি দেহের তাপমাত্রা কমিয়ে আনা হয়। এক্ষেত্রে হিমায়িতকরণের তাপমাত্রা সাধারণত মাইনাস ৪০° সে এবং হিমায়িতকরণ হতে ৩০ মিনিট বা তার চেয়ে কম সময় লাগে।

২০২২

দ্রুত হিমায়িতকরণের সুবিধা

ক) চিংড়ির শরীরের অভ্যন্তরে গঠিত বরফের কণিকাগুলো ছোট বলে দেহ কলার যান্ত্রিক ক্ষতি হয় না, আর হলেও কম হয়।

খ) যেহেতু এই প্রক্রিয়ায় কম সময়ের মধ্যে চিংড়ির দেহ মধ্যস্থিত তরল পদার্থ বরফে পরিণত হয় ফলে কম। পরিমাণে পুষ্টি পানিতে দ্রবীভূত হয় এবং বরফের মধ্যে আটকা পড়ে।

গ) খুবই তাড়াতাড়ি অণুবীক্ষণিক জীবের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়।

ঘ) থইং (thawing) এর ফলে পূর্বের কোষগুলো পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে।

রেফ্রিজারেশন (Refrigeration)
একটি বদ্ধ ঘরে ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত করে চিংড়ি বা অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্যের তাপমাত্রা কমিয়ে তাদেরকে সংরক্ষণ করার পদ্ধতিকে রেফ্রিজারেশন বলে।

হিমায়ক যন্ত্রের প্রকারভেদ (Types of freezer)

মাছ বা চিংড়ির হিমায়িতকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের হিমায়ক যন্ত্র বা ফ্রিজার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নিচে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত কয়েকটি হিমায়ক যন্ত্রের বিবরণ দেয়া হলো:

১. এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজার (Air blast freezer)
২. কন্টাক প্লেট ফ্রিজার (Contact platefreezer)
৩. ইমারসন ফ্রিজার (Immersion freezer)
৪. সার্প ফ্রিজার (Sharp freezer)
৫. অন্যান্য ফ্রিজার (Other freezers)

১. এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজার (Air blast freezer)

যে হিমায়ক যন্ত্রের ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের বাষ্প প্রবাহিত করে চিংড়ি বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যকে হিমায়িত-করণ করা হয়, তাকে এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজার বলে। এটি দু'প্রকার, যথা:

ক) সার্বক্ষণিক ফ্রিজার (Continuous freezer): এতে হিমায়িতকরণের সময় উৎপাদন ঘুরতে থাকে। যেমন হিমাগারের ভিতর এক পাশ দিয়ে চিংড়ি ঢাকোনো হয় এবং অন্য পাশ দিয়ে বের করা হয়।

খ) ব্যাচ ফ্রিজার (Bacth freezer): এর ভিতর উৎপাদন স্থির থাকে। যেমন- হিমাগারের ভিতর এক ব্যাচ চিংড়ি ঢুকিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে ধরে রেখে দেয়া হয়।

বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজারের হিমায়িতকরণ পদ্ধতি

এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজারে সাধারণত সুড়ঙ্গ পথযুক্ত একটি পৃথককৃত ঘর, যার মধ্যে ইভাপারেটরের উপর দিয়ে এক বা একাধিক ফ্যানের মাধ্যমে উৎপন্ন বায়ু যাকে অ্যামোনিয়া (NH_3), ঠান্ডা লবণ পানি অথবা রেফ্রিজারেন্ট (refrigerant) ১২ বা ২২ ঘণ্টা দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়েছে, তা যে দ্রব্যকে হিমায়িতকরণ করা হবে তার চারপাশে দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। এই ফ্রিজারের পৃথককৃত ঘরের মধ্যে সাধারণত একবারেই সম্পূর্ণরূপে সেলফের র্যাকে চিংড়ি ভর্তি করা হয় এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যাককে ঘূর্নায়মান অবস্থায় অথবা স্থির রাখা হয়। সাম্প্রতিককালে উন্নত ফ্রিজারে চিংড়ি উৎপাদনকে সর্বক্ষণ নাড়াচাড়া করানোর জন্য কনভেয়র (conveyor) ২০২২

ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের অধিকাংশ ফ্রিজারে বায়ুর তাপমাত্রা মাইনাস ৩৫° থেকে মাইনাস ৪০° সে. এর মধ্যে রাখা হয়। অধিকাংশে অর্থনৈতিক সুবিধাজনক হিমায়িতকরণ করানোর জন্য উৎপদেনের উপর দিয়ে এই ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহের গতি সাধারণত ৫০০-১০০০ এফপিএম (ফুট পার মিনিট) এর মধ্যে রাখা হয়। এরূপ ফ্রিজারের হিমায়িতকরণ করতে সময় লাগে ৬-৮ ঘন্টা।

২. কন্টাক্ট প্লেট ফ্রিজার (Contact plate freezer)

এই হিমায়ক যন্ত্রে চিংড়িকে সরাসরি প্লেটের উপর রেখে ধীরে ধীরে হিমায়িতকরণ করা হয়। এরূপ ফ্রিজারের চিংড়িকে ফাঁপা ধাতুর প্লেটের মধ্যে রাখা হয়, যার ভিতরে যে কোনো একটি রেফ্রিজারেন্ট প্রবাহিত করানো হয়। এটি দু'প্রকার, যথাঃ

ক) অনুভূমিক কন্টাক্ট প্লেট ফ্রিজারঃ এতে ট্রের মধ্যে বসানো চিংড়ির চ্যাপ্টা প্যাক ব্যবহার করা হয়।

খ) উলম্ব কন্টাক্ট প্লেট ফ্রিজারঃ প্রধানত বড় ধরনের বক তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

চিত্রঃ অনুভূমিক কন্টাক্ট প্লেট ফ্রিজার

চিত্রঃ উলম্ব কন্টাক্ট প্লেট ফ্রিজার

বাণিজ্যিক পদ্ধতি

কন্টাক্ট প্লেট ফ্রিজারে একটি ক্যাবিনে বা ঘরের চলাচলক্ষম অনুভূমিক প্লেটগুলোর উলম্বভাবে গাদা দেওয়া থাকে। প্লেটগুলোকে সংযুক্ত পথের মাধ্যমে ঠান্ডা লবণ পানি, NH_3, বা রেফ্রিজারেন্ট ১২ বা ২২ ঘন্টা দিয়ে ঠান্ডা করার ব্যবস্থা থাকে। এই ধরনের ফ্রিজার গাটবন্দি (packaged) মৎস্য উৎপাদের জন্য উপযুক্ত। প্রতিটি বক চিংড়িসহ ৫০-৬০ মিলিমিটার পর্যন্ত পুরু হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বকের তাপমাত্রা মাইনাস ৩৫° সে হয়ে থাকে। মৎস্য উৎপাদকে তাড়াতাড়ি ফ্রিজিং করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

৩. ইমারসন ফ্রিজার (Immersion freezer)

এক্ষেত্রে নিম্ন তাপমাত্রার তরল পদার্থ উৎপাদকে ডুবানো বা নিমজ্জন করা হয়। এ ধরনের ঠান্ডা তরল পদার্থের মধ্যে চিংড়িকে রেখে সরাসরি তার দেহের তাপমাত্রা কমানোর পদ্ধতি এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজারের ঠান্ডা বাতাস থেকে উৎকৃষ্ট। পানি থেকে এই ধরনের তরল পদার্থের ফ্রিজিং পয়েন্ট বেশি হয়ে থাকে।

৪. সার্প ফ্রিজার (Sharp freezer)

সার্প ফ্রিজার একটি পৃথককৃত ঘর এবং সেখানকার তাপমাত্রা মাইনাস ২৫° সে রাখা হয়। এখানে একাধিক পাইপের কয়েল দিয়ে তৈরি সেলফ রাখা হয়। যার ভিতর দিয়ে ঠান্ডা লবণ পানি, ঘঐ, অথবা অন্যান্য রেফ্রিজারেন্টকে প্রবাহিত করা হয়। এই পদ্ধতিতে চিংড়িকে হিমায়িতকরণের সময় সরাসরি সেলফ রক্ষিত প্লেটের উপর রাখা হয়। এই পদ্ধতিতে উৎপাদের সব অংশ পাইপের সংস্পর্শে থাকতে পারে না। এই পদ্ধতি অনেক পুরাতন বলে বর্তমানে এর ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত।

৫. অন্যান্য ফ্রিজার

ক) তরল নাইট্রোজেনের হিমায়িতকরণ তাপমাত্রা মাইনাস ১৯৬° সে। তরল নাইট্রোজেন ব্যবহার করেও চিংড়ি/মাছ হিমায়িত করা হয়।

খ) CO_2, ফ্রিজান্ট (freezant) ব্যবহার করে অনেক সময় চিংড়ি/মাছ হিমায়িত করা হয়।

তাজা বা টাটকা চিংড়ি বা মাছ হিমায়িতকরণের সময় সৃষ্ট প্রধান সমস্যাসমূহ হলো

ক) জারণের ফলে নষ্ট হওয়া ;
খ) পানি বের হয়ে যাওয়া ;
গ) ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পাওয়া ;
ঘ) অটোলাইসিসের সমস্যা ;
ঙ) প্রোটিন ভেঙে নষ্ট হয়ে যাওয়া ; এবং
চ) অণুবীক্ষণিক জীবের সমস্যা ইত্যাদি।

ফ্রিজার বার্ন (Freezer burn)।

এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজারের ঠান্ডা বাতাসের গতিবেগ ৫০০ এফপিএম-এর নিচে হলে চিংড়ির উপর একটি সাংঘাতিক ধরনের প্রভাব পড়ে। এই ধরনের ক্ষতিকর প্রভাবকে ফ্রিজার বার্ন বলে। এই অবস্থায় চিংড়ির পারিপার্শ্বিক জলীয় বাষ্পের চাপ কমে যায়, ফলে চিংড়ির দেহে থেকে পানি বের হয়ে যেতে থাকে এবং চিংড়ি শক্ত হয়ে ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। এ ছাড়া চিংড়ির বর্ণ, গঠন ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যায়। ২০২২

গ্লেজিং (Glazing)

এটি ফ্রিজার বার্ন থেকে চিংড়িকে রক্ষা করার একটি পদ্ধতি। চিংড়ির দেহ থেকে যাতে সহজে পানি বের হয়ে যেতে না পারে, সেজন্য এই প্রক্রিয়ায় চিংড়ির দেহের চারপাশে বরফের একটি আস্তরণ সৃষ্টি করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় খুবই অল্প সময়ের জন্য খুব নিম্ন তাপমাত্রায় জলীয় বাষ্প দ্রবণে চিংড়িকে ডোবানো হয়। ফলে চিংড়ির দেহের চারিদিকে বরফের একটি আস্তরণ পড়ে এবং চিংড়ির দেহ থেকে পানি বের হতে বাধা পায়।

থইং (Thawing)

থইং হলো হিমায়িতকরণের পরের একটি পরিচর্যা যাতে চিংড়ির দেহে কোথাও কোনো বরফ থাকে না। এরূপ অবস্থা তখনই ঘটে যখন চিংড়ির দেহের সর্বত্রই তাপমাত্রা ১ সে এর উপরে থাকে।

চিংড়ি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে প্যাকেজিং-এর গুরুত্ব

চিংড়ি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে প্যাকেজিংয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। চিংড়ি পণ্যকে বাতাসের আর্দ্রতা, পোকা-মাকড়, ধুলাবালি ইত্যাদি থেকে রক্ষার জন্য অবশ্যই ভালোভাবে প্যাকেজিং করা উচিত। ভালো প্যাকেজিং করে না রাখলে চিংড়ি পণ্যের গুণগতমান অতিদ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে।

স্বাস্থ্যসম্মত ও উন্নত চিংড়ি পণ্য তৈরি ও বাজারজাতের জন্য উন্নত প্যাকেজিং-এর গুরুত্ব

ক) প্যাকেজিংয়ের মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের মানের একটা প্রতিচ্ছবি ক্রেতা/বিক্রেতার নিকট ভেসে উঠে।

খ) প্যাকেজিংয়ের ধরন থেকে অতি সহজেই বুঝে নেয়া যায় পণ্যটি কত ভালোভাবে সক্ষণ করা আছে বা সংরক্ষিত থাকবে।

গ) ভালোভাবে প্যাকেজিং করা থাকলে বিক্রেতা পণ্যটি সুবিধামত স্থানে ও সুবিধামত সময়ে বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ ও স্থানান্তর করতে পারে।

ঘ) ক্রেতাও সবসময় ভালো প্যাকেজিং করা পণ্য ক্রয় করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

চিত্রঃ বাগদা চিংড়ির উন্নতমানের প্যাকেজিং

প্যাকেজিংয়ে লেভেল ব্যবহারের গুরুত্ব

ক) প্যাকেজিংয়ের লেবেলের মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের মানের একটা প্রতিচ্ছবি ক্রেতা বিক্রেতার নিকট ভেসে উঠে।

খ) প্যাকেজিংয়ের লেবেলের বর্ণনা থেকে অতি সহজে বুঝে নেয়া যায় পণ্যটির গুণগতমান, পুষ্টিগুণ ও এর মেয়াদ সম্পর্কে।

গ) ভালোভাবে প্যাকেজিং ও লেবেলিং করা থাকলে ক্রেতা সব সময় পণ্য ক্রয় করতে স্বাচ্ছন্দ্য বাধে করে।

ঘ) ট্রেসে বিলিটি লেবেল থাকলে পণ্যের পরিপূর্ণ ইতিহাস সহজেই জানা সম্ভব হয়।

প্যাকেজিং ও লেবেলিং এবং উৎপাদনকারী শনাক্তকরণ

ক) প্যাকেজিং ও লেবেলিং ঠিক থাকলে চিংড়ি পণ্যের গুণগত মানের জন্য উৎপাদনকারীকে দায়ী করা সম্ভব হয়।

খ) প্যাকেজিংয়ের লেবেল থেকে উৎপাদনকারীকে শনাক্ত করা যায়।

গ) উৎপাদনকারীকে শনাক্ত করা গেলে পণ্যের গুণগতমানের দায়ভার উৎপাদনকারীর উপর বর্তানো সহজ হয়। ঘ) যেহেতু ট্রেসবিলিটি (traceabiluty) লেবেল অর্থাৎ পরিপূর্ণ ইতিহাস রাখা আস্তে আস্তে বাধ্যতামূলক হতে যাচ্ছে, সেহেতু উৎপাদনকারীকে বা আরও নিচের দিকে চাষি বা হ্যাচারি মালিককেও শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

ট্রেসেবিলিটি লেবেলে সাধারণত যে সকল তথ্য থাকা উচিত সেগুলো হলোঃ

ক) মা-চিংড়ি সম্পর্কিত তথ্য, যথাঃ ধরার তারিখ, ধরার প্রকৃতি ও ধরার পরে ব্যবহৃত খাদ্য/ঔষধের বিবরণ।

খ) সকল গৃহীত ব্যবস্থাদির তালিকা।

গ) চিংড়ি পোনা সম্পর্কিত তথ্য, যথাঃ হ্যাচিং এর তারিখ, ট্যাংক নম্বর ও পরের খাদ্য/ঔষধসহ গৃহীত ব্যবস্থাদির তালিকা।

ঘ) চিংড়ি চাষ সম্পর্কিত তথ্য, যথাঃ মজুদের তারিখ, পুকুর নম্বর ও পরের খাদ্য/ঔষধসহ গৃহীত ব্যবস্থাদির তালিকা।

ঙ) চিংড়ি ডিপো/মধ্যবর্তী স্থান সম্পর্কিত তথ্য যথাঃ ধরার/সংগ্রহের তারিখ, অবস্থানের মোট সময় ও গৃহীত ব্যবস্থাদির তালিকা।

চ) চিংড়ি ডিপো/মধ্যবর্তী স্থান সম্পর্কিত তথ্য যথাঃ ধরার/সংগ্রহের তারিখ, অবস্থানের মোট সময় ও গৃহীত। ব্যবস্থাদির তালিকা

ছ) চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কিত তথ্য যথাঃ চিংড়ি গ্রহণের তারিখ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং ও স্টোরেজসহ গৃহীত ব্যবস্থাদির বিস্তারিত তালিকা।

প্যাকেজিং ও লেবেলিংয়ের সঙ্গে পণ্যের মান বাড়ার সম্পর্ক

ক) প্যাকেজিং ও লেবেলিং ঠিক থাকলে, লেবেলিংয়ে উৎপাদনকারীর পরিচয় থাকে ফলে উৎপাদনকারীর নিজস্ব দায় দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায় ও পণ্যের মান বাড়াতে সহায়তা করে।

খ) উৎপাদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত পণ্যের লেবেলে তাদের নাম ঠিকানা ব্যবহার করলে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সুনাম রক্ষা করা ও ব্যবসায়িক সাফল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য তাদের উৎপাদিত পণ্যের মান বাড়াতে সদা সচেষ্ট থাকে।

স্বাস্থ্যসম্মত ও উন্নত চিংড়ি পণ্য তৈরি ও বাজারজাতের জন্য উন্নত প্যাকেজিং সরঞ্জাম ও তার ব্যবহার

পলিথিন/কাগজ জাতীয় সরঞ্জাম প্রদর্শন ও তার ব্যাখ্যা—

ক) প্যাকেজিংয়ের জন্য পলিথিন জাতীয় সরঞ্জামের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ও জনপ্রিয়।

খ) পলিথিন বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

গ) পলিথিনের গুণগত মান ও পুরুত্বেরও অনেক রকমভেদ আছে।

পলিথিন সিলারের ব্যবহার

ক) বিশ্বব্যাপী প্যাকেজিং সরঞ্জাম হিসেবে পলিথিনের ব্যবহারের সাথে সাথে পলিথিন সিলারের ব্যবহারের। ব্যাপকতা বাড়ছে।

খ) বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার পলিথিন সিলারও এখন বাজারে পাওয়া যায়।

চিত্র: পলিথিন সহযোগে প্লাস্টিক বাক্সে প্যাকেজিং

পলিথিন জাতীয় সরঞ্জাম ব্যবহারের বেশ কিছু সুবিধা ও অসুবিধা আছে সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে—

ক) সহজপ্রাপ্যতা ও মূল্য কম হওয়া

খ) স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ উভয় প্রকার প্রাপ্যতা

গ) বিভিন্ন আকার ও প্রকৃতির প্রাপ্যতা

ঘ) লেবেল প্রিন্ট করার সুযোগ থাকা

ঙ) আর্দ্রতা প্রতিরোধক হওয়া

চ) টেকসই হওয়া

অসুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে—

ক) পরিবেশবান্ধব না হও না।

খ) কোনো সরু দ্রব্য, সুচ ও ধারালো জিনিস যেমন, চাকু, পিন, ইত্যাদির সংস্পর্শে আসলে সহজেই ছিদ্র হওয়া বা কেটে যাওয়া।

গ) মজুদের সময় উপরে অবস্থিত প্যাকেটের মালামালের চাপ সরাসরি নিচের প্যাকেটের মালের উপর পড়ে।

পুনরায় ব্যবহারযোগ্য সাদা প্লাস্টিক পাত্রের ব্যবহার—

ক) পুনরায় ব্যবহারযোগ্য পাত্র হিসেবে প্রচলিত সাদা পাস্টিকের বৈয়মের ব্যবহার করা যেতে পারে।

খ) পরীক্ষামূলকভাবে বেশকিছু সাদা পাস্টিকের বৈয়মের ব্যবহার করে শুটকি বাজারজাত করে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গেছে।

গ) চিংড়ি পণ্যের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার করতে হলে বৈয়মের আকার আকৃতি পরিবর্তন করে চিংড়ি পণ্যের উপযোগী করে তৈরি করতে হবে।

স্বাস্থ্যসম্মত ও উন্নত চিংড়ি পণ্য তৈরি ও বাজারজাতকরণের সমস্যা ও সমাধান

ক) স্বাস্থ্যসম্মত ও উন্নত চিংড়ি পণ্যের খবর ক্রেতার নিকট পৌঁছানো অতি জরুরি।

খ) চিংড়ি পণ্যের ভোক্তারা সাধারণভাবে চিংড়ি পণ্যের স্বাদের বিচার বিশেষণ করে থাকে।

গ) চিংড়ি পণ্যের সকল ক্ষেত্রে হ্যাসাপ মেনে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরি কিনা সে ব্যাপারে সচেতনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাজারজাতকরণের সমস্যা ও সমাধানের জন্য করণীয়

চিংড়ি পণ্যের বাজারজাতকরণের সমস্যা সমাধানের জন্য করণীয় বিষয়সমূহ তা নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক) চিংড়ি পণ্য বাজারজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায়েও গুণগতমান হারাতে পারে।

খ) অবশ্যই বাজারজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে চিংড়ি পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

গ) চিংড়ি পণ্য বাজারজাত করার জন্য স্থানান্তরের সময় বা বাজারজাতের পরে বিক্রেতার দোকানে অসাবধানতার কারণে চিংড়ি পণ্যের প্যাকেট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ও চিংড়ি পণ্যের গুণগতমান নষ্ট হতে পারে।

ঘ) দোকানে দীর্ঘদিন অবিক্রীত রয়ে গেলে চিংড়ি পণ্যের গুণাগুণ নষ্ট হতে পারে।

ঙ) বাজারজাতকরণের সময়ে ও তৎপরবর্তী বিক্রয়ের সময়ে বিশেষভাবে চিংড়ি পণের মাননিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য।

চ) স্বাস্থ্যসম্মত চিংড়ি পণ্যের খবর অতি জরুরিভাবে ক্রেতার নিকট পৌছানারে ব্যবস্থা করতে হবে।

ছ) চিংড়ি পণ্য স্বাস্থ্যসম্মত বা অস্বাস্থ্যসম্মত আছে এ ধারণাটা ক্রেতার নিকট পৌছানারে জন্যে পর্যাপ্ত বিজ্ঞাপনের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

জ) অধিক মূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত চিংড়ি পণ্য ক্রয় করতে পারে এমন সচেতন ও সমর্থ ক্রেতার নিকট চিংড়ি পণ্য পৌছানারে ব্যবস্থা করতে হবে।

ঝ) বাজারজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায় ও বিক্রয়ের সময়ে চিংড়ি পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২০২২

চিংড়ি পণ্য দেশে ও বিদেশে বিপণনে বিজ্ঞাপন প্রচারসহ মেলা বা প্রদর্শনীর আয়োজন করাঃ

ক) চিংড়ি পণ্য স্বাস্থ্যসম্মত বা অস্বাস্থ্যসম্মত আছে এ ধারণাটা ক্রেতার নিকট পৌঁছানোর জন্যে বিজ্ঞাপনের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হবে।

খ) বিজ্ঞাপনের জন্যে বিভিন্ন গণমাধ্যম, যেমন- রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, ইন্টারনেট ইত্যাদির। মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের প্রচার করে স্বাস্থ্যসম্মত চিংড়ি পণ্যের জনপ্রিয়তা বাড়াতে হবে।

গ) অন্যান্য প্রচার মাধ্যম, যেমন- ব্যক্তিগত যোগাযোগ, পোস্টার, বিলবোর্ড, লিফলেট ইত্যাদিও সার্থকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঘ) বিভিন্ন গণমাধ্যমে শুধু বিজ্ঞাপন প্রচার করলেই চলবে না বরং অধিক মূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত চিংড়ি পণ্য ক্রয় করতে পারে এমন সচেতনতা ও সমর্থ ক্রেতার নিকট চিংড়ি পণ্য পৌছানারে ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।

ঙ) দেশে ও বিদেশে মেলা বা প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে।

চ) স্বাস্থ্যসম্মত চিংড়ি পণ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা না গেলে কোনো প্রচারই কাজে লাগবে না, বরং তাতে অহেতুক বাড়তি খরচ হবে।

হ্যাসাপ (HACCP) ভিত্তিক মৎস্য ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প কারখানার মান নিয়ন্ত্রণে গুরুত্ব

গত এক দশকে ইউরোপডীয়ান দেশসমূহে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে চিংড়ি রপ্তানি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রপ্তানিকৃত মৎস্যজাত খাদ্যের প্রধান শর্ত হলো গুণগত মানসম্পন্ন হওয়া। ১৯৯০ এর শুরুতে হ্যাসাপ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চিংড়িজাত খাদ্যের মান উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৯১ সালের ২২ জুলাই ইউরোপডীয়ান ইউনিয়ন কমিউনিটি (EUC) একটি আইন জারীর মাধ্যমে শর্ত আরোপ করে যে ইউরোপডীয় দেশে মৎস্যজাত খাদ্য প্রবেশ করার পূর্বে সেটি স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে। আর্টিকেল ৩-এ হ্যাসাপ (Hazard Analysis Critical Control Point) এর ভিত্তিতে খাদ্যের জৈবিক এবং ভৌত রাসায়নিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে মৎস্যজাত খাদ্য জীবাণুমুক্ত করতে হবে। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে মৎস্যজাত খাদ্যে যে জীবাণুগত সমস্যা এবং নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে তা মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্যসামগ্রী বিশ্বে বাজারজাত করা সহজ হবে। এই হ্যাসাপ পদ্ধতি প্রায় ১০০ ভাগ খাদ্যসামগ্রীকে অণুজীবঘটিত রোগের সংক্রমণ থেকে রাধে করা সম্ভব। বিভিন্ন তথ্য য বিশ্বের মোট খাদ্য উৎপাদনের শতকরা ৫ ভাগ খাদ্য ভাক্তোদের কাছে পৌছার আগেই নষ্ট হয়ে যায়। এই প্রেক্ষিতে সুদীর্ঘ গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা একমত পাষেণ করেন যে, খাদ্য উৎপাদনের উৎসস্থল থেকে। সকল কারণে খাদ্য সংক্রমিত হচ্ছে তা নিরীক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভাক্তোদের নিরাপদ স্বাস্থ্য এবং সুন্দর জীবন উপহার দেয়া সম্ভব।

চিংড়ির উত্তম ব্যবস্থাপনা

খাদ্য যাতে স্বাস্থ্যের প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ না হয় এবং খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে প্রক্রিয়াজাতকরণ সংস্থা হ্যাসাপ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে গুণগতমান উন্নয়ন করে থাকে। ভালো প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি বা এগচ (Good Manufacturing Practice) এর মাধ্যমে গুণগতমান সম্পন্ন খাদ্য ভোক্তার কাছে গ্রহণযোগ্যতার জন্য প্রয়োজন হয়। এগচ এর অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করে বাস্তবায়ন করতে হয় যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে পণ্যসামগ্রী ভোক্তার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। আবার কার্যকর বা ফলপ্রসূ বলতে আমরা বুঝি পণ্যসামগ্রী স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু অণুজীব কণা খাদ্যে থেকেও যেতে পারে যা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব নয়।

২০২২

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা এফডিএ (FDA- Food & Drug Administration) এর নীতিমালা অনুযায়ী ভালো প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি বা এগচ প্রধানত চার তরে বিভক্ত, যথা—

ক) সাধারণ যোগান বা সংস্কন ,

খ) নির্মাণ ভবন ও সুযোগ সুবিধাদি,

গ) যন্ত্রপাতি, এবং

ঘ) পণ্যসামগ্রীর প্রক্রিয়াজাতকরণ ও নিয়ন্ত্রণ

ক. সাধারণ যোগান বা সংস্থান

নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা সাধারণ যাগোনের আওতায় পড়ে। যদি কোনো শ্রমিক বা কর্মচারী কিংবা কর্মকর্তার দেহে ক্ষত কিংবা সংক্রমণ দেখা দেয় তাহলে তাকে প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজ থেকে বিরত রাখা উচিত। প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অত্যাবশ্যক। পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক শিক্ষাদানের মাধ্যমে কারখানার মান উন্নয়ন করা যায়।

খ. নির্মাণ ভবন ও সুযোগ সুবিধাদি

প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত যাতে কীটপতঙ্গা, ইদুর ও অন্যান্য অণুজীবদ্বারা সংক্রমণ না ঘটে ও কাজ করার জন্য খোলামেলা প্রশমত জায়গা আবশ্যক। এছাড়া পানি, বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন ব্যবস্থা, টয়লেট এবং হাত ধোয়ার জন্য সুযোগ-সুবিধা থাকা উচিত।

গ. যন্ত্রপাতি

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা এমনভাবে তৈরি করা উচিত যেন তেল, জ্বালানী বা ধাতুকণাদ্বারা খাদ্যদ্রব্যে সংমিশ্রণ না ঘটে এবং যন্ত্রপাতি সহজভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়।

ঘ. পণ্যসামগ্রীর প্রক্রিয়াকরণ ও নিয়ন্ত্রণ

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে এবং কাঁচামাল গুদামজাত করা, সংরক্ষিত এলাকায় বহিরাগতদের প্রবেশ নিষেধ করা এবং যন্ত্রপাতি ও প্যাকেজ সামগ্রীতে যাতে দূষণ না ঘটে এসব বিষয়ে সর্তকতা থাকা। রপ্তানির জন্য উপযোগী। পণ্যসামগ্রী গুদামজাত এবং পরিবহনের সময় যাতে দূষণ না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। মাননিয়ন্ত্রণ এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত সামগ্রীর গুণগত মান বজায় রাখা অপরিহার্য।

হাসাপ-এর ব্যাখ্যা

হ্যাসাপ হলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি বিধি-বিধান, যা কোনো খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ, বিপণন ইত্তাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে হবে। বিগত ১৯৯৭ সালে হ্যাসাপ এর বিধি-বিধান মানা শুধুমাত্র চিংড়ি উৎপাদনকারীদের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানের যুক্তরাষ্ট্রের এফডিএ ও ইউরোপডীয় ইউনিয়নের নীতিমালা অনুসারে চিংড়ি পণ্যের উৎস অর্থাৎ লার্জি থেকে শুরু করে ভোক্তার নিকট পৌছানারে পূর্ব পর্যন্ত সকল তরে হ্যাসাপের বিধি বিধান মেনে চলা বাধ্যতামূলক।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট হ্যাসাপ

বাংলাদেশের মূল্য সংযাজিত চিংড়ি পণ্যের প্রধান ক্রেতা হলো যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো। এ সকল দেশের মূল্য সংযাজিত চিংড়ি পণ্য আমদানির প্রধান শর্ত হচ্ছে পণ্য উৎপাদনের সর্বস্তরে হ্যাসাপ-এর বিধিবিধান বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলা। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপডীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে রপ্তানির উদ্দেশ্যে রপ্তানিকারক চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকারী কারখানাগুলোতে হ্যাসাপ বিধি-বিধান মানা হচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমানে সর্বমোট ১৩৩ টি চিংড়ি ও মাছ প্রক্রিয়াজাতকারী কারখানার মধ্যে সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে মাত্র ৬০টি কারখানা এবং ৫৩টি ইউরোপডীয় ইউনিয়ন কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়েছে।

শ্রিম্প সিল অব কোয়ালিটি (SSOQ)

এসএসওকিউ (SSOQ, Shrimp Seal Of Quality) যুক্তরাষ্ট্রের Aquaculture Certification Council কর্তৃক প্রবর্তিত হ্যাসাপ-এর অনুরূপ বিধি বিধান যা শুধুমাত্র চিংড়ির জন্য প্রযোজ্য। এই বিধিবিধান যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে তেমন একটা প্রসার লাভ করেনি। বাংলাদেশে এটিডিপি (Agrobased:echnology Development Program) কর্মসূচির মাধ্যমে মূলত বিগত ২০০৪ সালে থেকে এসএসকিউ প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

হ্যাসাপ ও শ্রিম্প সিল অব কোয়ালিটি-এর প্রধান দিকসমূহ

হ্যাসাপ ও শ্রিম্প সিল অব কোয়ালিটি-এর প্রধান দিকগুলো হল মানুষ বা অন্য কোনো জীব বা সামগ্রিকভাবে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে এমন কোনো ক্ষতিকারক উপাদান বা কার্যক্রম প্রতিহত করা বা সম্ভব না হলে যতদূর সম্ভব কমাননা। যে সকল উপাদান বা কার্যক্রম ক্ষতির কারণ হতে পারে তাদেরকে হ্যাজার্ড বলে। হ্যাজার্ডসমূহকে নিয়ন্ত্রণের জন্যই সকল বিধি-বিধান আরোপ করা হয়েছে। হ্যাজার্ডসমূহকে প্রধানত নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়—

ক) জৈবিক হ্যাজার্ড: ক্ষতিকারক অনুজীবসমূহ, যেমন- রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া।

খ) রাসায়নিক হ্যাজাড: ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থসমূহ, যেমন- এন্টিবায়াটিক।

গ) ফিজিক্যাল হ্যাজাড: ক্ষতিকারক কোনো বস্তু, যেমন- আলপিন।

ঘ) পরিবেশগত হ্যাজার্ড: পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক কার্যক্রম, যেমন- ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে চিংড়ি চাষ।

ক. জৈবিক হ্যাজার্ড

ক্ষতিকারক অণুজীব, বিশেষ করে মানুষের রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য অণুজীবের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই মূলত প্রাথমিকভাবেই হ্যাসাপের প্রবর্তন করা হয়েছিল। পরিবর্তীতে আরও অন্যান্য দিক সংযাজিত হয়ে হ্যাসাপের কলেবর উত্তরাত্তের বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এখন পর্যত জৈবিক হ্যাজার্ড সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। জৈবিক হ্যাজার্ড আবার বিভিন্ন পণ্যের জন্য বিভিন্ন হয়ে থাকে। হিমায়িত পণ্যের জন্য এক রকম, কৌটাজাত পণ্যের জন্য অন্য রকম বা রেডি-টু-ইট পণ্যের জন্য সেটা ভিন্ন রকম। চিংড়ি বা মাছের পরজীবী, যথা: নেমাটোডস (গোল কৃমি), সেসটোডস (ফিতা কৃমি), ট্রেমাটোডস (ফুকস), ইত্যাদির উপস্থিতও এক ধরনের জৈবিক হ্যাজার্ড।

খ. রাসায়নিক হ্যাজার্ড

ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ, যেমন- অ্যান্টিবায়োটিক ও কীটনাশকই বাংলাদেশি মৎস্য পণ্যের জন্য বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা। কিছু কিছু ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ উচ্চ তাপমাত্রায় মাছ বা চিংড়ির দেহ পচনের ফলে তৈরি হয়। ঐ সমস্ত রাসায়নিক পদার্থকে কমব্রো টক্সিন বা হিসটামিন ফরমেশন বলে, ফলে ঐ সমস্ত চিংড়ি বা মাছ খেলে এলার্জিজনিত কারণে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক সাধারণত প্রক্রিয়াজাত-কারীরা ব্যবহার করেন না। এন্টিবায়াটেক সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় হ্যাচারি ও চিংড়ি চাষের খামারে। মাছের ট্রলার থেকে চিংড়ি আহরণ করে পান্টে আনার সময় রাসায়নিক দ্রব্য কিংবা ডিজেলের মিশ্রণের ফলেও চিংড়ির মান ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

গ. ফিজিক্যাল হ্যাজার্ড

ক্ষতিকারক কোনো বস্তু, যেমন - আলপিন, পেরেক, কাচের ভাঙা টুকরা ইত্যাদি হ্যাজার্ডকে ফিজিক্যাল হ্যাজার্ড বলে। প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে এ সমস্ত ক্ষমিকারক বতুও সংমিশ্রণের সম্ভাবনা থাকে।

ঘ. পরিবেশগত হ্যাজার্ড

পরিবেশের জানা ক্ষতিকারক বস্তু বা কার্যক্রম, যেমন- ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে চিংড়ি চাষ বা মাছ চাষ, কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পানির দূষণ ইত্যাদি হ্যাজার্ডকে পরিবেশগত হ্যাজার্ড বলে।

চিংড়ি দূষণের উৎস শনাক্তকরণ

নিম্নলিখিত উৎস থেকে চিংড়িতে দূষণ হতে পারে-

ক) সংক্রমণযুক্ত মা চিংড়ির ব্যবহার।

খ) সংক্রমণযুক্ত সার্ভিপিএল ব্যবহার।

গ) চাষের জলাশয় বা তার আশপাশের পরিবেশ থেকে সংক্রমণ।

ঘ) চিংড়ি চাষের সময় খাদ্য/ঔষধ ইত্যাদি থেকে সংক্রমণ।

ঙ) চিংড়ি আহরণের ও বাজারজাতকরণের যে কোনো পর্যায়ে সংক্রমণ।

চিংড়ির দূষণের উৎস থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়

ক) কোনো প্রকার ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ বা অণুজীবদ্বারা সংক্রমিত হলে সেই মা-চিংড়ি কোনো অবস্থাতেই চিংড়ির পোনা তৈরির জন্য হ্যাচারিতে ব্যবহার করা চলবে না।

খ) হ্যাচারিতে ব্যবহারের জন্য এমন মা-চিংড়ি ব্যবহার করতে হবে যাহা নিশ্চিতভাবে কোনো ক্ষতিকর রাসায়নিক বা অণুজীবদ্বারা সংক্রমিত নয়।

গ) চিংড়ি চাষের জন্য ব্যবহৃত সার্ভিপিএল অবশ্যই সর্বপ্রকার ক্ষতিকর রাসায়নিক বা অণুজীবদ্বারা কোনো পর্যায়ে সংক্রমিত নয় তা নিশ্চিতভাবে হতে হবে।

ঘ) চিংড়ি চাষের জন্য পিএল নির্বাচনের পূর্বে নিশ্চিতভাবে পিসিআর পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে হবে যে, চাষের জন্য নির্ধারিত পিএল সর্বপ্রকার ভাইরাসমুক্ত।

ঙ) চিংড়ি চাষ করতে গিয়ে তার আশেপাশের কোনো জলাশয়কে বা পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং আশেপাশের জলাশয় বা পরিবেশ থেকে কোনো ক্ষতিকর বস্তু চিংড়ি চাষের জলাশয়ে প্রবেশ রাধে করতে হবে।

চ) চিংড়ি চাষের জলাশয় থেকে বা তার আশপাশের পরিবেশ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরাক্ষেভাবে কোনো ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ বা অণুজীবদ্বারা সংক্রমিত নয় সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ২০২২

ছ) চাষের সময়ে চিংড়িকে যে খাদ্য দেয়া হয় বা যে ঔষধ প্রয়োগ করা হয় তা থেকেও চিংড়িতে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ বা অণুজীব সংক্রমিত হতে পারে। সেজন্য চিংড়ি চাষের সময় খাদ্য/ঔষধ, ইত্যাদি থেকে প্রত্যক্ষ বা পরাক্ষেভাবে কোনো ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ বা অণুজীবদ্বারা সংক্রমিত নয় সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

জ) চিংড়ি চাষের পর আহরণের ও বাজারজাতকরণের সময়েও বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ বা অণুজীবদ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। সেজন্য চিংড়ি আহরণের ও বাজারজাতকরণের কোনো পর্যায়ে প্রত্যেক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ বা অণুজীবদ্বারা সংক্রমিত নয় সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

হ্যাচারি ও চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থসমূহ

১. মিথিলিন ব্লু (Metheline blue)।
২. ট্রাফলান (Treflan)
৩. প্রোটোজোয়াসাইড (Protozoacide)
৪. ফরমালিন (Formalin)
৫. জুথামনিসাইড (Zoothamnicide)
৬. ব্লিচিং পাউডার (Bleaching powder)
৭. কপার সালফেট (Copper sulfate)
৮. ম্যালাকাইট গ্রিন (Malachite green), ইত্যাদি

হ্যাচারিতে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকসমূহ

১. সিপরাফ্লোক্সাসিন (Ciprofloxacin)
২. স্ট্রেপটোমাইসিন (Streptomycin)
৩. কেনামাইসিন (Kenamycin)
৪. ইরাইথ্রোমাইসিন (Erythromycin)
৫. অক্সিটেট্রাসাইক্লিন (Oxytetracyclin)
৬. অক্সোলিনিক অ্যাসিড (Oxolinic acid)
৭. অ্যালবাজিন (Albazin)

নিষিদ্ধ অ্যান্টিবায়োটিকসমূহ

১. ক্লোরামফেনিকল (Chloramphenicol)
২. নিওমাইসিন (Neomycin)
৩. নাইট্রোফুরান (Nitrofuran)
৪. ফিউরাজলিডন (Furazolidon)

কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিকসমূহ

২০২২ Erythromycin, Ciprofloxacin etc.

অকার্যকর অ্যান্টিবায়োটিকসমূহ

Chloramphenicol, Nalidixic acid, Ampicillin, Amoxicillin, Kanamycin, Neomycin, etc.

নিষিদ্ধ অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার ও জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাবসমূহ

ক) মানবদেহে নানা রকম ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে পৃথিবীর অনেক দেশে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার কমে গেছে, অনেক অ্যান্টিবায়োটিক নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

খ) কেবলমাত্র প্রয়োজন হলেই চিংড়ি রোগ সৃষ্টিকারী নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা উচিত।

গ) প্রায়শই দেখা যায় যে, সমস্যা সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত না করেই এবং কোনো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক সেনসিটিভিটি (sensitivity) পরীক্ষা ছাড়াই এন্টিবায়াটেক ব্যবহার করা হচ্ছে।

ঘ) অ্যান্টিবায়োটিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের কারণে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতি রেজিস্ট্যান্স (resistance) সৃষ্টি হচ্ছে। অ্যান্টিবায়োটিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার হ্যাচারি কর্মীদের স্বাস্থ্যগত ক্ষতিরও কারণ হচ্ছে, মানবদেহেও ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স তৈরি হচ্ছে।

জলজ জীবের উপর ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ

ক) হ্যাচারি ও চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থের বর্জ্য জলজ পরিবেশ ও সমুদ্রে যায়, যা পানি দূষণ সৃষ্টি করে থাকে।

খ) পানি দূষণের মাধ্যমে জলজ অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও প্রজনন মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে, এমনকি মৃত্যুরও কারণ হতে পারে।

চিংড়ি রপ্তানি ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ

ক) চিংড়ি উৎপাদনের কোন পর্যায়ে নিষিদ্ধ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে এবং চিংড়ির মাংস পেশীতে অ্যান্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ (resedue) থাকলে সেই চিংড়ি পণ্য রপ্তানি করা যাবে না।

খ) আমদানিকারক বিভিন্ন দেশ থেকে এ অসাবধানতার কারণে প্রায়ই চিংড়ি কন্টেইনার দেশে ফেরত আসে।

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. ক্লোরাম ফেনিকল কোন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ?

২. ইবাইথ্রোমাইসিন কোন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক?

৩. একটি জৈবিক হ্যাজার্ডের নাম লিখ ।

৪. একটি ফিজিক্যাল হ্যাজার্ডের নাম লিখ ।

৫. SSOQ এর পূর্ণরূপ কি?

৬. HACCP- এর পূর্ণরূপ কি?

৭. বাংলাদেশের বর্তমানে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা কয়টি?

৮. FDA এর পূর্ণরুপ কি?

৯. রাসায়নিক হ্যাজার্ড মুলত কি কি?

১০. মাছ/চিংড়ি কত তাপমাত্রায় হিমায়িত করা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ।

১. পচন ক্রিয়ায় মাছ/চিংড়ির কোন কোন গুণাবলি নষ্ট হয় ?

২. মাছ/চিংড়ির পচন কী কী ভাবে সংঘটিত হয় ?

৩. মাছ/চিংড়ির পচন রাধে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর নাম লিখ ?

৪. মাছ/চিংড়ির দেহে ব্যাকটেরিয়া স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কার্যকলাপ বন্ধের জন্য গৃহীত কৌশলগুলো লিখ ।

৫. কী কী উপায়ে মাছ/চিংড়ি শীতলীকরণ করা যায় ?

৬. নিম্ন তাপমাত্রায় মাছ চিংড়ি সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ ।

৭. হ্যাসাপ কয়টি নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয় ?

৮.Traceability কি?

৯. কার্যকর এন্টিবায়াটিকসমূহ কি কি উল্লেখ কর ?

১০ ব্যানসিডিটি বলতে কী বাঝে?

১১ দ্রুত হিমায়িতকরণ বলতে কী বাঝে ?

১২. দ্রুত হিমায়িতকরণের সুবিধাগুলো লিখ ।

১৩. বিভিন্ন ধরনের হিমায়ক যন্ত্রগুলোর নাম লিখ ।

১৪. এসএসকিউ সম্পর্কে লিখ ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাছ/চিংড়ি শীতলীকরণের উপায়সমূহ বর্ণনা কর ।

২. স্বাস্থ্যসম্মত ও উন্নত চিংড়ি পণ্য তৈরি ও বাজারজাতের জন্য উন্নত প্যাকেজিং-এর গুরুত্ব বর্ণনা কর ।

৩. চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে হ্যাজার্ডসমূহ বর্ণনা কর ।

২০২২ ৪. হ্যাসাপের মূলনীতিমালা বর্ণনা কর ।

তৃতীয় অধ্যায়

বাগদা চিংড়ির প্রজনন ও হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আধা লোনা বা স্বল্প লোনা পানিতে বাগদা চিংড়ি চাষ হয়। এ অঞ্চলের আবহাওয়া, জলবায়ু ও পানির গুণাবলি বাগদা চিংড়ি চাষের সহায়ক। বাংলাদেশের ৭১০ কিলোমিটার তটরেখার কাছাকাছি বেইজলাইন থেকে সাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত প্রায় ১,৬৬,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বিস্তৃত একানত অর্থনৈতিক অঞ্চলের সামুদ্রিক জলসম্পদ রয়েছে। বাংলাদেশের লোনা পানিতে ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। বাগদা চিংড়ি চাষ লাভজনক বিধায় দিন দিন বাগদা চিংড়ি চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চিংড়ির বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাংলাদেশে সত্তর থেকে আশির দশকের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে চিংড়ি চাষি ও খামার স্থাপনের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সত্তর দশকের শেষের দিকে খুলনা অঞ্চলের সাতক্ষীরা সদর, দেবহাটা, কালীগঞ্জ ও শ্যামনগর উপজেলায় গতানুগতিক পদ্ধতিতে প্রথমে চিংড়ি চাষ শুরু হয়। অধিক লাভজনক শিল্প হিসেবে চিংড়ি সম্পদ স্থানীয় জনসাধারণের কাছে বিবেচিত হওয়ার কারণে ধীরে ধীরে চিংড়ির চাষ যশোর, খুলনা, বাগেরহাট, পিরাজেপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী ও ভালো অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তার লাভ করে। এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় ১৯৮৭ সালে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প বাতবায়নের মাধ্যমে কক্সবাজার এলাকায় প্রথম চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপনসহ ১১ একর বিশিষ্ট ১১৮টি প্রকল্পের একটি চিংড়ি এস্টেট (estate) ও একটি প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে এই হ্যাচারি স্থাপনের মাধ্যমেই প্রথম বাগদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

বাগদা চিংড়ির হ্যাচারি।

হ্যাচারি বিভিন্ন আকারের হতে পারে, যেমন- ছোট, মধ্যম ও বড় আকারের হ্যাচারি। নিচে বিভিন্ন আকারের হ্যাচারির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো

ক. ছোট আকারের হ্যাচারি

এই ধরনের হ্যাচারিকে ব্যাকইয়ার্ড (Backyard/mon-and-pop) হ্যাচারিও বলে। সাধারণত টেকনিক্যাল জনবল ছাড়াই এসব হ্যাচারি পরিচালিত হয়। হ্যাচারিতে ছোট ছোট ট্যাংক (১০ টনের কম) ব্যবহৃত হয়। শুধু পি এবং পিএল উৎপাদনের সময় গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কম ঘনত্বে ব্যবহৃত ও অপরিশোধিত পানি ব্যবহার করা হয়। আবহাওয়া, রোগ-বালাই ও পানিঘটিত কারণে হ্যাচারির উৎপাদন অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায়। পিএল বাঁচার হার প্রায় ০-৯০%। পিএল বাঁচার হার নির্ভর করে হ্যাচারি অপারেটরের দক্ষতা, মজুদ ঘনত্ব তাপমাত্রার উপর। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে এ হ্যাচারি ব্যবহারে সর্বোচ্চ সফলতা পেয়েছে বিশেষ করে থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এবং দক্ষিণ চীন। থাইল্যান্ডে হাজারের অধিক ব্যাকইয়ার্ড হ্যাচারি বিদ্যমান।

খ. মধ্যম আকারের হ্যাচারি

এই হ্যাচারির ডিজাইন জাপানে আবিষ্কৃত হয়েছে। মধ্যম আকারের এই হ্যাচারি তাইওয়ানেও বেশ জনপ্রিয়। এই ধরনের হ্যাচারিকে গ্রিনওয়াটার (Greenwater) হ্যাচারি বলে। এখানে ট্যাংকের আকার অনেক বড়, কম মজুদ ঘনত্ব, কম পানি পরিবর্তন এবং ব্লুম তৈরি হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার ধ্বংশ এবং উপকারী ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধির জন্য অনেক সময় পুষ্টিকর উপাদান বা ব্যাকটেরিয়া যাগে করা হয়। পোনা বাঁচার হার প্রায় ৪০ শতাংশ বা তার কম।

গ. বড় আকারের হ্যাচারি

বড় আকারের হ্যাচারি তৈরিতে কয়েক লক্ষ থেকে কোটি পর্যন্ত টাকা ব্যয় হতে পারে। এই হ্যাচারিতে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সর্বোচ্চ কারিগরি সুবিধা থাকে, যাতে গুণগতমান সম্পন্ন অধিক পোনা উৎপাদন নিশ্চিত হয়। আমেরিকার ন্যাশনাল মেরিন ফিসারিজ সার্ভিস এর গ্যালভেস্টন ল্যাবরেটরি থেকে এ হ্যাচারির প্রচলন হয়েছে বলে জানা যায়। এ হ্যাচারি পরিচালনার জন্য দক্ষ টেকনিশিয়ান দরকার হয়, কারণ এখানে বড় আকারের ট্যাংক (১৫ থেকে ৩০ টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন), পরিস্ফুটিত পানি, সর্বোচ্চ মজুদ ঘনত্ব, সর্বোচ্চ পানি পরিবর্তন হার এবং সারা বছর পোনা উৎপাদনের লক্ষ্য থাকে। এখানে পোনা বাঁচার হার সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত।

বাগদা চিংড়ি হ্যাচারির স্থান নির্বাচন

বাগদা চিংড়ি হ্যাচারির স্থান নির্বাচন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চিংড়ি হ্যাচারি পরিচালনার জন্য যেহেতু লোনা পানির দরকার, তাই সমুদ্রের কাছাকাছি হ্যাচারি নির্মাণ করা উচিত। যোগাযোগের জন্য রাস্তাঘাটের সুব্যবস্থা থাকা উচিত। বাগদা চিংড়ি হ্যাচারির স্থান নির্বাচনের জন্য নিম্নের বিষয়সমূহ বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন:

১. মাদার শ্রিম্প প্রাপ্তির উৎস: বাগদা চিংড়ির হ্যাচারি পরিচালনার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাদার শ্রিম্প। তাই মাদার শ্রিম্প যেখানে পর্যাপ্ত পাওয়া যাবে সেখানে হ্যাচারি স্থাপন করা উচিত।

২. লোনা পানির উৎস: বাগদা চিংড়ি উৎপাদনের জন্য ২৮ - ৩২ পিপিটি লবণাক্ত পানির দরকার হয়, তাই সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানে হ্যাচারি স্থাপন করা উচিত। যাতে সহজে লোনা পানি সরবরাহ করা যায়। বাগদা চিংড়ির পোনা ও মাদার শ্রিম্প প্রতিপালনের জন্য পানির নিম্নোক্ত গুণাগুণ থাকা আবশ্যক:

ক) পানির লবণাক্ততা	= ২৮ - ৩২ পিপিটি
খ) তাপমাত্রা	= ২৮ - ৩১° সে।
গ) পিএইচ	= ৭.৫ - ৮.৫
ঘ) দ্রবীভূত অক্সিজেন	= ৫ পিপিএম এর উপরে।
ঙ) এ্যালকালিনিটি	= ১০০ পিপিএম এর কম ক্যালসিয়াম কার্বনেট
চ) মোট হার্ডনেস	= ৪০ - ১০০ পিপিএম এর কম ক্যালসিয়াম কার্বনেট
ছ) হাইড্রোজেন সালফাইড	= ০.১ পিপিএম এর কম
জ) আন আয়ানোইজড অ্যামোনিয়া	= ০.১ পিপিএম এর কম।
ঝ) নাইট্রাইট	= ০.২৫ পিপিএম এর কম
ঞ) বিওডি	= ১.০০ পিপিএম এর কম
ট) ভারী ধাতু	= ০.০১ পিপিএম এর কম
ঠ) তামা	= ০.১ পিপিএম এর কম।
ড) লাহো	= ০.০১ পিপিএম এর কম
ঢ) দস্তা	= ০.২৫ পিপিএম এর কম
ণ) পারদ	= ০.২৫ পিপিএম এর কম
ত) জিংক	= ০.২৫ পিপিএম
থ) ক্যাডমিয়াম	= ০.১৫ পিপিএম

৩. মিঠা পানির উৎস: হ্যাচারিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ধৌতকরণের জন্য ও অন্যান্য কাজে মিঠা পানির দরকার। এজন্য হ্যাচারি স্থাপনের পূর্বে মিঠা পানির প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

৪. দূষণমুক্ত এলাকা: কলকারখানা ও ট্যানারি হতে বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ পরিশোধন ছাড়া সরাসরি নিক্ষেপের ফলে পানি দূষণের মাত্রা মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চিংড়ির মড়ক ঘটায় তাছাড়া মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ পরিবর্তিত হয়ে চিংড়ির জন্য প্রতিকূল পরিবে-শর সৃষ্টি করে। সুতরাং এ সমস্ত এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন না করাই ভালো।

৫. অতি বৃষ্টিজনিত ঢলমুক্ত এলাকা: অতি বৃষ্টিজনিত ঢলের পানি হ্যাচারির পানির গুণাগুণ যেমন- লবণাক্ততা, অক্সিজেন, পিএইচ ইত্যাদি হঠাৎ পরিবর্তন করে দেয় ফলে চিংড়ির পোনা উৎপাদন মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়।

৬. ভূ-প্রকৃতি: যেখানে হ্যাচারি স্থাপন করা হবে সেখানকার ভূ-প্রকৃতি অবশ্যই জানতে হবে। থানটি হ্যাচারির অবকাঠামো স্থাপনের উপযোগী কিনা শুরুতেই যাচাই করে নিতে হবে, বিশেষ করে মাটির গঠন।

৭. যোগাযোগ ব্যবস্থা: চিংড়ি হ্যাচারির প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ ও স্থানান্তরের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রয়োজন। রাস্তাঘাট ও যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো না হলে চিংড়ি সরবরাহের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিবে। সর্বোপরি বন্যামুক্ত এলাকা চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপনের জন্য উপযোগী স্থান।

৮. বিদ্যুৎ সরবরাহ: চিংড়ি হ্যাচারিতে বিদ্যুৎ থাকা জরুরি। হ্যাচারির স্থান নির্বাচনের সময় বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। বিদ্যুৎ না থাকলে ডিজেল চালিত পাম্পে জ্বালানি খরচ বেশি হয়। হ্যাচারি পরিচালনার জন্য বিদ্যুৎ সবচেয়ে সুবিধাজনক ও সাশ্রয়ী।

৯. দক্ষ জনশক্তি: চিংড়ি হ্যাচারিকে লাভজনক করতে হলে দক্ষ জনশক্তির কোনো বিকল্প নেই। তাই দক্ষ জনশক্তির পর্যাপ্ততা বিবেচনা করে চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপন করা উচিত।

১০. উৎপাদন সামগ্রীর প্রাপ্যতা ও সরবরাহ: এমন জায়গায় চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপন করা উচিত যেখানে খুব কাছাকাছি বাজার আছে এবং সহজেই ঔষধ, যন্ত্রপাতি, মাদার শ্রিম্প, পিএল, ফিড, আর্টিমিয়া, মেরামত সামগ্রী ইত্যাদি পাওয়া যায়। এছাড়া দূরের বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হলে প্রয়োজনীয় পরিবহন ব্যবস্থা থাকা উচিত।

১১. অন্যান্য ফসলের সাথে বিরাধেমুক্ত এলাকা: কৃষি বা অন্য ফসলের সাথে বিরাধেপূর্ণ এলাকায় চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপন করা উচিত নয়। এতে সামাজিক ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকে।

১২. নিরাপত্তা: চিংড়ি হ্যাচারি পরিচালনার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে অনেক সময় হ্যাচারিতে চুরিসহ অন্যান্য ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বাগদা চিংড়ি হ্যাচারির বিভিন্ন অংশের সাথে পরিচিতি

বাগদা চিংড়ি হ্যাচারিতে কৃত্রিমভাবে উচ্চতর প্রযুক্তি প্রয়োগ করে, মাদার শ্রিম্প সম্প্রক্ষণের মাধ্যমে, ডিম থেকে লার্ভা উৎপাদন, লার্ভার লালন পালন, পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করে ও খাদ্য প্রয়োগ করে পিএল উৎপাদন ও বিপণন করা হয়। বাগদা চিংড়ি হ্যাচারিতে মাদার শ্রিম্প ব্যবস্থাপনা থেকে পিএল উৎপাদন পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত অবকাঠামো থাকা খুবই জরুরি।

১. পাম্প হাউজ (Pump house): বাগদা চিংড়ির কৃত্রিম প্রজননের জন্য মূল উপকরণ হচ্ছে লোনা পানি। পাম্প মেশিনের সাহায্যে এই লোনা পানি উত্তোলন করে মজুদ ট্যাংকে মজুদ করা হয় এবং প্রজনন প্রক্রিয়ায় এই পানি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া হ্যাচারিতে লবণাক্ত পানির লবণাক্ততা কমানো ও হ্যাচারির বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ধৌত করার জন্য মিঠা পানির প্রয়োজন হয়। তাই মিঠা পানির সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য আলাদা পাম্প মেশিন ব্যবহার করা হয়।

২. বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা (Electric supply): হ্যাচারিতে অবিরাম বিদ্যুৎ সরবরাহ বিশেষ করে আপদকা-লীন সময়ে বিদ্যৎ সরবরাহের জন্য প্রত্যেকটি হ্যাচারিতে নিজস্ব বিদ্যৎ সরবরাহ ব্যবস্থা থাকা দরকার। এজন্য হ্যাচারির বিদ্যুৎ চাহিদা অনুযায়ী নিজস্ব জেনারেটর থাকা উচিত। এছাড়া হ্যাচারিতে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, যেমনএয়ার বোয়ার পাম্প, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি চালানোর জন্য হ্যাচারিতে অবিরাম বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৩. বায়ু সঞ্চালন পাম্প (Air blower): বায়ু সঞ্চালন (Aeration) ব্যবস্থা হ্যাচারির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাচারিতে প্রজননক্ষম চিংড়ি সংরক্ষণ, জীবত খাবার উৎপাদন, লার্ভার লালন-পালন প্রভৃতি কাজের জন্য শক্তিশালী কৃত্রিম বায়ু সঞ্চালন ব্যবস্থা প্রয়োজন। এসব কাজে দ্রবীভূত অক্সিজেনের চাহিদা মিটাতে বায়ু সঞ্চালন নিশ্চিত করা হয়। বায়ু সঞ্চালনের জন্য রুট বোয়ার, ঘূর্ণায়মান বোয়ার ও কমপ্রেসার ব্যবহার করা যায়। হ্যাচারিতে সাধারণত রুট বোয়ার ব্যবহার করা হয়। হ্যাচারির চাহিদা অনুযায়ী বোয়ারের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। হ্যাচারিতে সাধারণত ৫-১০ অশ্বক্ষমতা সম্পন্ন বোয়ার ব্যবহার করা হয়। ছোট ব্যাসের পিভিসি পাইপদ্বারা প্রতিটি ট্যাংকে সংযাগে দেয়া হয়। প্রত্যেকটি ট্যাংকে বিভিন্ন ব্যাসের পাইপদ্বারা এয়ার স্টোনের মাধ্যমে পানিতে বায়ু সরবরাহ করা হয়।

৪. লোনা পানি মজুদ ট্যাংক (Saline water storage:ank): বাগদা হ্যাচারিতে সামুদ্রিক পানি সরাসরি ব্যবহার করা হয় না। উত্তোলিত লোনা পানি মিশানোর জন্য প্রথমে মজুদ ট্যাংকে উঠানো হয়। মিশানোর পর এই মজুদ পানি হ্যাচারিতে উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয়। হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার ওপর ভিত্তি করে ট্যাংকের আয়তন নির্ধারণ করা হয়।

৫. পরিশ্রুত পানির জলাধার বা ট্যাংক: পানি মজুদের পর বালু ছাকুনি (Stand filtration) ব্যবহার করে পানি পরিশ্রুত করা হয়। এই পরিসুত পানি জলাধারে সংরক্ষণ করে হ্যাচারির বিভিন্ন ট্যাংকে সরবরাহ করা হয়। হ্যাচারিতে পানির চাহিদার ভিত্তিতে এই ট্যাংকের আয়তন নির্ধারণ করা হয়।

৬. পানি দূষণমুক্তকরণ ট্যাংক: ক্লোরিন বা অন্য জীবাণুনাশকদ্বারা পানি জীবাণুমুক্ত করা হয়। এই জীবাণুমুক্ত পানি যান্ত্রিক বা জৈব ফিল্টারে করে এই ট্যাংকে মজুদ করা হয়। এই ট্যাংকের ধারণক্ষমতা ৪-২০ টন হতে পারে।

৭. পরিস্রাবক (Filter): হ্যাচারির উৎপাদন নিশ্চিত করতে পরিসুত ও জীবাণুমুক্ত পানির গুরুত্ব অত্যধিক। পানি পরিসুত করার জন্য হ্যাচারিতে বিভিন্ন ধরনের পরিসুত ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন—

ক) বালি, কংকর ইত্যাদি নির্মিত যান্ত্রিক পরিস্রাবক;

খ) চাপ প্রয়োগকৃত বালি (Presuriszed sand filter)

গ) কার্টিজ পরিস্রাবক

ঘ) ইউভি ফিল্টার

ঙ) কার্বন ফিল্টার ইত্যাদি।

৮. মিঠা পানির জলাধার বা ট্যাংক: বাগদা চিংড়ির লার্ভা প্রতিপালনে মিঠা পানির প্রয়োজন হয় না। তবে লার্ভা পিএল পর্যায়ে পৌঁছালে পানির লবণাক্ততা কমানোর জন্য ও হ্যাচারির বিভিন্ন যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করার জন্য মিঠা পানির প্রয়োজন হয়। তাই হ্যাচারিতে মিঠা পানি মজুদের জন্য ট্যাংক থাকা দরকার এবং মিঠা পানি সরবরাহের আলাদা ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৯. পরিপক্বকরণ ট্যাংক (Maturation:ank): প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র (Breeding ground) থেকে সংগৃহীত চিংড়ি সংগ্রহের সাথে সাথে ডিম ছাড়ার জন্য উপযুক্ত থাকে না। তাই প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র থেকে প্রজননক্ষম পুরুষ ও স্ত্রী বাগদা চিংড়ি সংগ্রহ করে প্রথমে হ্যাচারিতে কংক্রিটের চৌবাচ্চায় রাখা হয়। কংক্রিটের এই চৌবাচ্চাকেই পরিপক্বকরণ ট্যাংক বলা হয়। এখানে পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়িকে শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া বা স্কুইড প্রভৃতির মাংসসহ, গরু বা খাসির কলিজা কুচিকুচি করে কেটে খাদ্য হিসেবে সরবরাহ করে প্রজননক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় চিংড়িকে প্রজননক্ষম করার জন্য স্ত্রী চিংড়ির একটি চক্ষু কেটে অপসারণ করা হয়। এ সময় স্ত্রী ও পুরুষ চিংড়িকে এই ট্যাংকে একত্রে রাখা হয় এবং ট্যাংকের পরিষ্কার পানিতে পর্যাপ্ত বায়ু সরবরাহ করা হয়। এ সময় ট্যাংকটি কালো শীট দিয়ে ঢেকে রাখা হয় যাতে চিংড়ি নিরুপদ্রবে পীড়নবিহীন অবস্থায় থাকতে পারে। এই ট্যাংকের পানি ধারণক্ষমতা ৮ থেকে ১৬ টন হতে পারে এবং পানির গভীরতা ১.২ থেকে ১.৫ মিটার রাখা হয়। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য থার্মোমিটার সেট করে রাখা হয় যাতে খুব সহজেই তাপমাত্রার উঠানামা বুঝা যায়।

১০. প্রজনন ট্যাংক (Breedingtank): পরিপক্বকরণ ট্যাংক থেকে চিংড়িকে প্রজনন ট্যাংকে স্থানান্তর করা হয়। প্রজনন ট্যাংকে চিংড়ি স্থানান্তর করার পূর্বে খোলস পাল্টিয়েছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই ট্যাংকের পানি ধারণক্ষমতা ৫০০ লিটার থেকে ১৫০০ লিটার হয়ে থাকে।

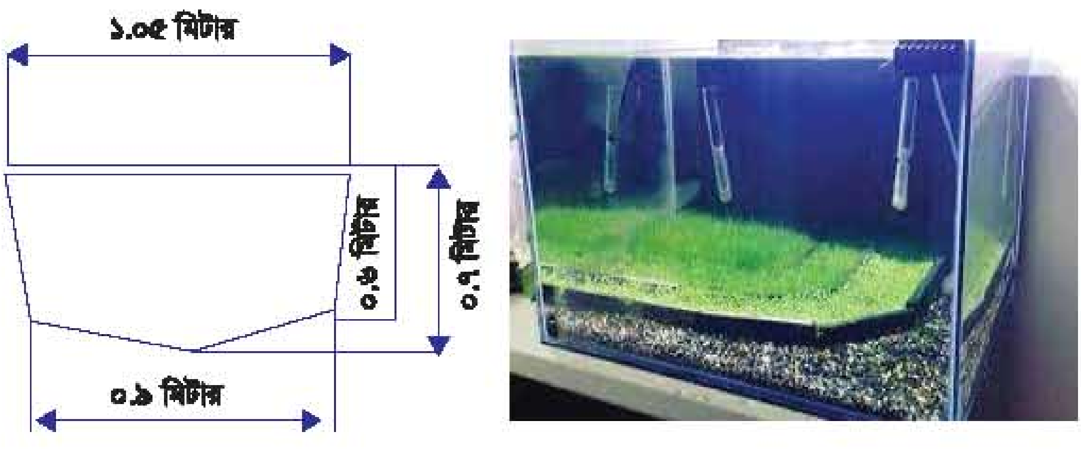

চিত্র: প্রজনন ট্যাংক

১১. লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংক (Larvae rearing:ank): এই ট্যাংক বর্গাকার, গোলাকার বা আয়তকার হয়ে থাকে। এই ট্যাংকে ডিম ফোটার পর অর্থাৎ পি থেকে পিএল-১ পর্যায় পর্যন্ত লার্ভা প্রতিপালন করা হয়। অনেক সময় এই ট্যাংকে পিএল-১ থেকে পিএল ১৫-পর্যন্ত পোনা প্রতিপালন করা হয়। হ্যাচারির পোনা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার ওপর ভিত্তি করে এই ট্যাংকের আকার ও সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। তবে এই ট্যাংকের আয়তন ২ থেকে ১০ টন পর্যন্ত হতে পারে। কোনো কোনো হ্যাচারিতে বিভিন্ন পর্যায়ের লার্ভা প্রতিপালনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ট্যাংক ব্যবহার করা হয়।

চিত্র: লার্ভা পালনের আধুনিক ট্যাংক

১২. প্ল্যাংকটন চাষ ট্যাংক (Plankton culture tank): লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতার ২০% ধারণক্ষমতা সম্পন্ন প্ল্যাংকটন ট্যাংক হ্যাচারিতে রাখা হয়। এ সমস্ত ট্যাংক ফাইবার গ্লাস, পলিথিন, মেরিন পাইউড বা সিমেন্টদ্বারা তৈরি করা যায়। এসব ট্যাংকের ধারণক্ষমতা ১ থেকে ১০ টন হয়ে থাকে। প্ল্যাংকটন ট্যাংক পর্যাপ্ত সূর্যালোকে স্থাপন করা উচিত। বাগদা চিংড়ির পোনা প্রাথমিক পর্যায়ে জীবন্ত খাদ্য খেতে পছন্দ করে। তাই হ্যাচারিতে বিভিন্ন ধরনের প্ল্যাংকটন, যেমন- কিটোসেরাস (Chaetoceros), স্কেলেটোমা (Skeletoma), নেভিকুলা (Nevicola), রোটিফার (Rotifera) প্রভৃতি চাষের জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা রাখা হয়।

১৩. আর্টিমিয়া ট্যাংক: হ্যাচারিতে লার্ভা প্রতিপালনের জন্য খাদ্য হিসেবে আর্টিমিয়া পি ব্যবহার করা হয়। আর্টিমিয়া সিস্ট ফুটানোর জন্য ফাইবার গ্লাস, পিভিসি সিমেন্ট নির্মিত ট্যাংক ব্যবহার করা হয়। এসব ট্যাংক দেখতে অনেকটা কনিকাল আকৃতির এবং ট্যাংকের তলায় আলো সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে আর্টিমিয়া নপ্লি সংগ্রহের বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়। ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে এই ট্যাংকের ধারণক্ষমতা ৩০০ লিটার থেকে ১ টন পর্যন্ত হয়ে থাকে।

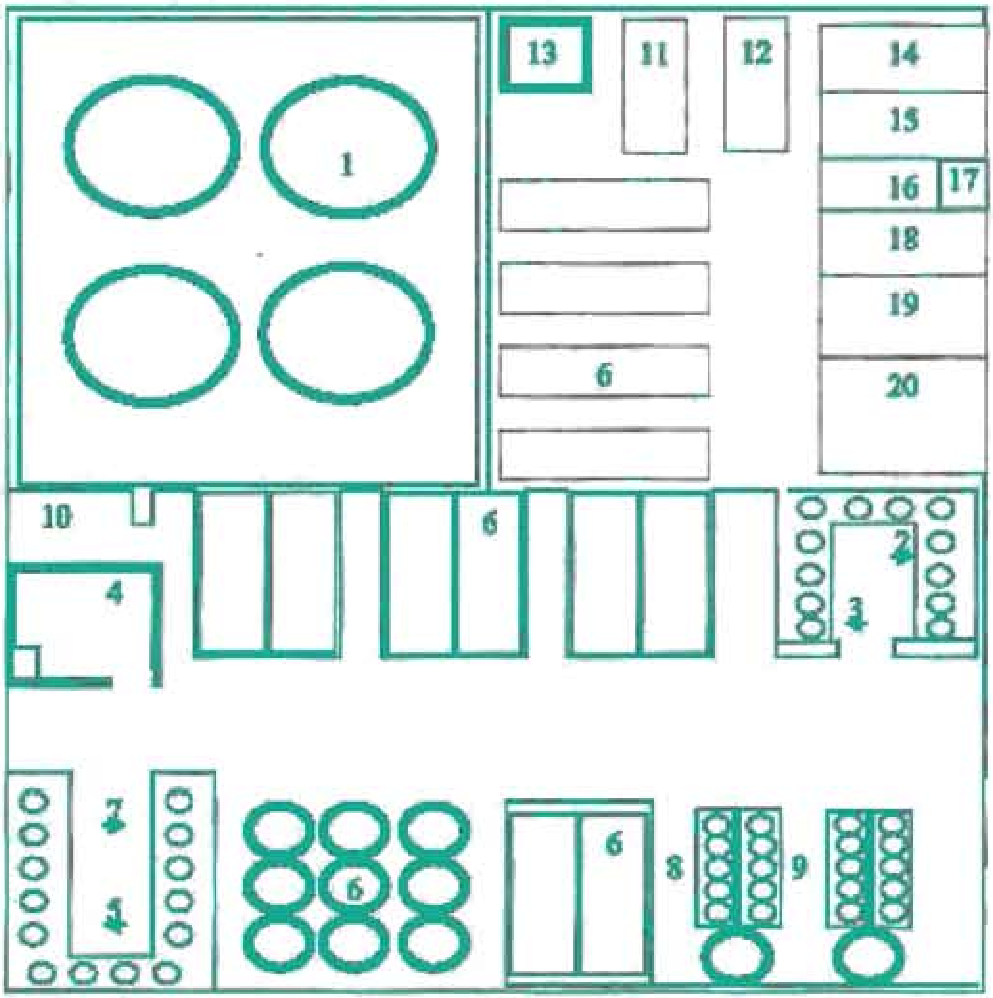

১. ডিম পরিপক্বকরণ ট্যাংক	২. ডিম ছাড়ার ট্যাংক	৩. ডিম ফোটার ট্যাংক
৪. গবেষণাগার	৫. প্ল্যাংকটন লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংক	৭. আর্মিটিয়া ট্যাংক
৮-৯. বায়ো ফিল্টার	১০. স্টোর	১১. জেনারেটর
১২, এয়ার পাম্প হাউজ	১৩. পাম্প	১৪. কাঠ মিস্ত্রির ঘর
১৫. মেশিন রুম	১৬. বাথ রুম	১৭. টয়লেট
১৮. বিশ্রাম ঘর	১৯. খাবার ঘর	২০. অফিস ঘর

চিত্র: বাগদা চিংড়ি হ্যাচারির বিভিন্ন স্থাপনা

হ্যাচারিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি

হ্যাচারিতে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে নিম্নবর্ণিত যন্ত্রপাতিসমূহের প্রয়োজন হয়

১. মাইক্রোস্কোপ (Microscope)

২. ব্যালান্স (Balance)

৩. ক্যাথেটার (Catheter)

৪. মেজেনাইজার (Tissue Homogeniser)

৫. সেন্ট্রিফিউজ (Centrifuge)

৬. সিরিঞ্জ (Syringe) ।

৭. ডিসেন্টিং বক্স (Dissecting box)

৮. থার্মোমিটার (Thermometer)

৯. রিফ্রাক্টোমিটার (Refractometer)

১০. পিএইচ মিটার (pH meter)

১১. ডিও মিটার (Dissoved Oxygen meter)

১২.রেফ্রিজারেটর (Refrigerator)

১৩. ডিপ ফ্রিজার (Deep Freezer)

১৪. এয়ারেটর (Aerator)

১৫. জেনারেটর (Genarator)

১৬. বৈদ্যুতিক চুলা (Electric heater)

১৭. অক্সিজেন সিলিন্ডার (Oxygen cylinder)

১৮. সেক্কি ডিস্ক (Secci disk)

১৯. প্ল্যাংকটন গণনাকারী এসআর সেল (Plankton counting S.R, cell)

২০.ট্রলি/পিক আপ

২১. হেক করাত (Hack saw)

২২. বেন্ডার (Blender)

২৩. ডেসিকেটর (Desiecator)

২৪. হ্যাককীট (Hack kit)

২৫. ক্যালকুলেটর

২৬. কম্পিউটার

২৭. আগুন নিভানারে যন্ত্র

২৮, হাত জাল ।

২৯. বিভিন্ন মেসের 'জাল

৩০. আসবাবপত্র

৩১. অফিস সরঞ্জামাদি

এছাড়াও ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, যেমন- বিকার, কনিকেল ফ্লাস্ক, বিভিন্ন ধরনের পেট্রিডিস, ওয়াচ গাস, ম্যাগনিফাইং গাস, টেস্টটিউব, পিপেট, ডিসেকশন টুল ইত্যাদি থাকা আবশ্যক ।

খাদ্য ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি

হ্যাচারিতে উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য নিম্নবর্ণিত খাদ্য ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির সার্বক্ষণিকভাবে থাকা একান্ত প্রয়োজন—

১. আর্টিমিয়া	২. প্ল্যাংকটন বীজ	৩. প্ল্যাংকটন উৎপাদক সারসমূহ
৪. আর্টিমিয়া ফ্লেক	৫. এনক্যাপসুল ফিড	৬. স্পিরুলিনা ফিড
৭. ব্লিচিং পাউডার	৮. ফরমালিন	৯. পটাসিয়াম-পার-ম্যাঙ্গানেট
১০. ট্রাফলিন	১১. ম্যালাকাইট গ্রিন	১২. আয়াডিন পলিমার
১৩. এ-৩০ জু'মসাইড	১৪. গটার এডিহাইড	১৫. ইডিটিএ
১৬. সোডিয়াম থায়োসালফেট	১৭. অ্যান্টিবায়োটিকস	১৮. আর্টিফিশিয়াল প্ল্যাংকটন ইত্যাদি

হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন কার্যক্রম

মাদার শ্রিম্প প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগ্রহ করে হ্যাচারিতে এনে ১০ পিপিএম ফরমালিন বা ২৫-৫০ পিপিএম পটাসিয়াম-পার-ম্যাঙ্গানেটের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করে ব্রিডিং গ্রাউন্ডে ৩-৪ দিন পরিচর্যা করা হয়। এ সময় পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়ি আলাদা রাখা হয় এবং এ সময় অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে শামুক, ঝিনুক, কুইড বা কাকড়ার মাংসসহ, গরু বা খাসির কলিজা সরবরাহ করা হয়। এরপর পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়িকে ১:১ অনুপাতে পরিপক্ককরণ ট্যাংকে মজুদ করা হয়। পরিপকরণ ট্যাংকের প্রতি বর্গমিটারে ৩০০-৪০০ গ্রাম চিংড়ি মজুদ করা যায়।

প্রজননের জন্য চিংড়ি বাছাই

পরিপকরণ ট্যাংকে ৭-৮ দিন রাখার পর সন্ধ্যায় পানি কমিয়ে স্ত্রী চিংড়ি পরীক্ষা করা হয়। এই পর্যায়ে চিংড়ি যৌন পরিপক্বতা (Sexual maturity) লাভ করে। পরিপক্ক পুরুষ চিংড়ির পঞ্চম চলনপদের গোড়ায় পুংজনন ছিদ্রে শুক্রকীটের মাড়েক (Spermatophores) দেখা যায়। পরিপক্ব স্ত্রী চিংড়ির ডিম্বকোষের উন্নতি বাইরে থেকে দেখা যায়। স্ত্রী চিংড়ির ডিম্বাশয়ের আকার ও রং এবং ডিম্বাণুর মাপের ওপর নির্ভর করে ডিম্বাশয়ের পূর্ণতা। পরিপক্ব স্ত্রী চিংড়ির ডিম্বাশয়কে ৫টি দশায় ভাগ করা যায়, যথা:

ক) প্রথম দশা (Immature stage): এই অবস্থায় ডিম্বাশয় খুব পাতলা, স্বচ্ছ এবং পিঠের খোলসের ভিতর দিয়ে প্রায় দেখা যায় না। এই সময় ডিম্বাণু খুব ছোট থাকে এবং ঋড়ষষরপষব পবষষ এর স্তরে ঢাকা থাকে।

খ) দ্বিতীয় দশা (Early developing stage): এই অবস্থায় ডিম্বাশয় এর কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ডিম্বাশয় ঢলঢলে এবং সাদা থেকে ফিকে জলপাই রঙের একটি লম্বা ফিতার মতো পৃষ্ঠদেশে খোলসের নিচে দেখা যায়।

গ) তৃতীয় দশা (Nearly ripe stage): বর্ধিত ও হালকা নীল বর্ণের ডিম্বাশয় সহজেই দেখা যায়। এ সময় উদর অঞ্চলের ১ম ভাগে ডিম্বাশয়ের দুই পার্শ্ব একটু বেড়ে কিছুটা ডায়মন্ড বা প্রজাপতির আকার ধারণ করে।

ঘ) চতুর্থ দশা (Ripe stage): গাঢ় সবুজ জলপাই রঙের পরিপক্ক ডিম্বাশয় পরিষ্কার দেখা যায়। এ সময় উদর অঞ্চলের ১ম ডিম্বাশয় পরিপূর্ণ ডায়মন্ড বা প্রজাপতির আকার ধারণ করে।

ঙ) পঞ্চম দশা: এই অবস্থায় ডিম ছাড়ার পর ডিম্বাশয় প্রায় প্রথম দশার মতো দেখায়। তবে আংশিক ডিম ছাড়লে দ্বিতীয় দশার মতো দেখায়। একটি পরিপক্ক স্ত্রী চিংড়ি বৎসরে প্রায় ৩.০০-৭.৭৫ লক্ষ ডিম ধারণ করে থাকে।

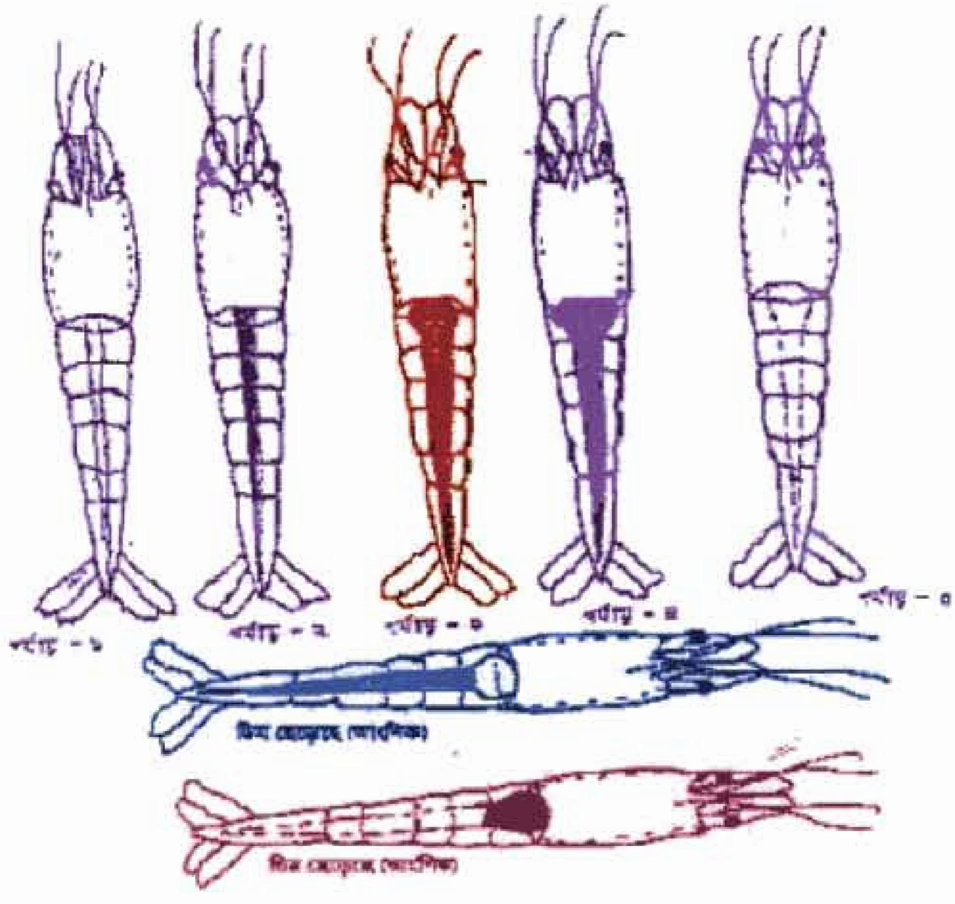

চিত্র: স্ত্রী চিংড়ির ডিম্বাশয়ের পরিপক্কতার বিভিন্ন পর্যায়

বাগদা চিংড়ির প্রজনন ক্রিয়া সাধারণত গভীর সমুদ্রে, রাত্রিকালেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। বাগদা চিংড়ির মিলনকাল ৩ থেকে ৪ মিনিট স্থায়ী হয়। প্রথমে পুরুষ চিংড়ির উপর সমান্তরালভাবে স্ত্রী চিংড়ি অবস্থান গ্রহণ করে। এরপর পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়ি একে অপরকে অঙ্কীয় দেশে আঁকড়িয়ে ধরে এবং পুরুষ চিংড়ি স্ত্রী চিংড়ির দেহের নিচে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে। অবশেষে পুরুষ চিংড়ি দেহের উদরের অংশ বাকিয়ে স্ত্রী চিংড়ির দেহের মাঝখানে "ট" আকৃতির বেষ্টনী তৈরি করে।

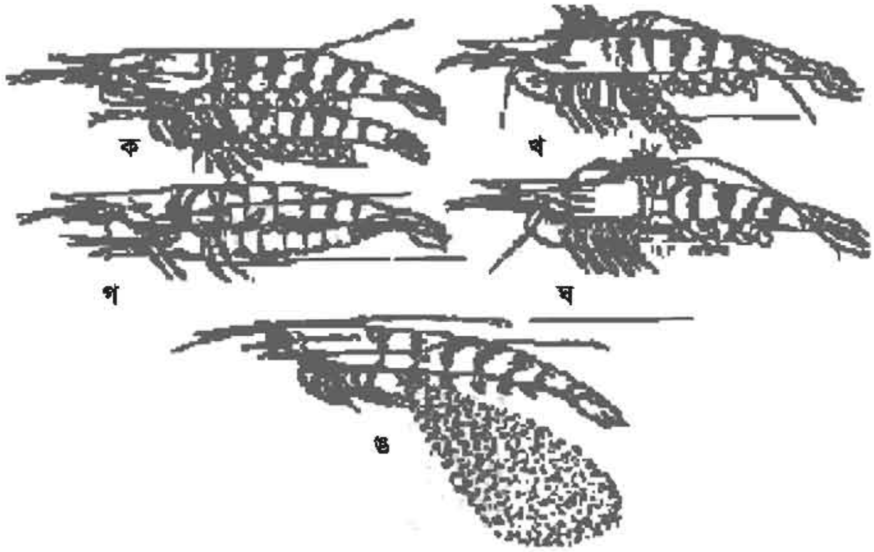

(ক) প্রথম ধাপ, খ) দ্বিতীয় ধাপ, (গ +ঘ) তৃতীয় ধাপ ও ঙ) স্পনিং

চিত্রঃ বাগদা চিংড়ির মিলন ক্রিয়া

ডিম ছাড়া ও ডিম ফুটানো

স্ত্রী বাগদা সাধারণত গভীর রাতে ডিম ছাড়ে। ধরে নেয়া হয় রাত ১-২ টার মধ্যে ডিম ছাড়ে, অথবা তার আগে। তাই সন্ধ্যায় পরিপক্ব স্ত্রী চিংড়ি বাছাই করতে হবে। বাছাইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিধায় দক্ষ টেকনিশিয়ান দ্বারা বাছাই করা উচিত। বাছাই এর সময় চিংড়িকে চিৎ করে ধরে নিচে টর্চ লাইট ধরলে পরিপক্বতা বাঝা যাবে এবং খুব সূক্ষ্মভাবে নির্বাচন করতে হবে। একটি স্পনিং ট্যাংকে একটি চিংড়ি রাখা ভালো অথবা ৩০০ লিটার ট্যাংকে ২-৩ টি চিংড়ি মজুদ করে পর্যাপ্ত বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা করতে হবে। পানির লবণাক্ততা ২৮-৩২ পিপিটি ও তাপমাত্রা ৩০° সে এর কাছাকাছি রাখতে হবে। এজন্য ওয়াটার হিটার ও থার্মোমিটার ট্যাংকে সংযুক্ত রাখতে হবে। রাত তিনটার পর চেক করতে হবে, ডিম ছেড়ে দিলে উক্ত ডিমগুলোকে লার্ভা প্রতিফলন ট্যাংকে স্থানান্তর করতে হবে এবং পুরোদমে বায়ু সঞ্চালন করতে হবে। আধ ঘন্টা পর পর নাড়ুনী দিয়ে পানিকে নাড়িয়ে দিতে হবে। কারণ বাগদার ডিম আঠালো হওয়ার জন্য একটা ডিমের সাথে অন্য একটা ডিম লেগে যেতে পারে। ডিম ফুটতে সময় লাগে ১২ ১৫ ঘন্টা।

ডিম

ডিমগুলো আকারে খুব ছোট। ডিম ফোটার ঠিক আগে পরিণত নপ্লিয়াসকে ডিমের মধ্যে নড়াচড়া করতে দেখা যায়। ডিমের জ্বণে বিভাজন শুরু হয় প্রথমে ২ কোষ, পরে ৪ কোষ, মরুলা এবং শেষে নাপ্লিয়াস ধাপে পৌছায়। ডিম পাড়ার আধ ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার মধ্যে নিষিক্ত ডিমের মধ্যে ভ্রূণ দেখা যায়। প্রতিটি ধাপে আসতে সময় লাগে প্রায় ০.৫, ১.০, ১.৮ এবং ১১.০ ঘন্টা।

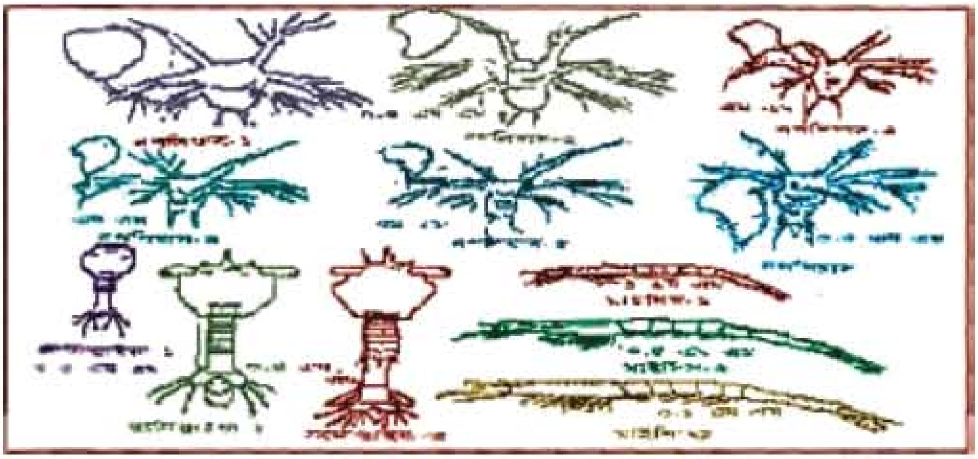

প্রথম ধাপ— নাপ্লিয়াস (১-৬), দ্বিতীয় ধাপ— প্রোটোজুইয়া (১-৩), তৃতীয় ধাপ— মাইসিস ১-৩
চিত্রঃ বাগদা চিংড়ির লার্ভার ক্রমবৃদ্ধির চিত্র

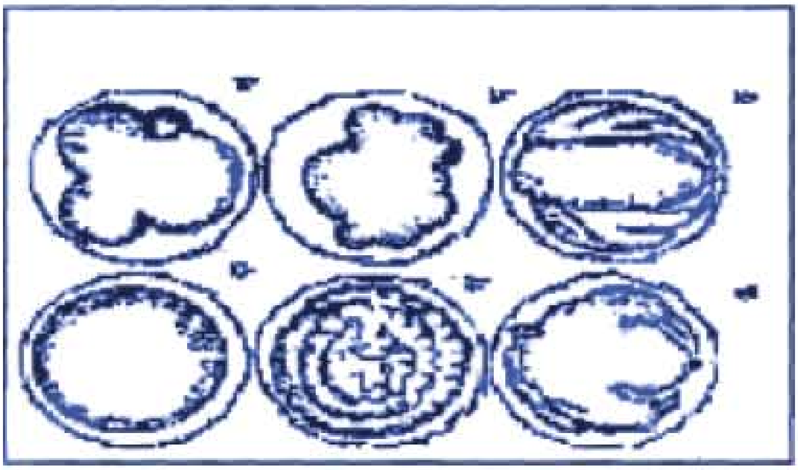

ক. প্রথম নির্গমন ডিম, খ. চার কোষ ধাপ (স্পনিং হওয়ার এক ঘন্টা পর), গ. মরুলা । ধাপ (পনিং হওয়ার পর প্রায় দুই ঘন্টা পর), ঘ. ভ্রূণে নপ্লিয়াসের প্রাথমিক অবস্থা, ঙ. ভ্রূণে নপ্লিয়াসের পূর্ণাঙ্গ অবস্থা ও চ. ডিম ফুটার আগে ভ্রূণে নপ্লিয়াসের অবস্থা ।

চিত্রঃ বাগদা চিংড়ির ডিম পরিস্ফুটনের ধাপ

লার্ভা প্রতিপালন

ডিম ফোটার পর নপির ৬ টি ধাপ, প্রটোজুইয়া ৩ টা ধাপ এবং মাইসিসের ৩ টা ধাপ অর্থাৎ মোট ১২টি ধাপকে লার্ভা বলা হয় । লার্ভা অবস্থায় প্রথম দশাকে নাপ্লিয়াস বলে । পিয়াসের ৬ টি ধাপ অতিক্রম করতে ৪৮ ঘন্টা সময় লাগে । পিয়াসের পরের দশাকে প্রটোজুইয়া বলে । এই দশার ৩টি অন্তর দশী পর্যন্ত সম্পূর্ণ হতে ৬ দিন ।

সময় লাগে। প্রটোজুইয়ার পরের দশাকে মাইসিস বলে। এই দশার ৩টি অন্তর দশা পর্যন্ত সম্পূর্ণ হতে মোট ৯ দিন সময় লাগে।

পিএল বা পোস্টলার্ভা

লার্ভার পরের ধাপ হলো পোস্ট লার্ভা। পোস্ট লার্ভা হওয়ার সাথে সাথে নার্সারি ট্যাংকে স্থানান্তর করা হয়। পিএল- ১ দিন অতিক্রম করলে পিএল-১, ২ দিন অতিক্রম করলে পিএল-২ এভাবে পিএল এর বয়স গণনা করা হয়। সাধারণত পিএল ২৫-৩০ হলে বিক্রি করতে হয়। তবে বিক্রির পূর্বে অবশ্যই মজুদ ঘেরের লবণাক্ততার বিষয়ে অবগত হতে হবে। কারণ বাগদা চিংড়ি লবণাক্ততার পার্থক্য ৩-৪ হলে পিএল মারা যায়। এজন্য হ্যাচারিতেই ধীরে ধীরে পার্থক্য কমিয়ে আনতে হয়।

সারণি: বাগদা চিংড়ির পিএল-এর ক্রমবৃদ্ধির বিবরণ

ধাপ	ডিম ফোটার পরবর্তী বয়স	দেহের গড় দৈর্ঘ্য (মিমি)
নপ্লিয়াস-১	১৫ ঘন্টা	০.৩২
নপ্লিয়াস-২	২০ ঘন্টা	০.৩৫
নপ্লিয়াস-৩	১ দিন ২ ঘন্টা	০.৩৯
নপ্লিয়াস-৪	১ দিন ৮ ঘন্টা	০.৪০
নপ্লিয়াস-৫	১ দিন ১৪ ঘন্টা	০.৪১
নপ্লিয়াস-৬	৪৮ ঘন্টা	০.৫৪
প্রোটোজ্যুইয়া-১	২ দিন ১৬ ঘন্টা	১.০৫
প্রোটোজ্যুইয়া-২	৪ দিন ৪ ঘন্টা	১.১০
প্রোটোজ্যুইয়া-৩	৬ দিন	৩.২০
মাইসিস-১	৭ দিন ৪ ঘন্টা	৩.৮
মাইসিস-২	৮ দিন ১৬ ঘন্টা	৪.৩
মাইসিস-৩	৯ দিন ৪ ঘন্টা	৪.৫
পোস্ট লার্ভা-১	১০ দিন ২০ ঘন্টা	৫.২
পোস্ট লার্ভা-৫	১৬ দিন	৮
পোস্ট লার্ভা-১৫	২৬ দিন	১২

লার্ভর খাদ্য

ডিম ফোটার প্রথম ২ দিন কোন খাদ্য প্রয়োগ করা হয় না। অধিকাংশ হ্যাচারিতে বিভিন্ন লার্ভা অবস্থার জন্য খাদ্য হিসেবে ২-৪ ধরনের ফাইটোপ্ল্যাংকটন ও জুপ্ল্যাংকটন উৎপাদন ও প্রতিপালন করা হয়ে থাকে। লার্ভা নাপ্লি অবস্থায় কোন খাবার খায় না। লার্ভা জুইয়া অবস্থায় ও মাইসিস পর্যায়ের প্রথম দিকে ফাইটোপ্ল্যাংকটন খেতে বেশি পছন্দ করে। হ্যাচারিতে ফাইটোপ্ল্যাংকটনের মধ্যে সাধারণত ডায়াটম জাতীয় খাদ্য কণা, যেমন- Chaetocers sp, Skeletonema sp উৎপাদন করা হয় এবং প্রাটোজুইয়ার খাদ্য হিসেবে এগুলো সরবরাহ করা হয়। এছাড়া ডিমের কুসুম, সয়াবিন পাউডার, ইস্ট এবং ফাইটোপ্ল্যাংকটন একসাথে মিশিয়ে খাদ্য তৈরি করে খাওয়ানো যেতে পারে। লাইভ ফিড হিসেবে আর্টিমিয়া খাওয়ানো হয়। পোস্ট লার্ভা অবস্থায় পিএল-কে আর্টিমিয়া ও ঝিনুকের মাংস অথবা কৃত্রিম খাদ্য, যেমন- আর্টিমিয়া ফ্লেক, আর্টিফিশিয়াল প্ল্যাংকটন (এপি) ইত্যাদি খাওয়ানো হয়।

২০২২

সারণি: বাগদা চিংড়ির জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়

পর্যায়	শুরু হয়	সময়কাল	শিরোবক্ষ খোলসের দৈর্ঘ্য মিমি (পুরুষ)	শিরোবক্ষ খোলসের দৈর্ঘ্য (মিমি) স্ত্রী
ডিম (ভ্রূণ)	নিষিক্তকরণ	১২ ঘন্টা	-	০.২৯
লার্ভা	ডিম থেকে ফোটা	২০ দিন	-	০.৫-২.২
জুভেনাইল	ফুলকা অঙ্গের পূর্ণাঙ্গতা	১৫ দিন	-	২.২-১১
কিশোর চিংড়ি	জননেন্দ্রিয়ের উপস্থিতি	৪ মাস	১১.৩	১১.৩৭
তরুন চিংড়ি	জননেন্দ্রিয়ের পূর্ণতা এবং প্রথম সঙ্গম	৪ মাস	৩০.৩৭	৩৭.৪৭
পূর্ণাঙ্গ চিংড়ি	দেহের সব অঙ্গের উপস্থিতি ও পূর্ণাঙ্গ বৃদ্ধি	১০ মাস	৩৭-৭১	৪৭.৮১

দৈনন্দিন হ্যাচারি পরিচর্যা

মাদার শ্রিম্প ট্যাংকে নিয়মিত পানি সঞ্চালন ও পানির তাপমাত্রা উপযুক্ত পর্যায়ে রাখতে হবে। এজন্য প্রতিটি ট্যাংকে ওয়াটার হিটার ও থার্মোমিটার রাখতে হবে যাতে খুব সহজেই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কেন্দ্রীয় তাপ সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাপ নিয়ন্ত্রণ করা উত্তম। হ্যাচারিতে উৎপাদন নির্ভর করে মাদার শ্রিম্প ব্যবস্থাপনার উপর, মাদার শ্রিম্প ব্যবস্থাপনা যত বেশি উন্নত হবে পোনা উৎপাদন তত বেশি হবে। লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংক, পোস্ট লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংক, প্ল্যাংকটন প্রতিপালন ট্যাংক, ব্রিডিং ট্যাংক প্রভৃতি প্রতিদিন পরিষ্কার করতে হবে। খাদ্য সবসময় পরিমাণমত দিতে হবে। ট্যাংকসমূহে অব্যবহৃত খাদ্য ও ট্যাংকের তলায় কোনো বর্জ্য বা ময়লা থাকলে তা নিয়মিত সাইফনিং-এর মাধ্যমে অপসারণ করতে হবে। যেহেতু বাগদা চিংড়ি খুবই স্পর্শকাতর তাই হ্যাচারিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যাদি ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহারের পূর্বে ও পরে ২০ পিপিএম ফরমালিন বা ১০ পিপিএম পটাসিয়াম-পার-ম্যাঙ্গানেট দ্রবণে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। লার্ভা ট্যাংকে দ্রব্যাদি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পূর্বে প্রতিবার পরিসুত পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে।

হ্যাচারির সাঁতাতে মেঝে এবং অপরিষ্কার ড্রেন রোগ বিস্তারে সহায়তা করে, তাই হ্যাচারির ড্রেন, মেঝে ইত্যাদি নিয়মিতভাবে জীবাণুনাশকদ্বারা পরিষ্কার রাখা উচিত। টেকনিশিয়ান থেকে শুরু করে কর্মচারী সবাইকে অ্যাপ্রন পরে দৈনন্দিন কাজ করা উচিত। হ্যাচারির প্রবেশপথে ক্লোরিনমিশ্রিত পানি রাখা উচিত। উৎপাদন চলাকালীন সময়ে হ্যাচারিতে কর্মরত স্টাফঁদের বাইরে না আসাই ভালো, আসলেও হ্যাচারিতে প্রবেশের সাথে সাথেই ক্লোরিনমিশ্রিত পানি দিয়ে হাত-পা জীবাণুমুক্ত করে প্রবেশ করতে হবে। ট্যাংকগুলো সবসময় পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। খাদ্য ও ঔষধ প্রদান ছাড়া পলিথিন না উঠানোই ভালো, কারণ বাগদা চিংড়ি খুব স্পর্শকাতর তাই একটু অসচেতনতার জন্য যে কোনো সময় ভাইরাস আক্রান্ত হতে পারে। নিয়ামেিত ভাইরাল, ফাংগাল ও ব্যাকটেরিয়াল ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। বাগদা চিংড়ির হ্যাচারির ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম কারণ ট্যাংকে একবার রাগ দেখা দিলে পুরো ট্যাংকে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

২০২২

রোগ ও রোগের প্রতিকার

হ্যাচারিতে প্রতিপালিত মা চিংড়িসহ লার্ভা ও পোস্ট লার্ভা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এসব রোগ বাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক ও এককোষী প্রাণীর আক্রমণে চিংড়ি পোনায় সংক্রোমিত হয়ে থাকে। হ্যাচারিতে পোনা নানা কারণে রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে প্রধান কারণগুলো হচ্ছে হ্যাচারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখা, হ্যাচারিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রবাদি জীবাণুমুক্ত না রাখা, সঠিক পরিমাণে বিভিন্ন ট্যাংকের পানি পরিবর্তন না করা, খাদ্যের মান ঠিক না থাকা ও পানিতে অক্সিজেন সরবরাহের স্বল্পতা প্রভৃতি। হ্যাচারিতে পারে রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া উত্তম। কেননা হ্যাচারিতে পোনা একবার রোগাক্রান্ত হলে ঔষধ প্রয়োগ করে রোগ প্রতিকার কব্রা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে এবং খুব দ্রুত এ রোগ মহামারি আকার ধারণ করে। ফলে অনেক সময় ১/২ দিনের মধ্যেই সব পোনা মারা যায়। হ্যাচারি জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব দিলে সাধারণত পোনা রোগাক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে না। বিষয়গুলো হলো:

ক) হ্যাচারিতে ব্যবহৃত পানি ও যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত রাখা।

খ) প্রতিটি ট্যাংক থেকে সঠিক পরিমাণ পানি পরিবর্তন করা।

গ) প্রতিটি ট্যাংকের তলদেশ নিয়মিত পরিষ্কার করা।

ঘ) ভালো গুণাগুণ সম্পন্ন খাদ্য সঠিক মাত্রায় সরবরাহ করা।

ঙ) পোনা উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর পূর্বে ও উৎপাদন কার্যক্রম শেষে ট্যাংকসমূহ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করা।

চ) পানিতে সব সময় বায়ু সরবরাহ নিশ্চিত রাখা।

ছ) পানির তাপমাত্রা সঠিক পর্যায়ে রাখা।

চিংড়ি হ্যাচারির সাধারণ রোগসমুহ

ভিবরিও (Vibrio Sp.)

হ্যাচারিতে লার্ভা এবং পোস্ট লার্ভা পর্যায়ে *Vibriosis* প্রধানত *V. alginlyticcus, V. harveyi, V. vulnificus*, তেবং V parakaemolyticas ব্যাকটেরিয়া প্রজাতিদ্বারা আক্রানত হয়। আক্রমণ সাধারণত বহিঃত্বকে কিংবা অন্ত্রে অথবা অন্যান্য অঙ্গে হয়ে থাকে। *Culticular Vibriosis* এর আক্রমণে পদ উপাঙ্গের অগ্রভাগে পচন ধরে, উপাঙ্গ ফীত এবং বর্ণহীন রং ধারণ করে।

আলোকদায়ক জীবাণুজনিত রোগ (Luminescent vibriosis)

এই রোগটি ঠরনৎরড় যধৎাবুর জীবাণুদ্বারা হয়ে থাকে। চিংড়ির লার্ভা বেশি মাত্রায় আক্রান্ত হলে অন্ধকারে সার্ভা জ্বলজ্বল করে এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাকটেরিয়া যকৃত ও অগ্নাশয় গ্রন্থিকে আক্রান্ত করে। আস্তে আসেত গর্তের সৃষ্টি হয় ফলে সেপটিসিমিয়া (Septicemia) ঘটে। এই পর্যায়ে লুমিনিসেন্ট রোগ ধরা পড়ে। ১৯৯১ সালে ইন্দোনেশিয়ায় পিনাইড চিংড়ি হ্যাচারিতে এই রোগ প্রথমে ধরা পড়ে বলে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়।

এই রোগের প্রধান শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য হলো যকৃত ও অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির স্বাভাবিক রং পরিবর্তন হয়ে গাঢ় বাদামি রঙের হয় এবং অগ্নাশয় গ্রন্থি সঙ্কুচিত হয়ে ছোট হয়ে যায়। মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করলে অসংখ্য মৃত ব্যাকটেরিয়া যকৃত ও অগ্নাশয় গ্রন্থিতে দেখা যায়। এখন পর্যন্ত এর পূর্ণাঙ্গ হিস্টোপ্যাথালেজিক্যাল তথ্য পাওয়া যায় নি। এই জীবাণু *Penaeus monodon1 Penaeus Inergaensis* এ আক্রমণ ঘটায়।

চিংড়িতে Luminescent bacteria রোগের উপস্থিতি প্রধানত নির্ভর করে হ্যাচারির নিকটবর্তী সমুদ্র উপকলীয় এলাকার পানির উপর। *Cultictaiar Vibriosis* এর আক্রমণে উপাঙ্গের উপরের অগ্রভাগে পচন ধরে। বেশির ভাগ খামারে চিংড়ির মড়কের প্রধান কারণ bacterial septicemia এর জন্য। এক রিপার্টে উল্লেখ করা হয় যে ২০৪ টি রোগাক্রানত চিংড়ির মধ্যে *V. parahaemolyticus* ৮৩ শতাংশ এবং *V. vulin-ifictus* ৩৬ শতাংশদ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।

Vibrio প্রজাতি দমনে Quinoline antibiotic দেয়া হয়। Chloramphenical যদিও রোগ নিরাময়ের জন্য অনেক উপকারী তথাপি চিংড়ির রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করা হয় না, কারণ খাদ্যে এটির উপস্থিতি মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক। এছাড়া শুধু হ্যাচারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, যেমন-ট্যাংকের স্বাস্থ্য পরিবেশ রক্ষা করে। ক্লোরিনদ্বারা পানি জীবাণুমুক্ত রাখা এবং হ্যাচারির তলদেশের সৃষ্ঞিত মল ও উদ্বৃত্ত খাদ্য পরিষ্কার রাখা।

হ্যাচারিতে Monodon Baculo Virus এর আক্রমণ

হ্যাচারিতে সুষ্ঠু চাষ ব্যবস্থাপনার অভাবে চিংড়ির পোনা এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। পোনা অবস্থায় সঠিক ঔষধের মাত্রা প্রয়োগ করা দুরুহ ব্যাপার। বেশির ভাগ হ্যাচারিতে চিংড়ি সার্ভা মজুদের পরিমাণ অত্যধিক বেশি, তাই এই ভাইরোগ আক্রান্ত চিংড়ি পোনার বেশির ভাগই মারা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্ত করে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চাষ করলে মোটামুটি ভালো ফল পাওয়া যায়। কিন্তু লার্ভার দেহে ভাইরোগর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেলে খামারে কখনও এই চিংড়ি চাষ করা উচিত নয়। এই রোগের কোন সঠিক চিকিৎসা নেই। তবে সুষ্ঠু চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

Baculovirus Penaei (BP)

চিংড়ির লার্ভা, পোস্ট লার্ভা এবং জুভিনাইল ধাপে এই ভাইরাস রোগ মহামারি আকারে দেখা দেয়। হ্যাচারিতে অনেক সময় এই ইচ ভাইরাস মাম্লক আক্রমণ করে, ফলে হ্যাচারিতে সব পোনা মারা যায়। ইচ প্রথম প্রাটে-াজুইয়া (P2) ধাপে (ধাপ-২) এবং মাইসিস ধাপে আক্রানত করে। কিন্তু মাইসিস ধাপে রোগের ব্যাপকতা এত বেশি যে ৯০% পোনা মারা যায়।পোস্ট লাভা ধাপে আস্তে আস্তে রোগের ব্যাপকতা কমতে থাকে। এই রোগ ব্যাপক আক্রমণের ফলে চিংড়ির মাইসিস এবং পোস্ট লার্ভা ধাপে উপরের মধ্য আন্ত্রিক নালী বরাবর সাদা লম্বা টান দেখা দেয়। এই রোগের আক্রমণের ফলে চিংড়ি খাদ্য কমিয়ে দেয় ফলে দেহ বৃদ্ধি ঘটে না।

লার্ভাল মাইকোসিস (Larval mycosis)

প্রায় সব পিনাইড চিংড়ি হ্যাচারিতে এই রোগের আক্রমণ ঘটে। চিংড়িতে লার্ভাল মাইকোসিস রোগ প্রধানত *Phycomycetous fungi, Lagenidium (1.Callinectes), Sirolpidium, Phythium, Leptolegoina mania*

২০২২

Ges Haliphthros milfordensis ছত্রাকদ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। *Lagenidium* চিংড়ির ডিম, নাপ্লিয়াস, প্রটোস্যুইয়া এবং মাইসিস ধাপে আক্রমণ করে। Sirolpidium চিংড়ির মাইসিস (শেষ ধাপ) এবং পিএল এর শুরু পর্যায়ে আক্রমণ করে।

প্রতিষেধক ঔষধ এবং প্রয়োগ মাত্রা

লার্ভার ক্ষতি হয় বিধায় হ্যাচারিতে ক্লোরামেফেফিনিকল ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নয়, তবে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ব্যবহারের আগে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে অবগত হতে হবে। সাধারণত ১০-২০ পিপিএম মাত্রায় অক্সিটেট্রসাইক্লিন প্রয়োগ করা হয়। নিচের সারণিতে রোগ দমনের জন্য কয়েকটি ঔষধ ও তার মাত্রা উল্লেখ করা হলো।

সারণি: প্রতিষেধক ঔষধ এবং প্রয়োগমাত্রা

ক্রমিক নং	ঔষধ	ওষধ
১	Parazine (Oxoline acid)	০.১-০.৫ ppm
২	Furasol	১.০-২.৫ ppm
৩	Gentin Violot	০.১-০.২ ppm
৪	Formalin	২৫-৫০ ppm

Oomycetes জাতীয় ছত্রাক হ্যাচারিতে আক্রমণ ঘটায়। এ রোগ থেকে চিংড়ির পোনাকে রক্ষার জন্য Trifluratin Treflan ১০ পিপিএম মাত্রায় সরাসরি প্রতিপালন ট্যাংককে চার ঘণ্টা অন্তর রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োগ করতে হবে। লজিনিডিয়াম (*Legenidium*) ছত্রাক সাধারণত হ্যাচারিতে চিংড়ির পোনাতে আক্রমণ ঘটায়। খামারে অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে লবণাক্ততা ১৮ পিপিটিতে নেমে আসে, ফলে লেজিনিডিয়াম ছত্রাকের আক্রমণ ঘটে। ম্যাগনেসিয়াম আয়ন লেজিনিডিয়াম ছত্রাক দমনের জন্য প্রতিষেধক ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। NaCl, KCI Ges MgCl, এর বিভিন্ন মিশ্রণে প্রয়োগ করে দেখা যায় যে *Legenidium* এর আক্রমণ কমে যায়। কিন্তু এর সঠিক তথ্য বিশেষণ করা সম্ভব হয় নি। KCI এবং $MgCl_2$, এর মধ্যে কোনোটি এর নিরাময়ে ভূমিকা পালন করেছে কিংবা দুইয়ের মিশ্রণের ফলে কোন অনুপাতে এ নিরাময় ঘটেছে, এর জন্য আরও গবেষণা দরকার।

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রথম কত সালে চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপিত হয়?
২. আকারের ওপর ভিত্তি করে হ্যাচারিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
৩. বাগদা হ্যাচারির জন্য ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততার মাত্রা কত হতে হবে?
৪. বাগদা হ্যাচারির জন্য ভূগর্ভস্থ পানির পিএইচ-এর মাত্রা কত হতে হবে?
৫. ব্যাকইয়ার্ড হ্যাচারি কি?
৬. আর্টিমিয়া কি?
৭. পরিপক্ক স্ত্রী বাগদা চিংড়ির বিভিন্ন দশা কয়টি?
৮. হ্যাচিং ট্যাংকে প্রতি বর্গমিটারে কয়টি ডিমওয়ালা চিংড়ি মজুদ করা হয়?
৯. চিংড়ির মপি দশায় কয়টি ধাপ?
১০. ব্যাকটেরিয়াদ্বারা সৃষ্ট একটি রোগের নাম লিখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বিভিন্ন ধরনের হ্যাচারি সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ।
২. বাগদা হ্যাচারির পরিপকরণ ট্যাংকের বর্ণনা দাও।
৩. লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংক সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ।
৪. হ্যাচারিতে ব্যবহৃত খাদ্য ও রাসায়নিক দ্রব্যের নাম লিখ।
৫. পরিপক্ব স্ত্রী বাগদা চিংড়ির বিভিন্ন দশা উল্লেখ কর।
৬. বাগদা হ্যাচারিতে সৃষ্ট ভিবরিও রোগের লক্ষণ লিখ।
৭. হ্যাচারি জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাগদা হ্যাচারির স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা কর।
২. বাগদা হ্যাচারির বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।
৩. বাগদা হ্যাচারিতে ব্যবহার্য খাদ্য ও খাদ্য উপকরণসমূহ বর্ণনা কর।
৪. বাগদা হ্যাচারির দৈনন্দিন পরিচর্যা আলোচনা কর।
৫. বাগদা হ্যাচারিতে রোগের কারণ ও তার প্রতিকার বর্ণনা কর।

২০২২

চতুর্থ অধ্যায়

বাগদা চিংড়ির ব্রুড সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা

প্রাকৃতিক উৎস থেকে ব্রুড সংগ্রহের পদ্ধতি

কৃত্রিমভাবে বাগদা চিংড়ির পিএল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মাদার শ্রিম্প-এর গুণগতমান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত ব্রুড হতে উৎপাদিত পিএল-এর গুণগতমান ভালো থাকে। তাই প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রজনন উপযোগী ডিমওয়ালা চিংড়ি সংগ্রহ করা উচিত। প্রজননক্ষম পুরুষ ও স্ত্রী বাগদা চিংড়ি মার্চ থেকে নভেম্বর মধ্যে সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করা যায়। ডিমওয়ালা চিংড়ি দু'প্রকার, যথা- সমপূর্ণ পরিপক্ব ও প্রাপ্ত বয়স্ক চিংড়ি। সম্পূর্ণ পরিপক্ব চিংড়ি হ্যাচারিতে এনে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করলে আপনা আপনি ডিম ছেড়ে দেয়। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী চিংড়ির চক্ষু কর্তন ছাড়া ডিম হয় না। গভীর সমুদ্রে মাছ বা চিংড়ি ধরার কাজে নিয়োজিত ট্রলার থেকে পরিপক্ক চিংড়ি সগ্রহ করা যায়। অন্যদিকে টেকনাফের উপকূলবর্তী এলাকায় অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত কিছু কিছু পরিপক্ব চিংড়ি পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক উৎস থেকে পরিপক্ব চিংড়ি পাওয়া না গেলে খামার থেকে পূর্ণবয়স্ক চিংড়ি সগ্রহ করে হ্যাচারিতে ব্যবহার করা যায়। তবে গভীর সমুদ্র থেকে সংগৃহীত চিংড়ি থেকে ভালো ফল পাওয়া যায়। সমপূর্ণ পরিপক চিংড়ি পাওয়া না গেলে কমপক্ষে ৮০ গ্রাম ওজনের স্ত্রী চিংড়ি ও ৫০ গ্রাম ওজনের পুরুষ চিংড়ি সংগ্রহ করে হ্যাচারিতে পরিপক্ক করতে হবে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত চিংড়ি থেকে পোনা উৎপাদন তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হয়ে থাকে।

মাদার শ্রিম্প পরিবহন পদ্ধতি

মাদার শ্রিম্প পরিবহন পদ্ধতি পূর্ণবয়স্ক চিংড়ির পরিবহনের অনুরূপ হলেও চিংড়ির উদরে ডিমের অবস্থানের কারণে ডিমওয়ালা চিংড়ি পরিবহনে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কেননা একই পাত্রে অনেকগুলো চিংড়ি পরিবহন করার সময় চিংড়ির পায়ের আঘাতে ডিম বেরিয়ে আসতে পারে। এক্ষেত্রে ৩০ সেমি লম্বা এবং ৬ থেকে ৮ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট প্লাস্টিক পাইপের মধ্যে মাদার শ্রিম্প চিংড়ি প্রবেশ করিয়ে পরিবহন করা যেতে পারে। পাইপের গায়ে অবশ্যই ৪০ থেকে ৫০ টি ছিদ্র থাকতে হবে এবং পাইপের মুখ মশারির কাপড় দিয়ে আটকানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রত্যেকটি পাইপে একটি চিংড়ি প্রবেশ করিয়ে অতঃপর পাস্টিকের ব্যাগে অক্সিজেনযুক্ত পানি পূর্ণ করে পরিবহন করা যেতে পারে। এ পদ্ধতি দীর্ঘ সময় পরিবহনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর। এছাড়া অক্সিজেনের সাহায্যে পাস্টিকের ব্যাগের মাধ্যমেও পরিবহন করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে প্লাস্টিক ব্যাগের পানির তাপমাত্রা অনুকূল অবস্থায় রাখার জন্য প্রতি ২ লিটার পানির জন্য ১০০ গ্রাম ওজনের পৃথক বরফের টুকরা প্লাস্টিক ব্যাগের পানির মধ্যে ভাসিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে চিংড়ির রোস্ট্রামটিতে স্পঞ্জ জাতীয় পদার্থ লাগিয়ে দিতে হবে যাতে আঘাতজনিত কারণে রোস্ট্রামটি ভেঙে না যায়।

চিত্রঃ পরিপক্ব বাগদা চিংড়ি

চিত্র: প্লাস্টিক পাইপের মাধ্যমে মাদার চিংড়ি পরিবহন

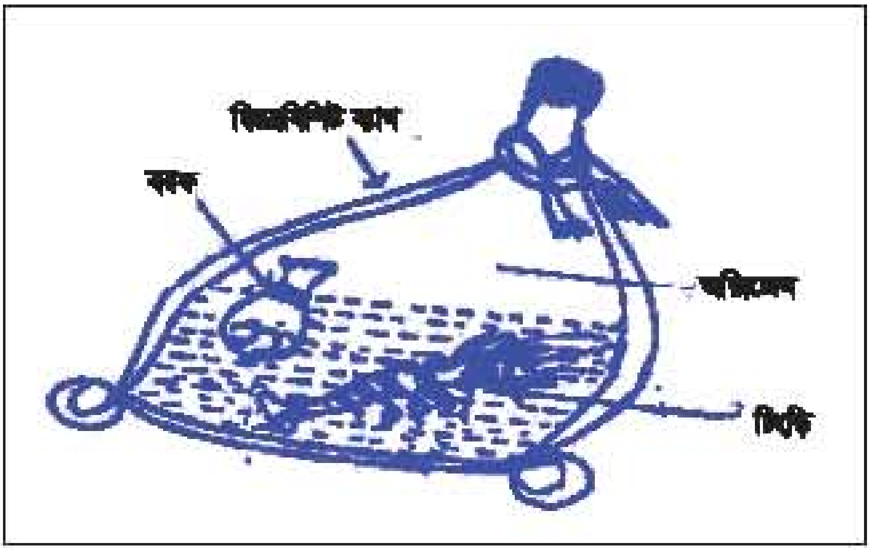

চিত্র: পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মাদার চিংড়ি পরিবহন

মাদার চিংড়ি প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগ্রহ করে হ্যাচারিতে এনে ফরমালিন ২৫ পিপিএম মাত্রায়, ১৫ থেকে ২০ মিনিট অতিবাহিত করে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হয়। অথবা ৫ পিপিএম মাত্রার ফুরাজল দ্রবণে ১ ঘণ্টা রেখে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হয়। এরপর ব্রিডিং ট্যাংকে ৩-৪ দিন পরিচর্যা করা হয়। এ সময় পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়ি আলাদা রাখা হয় এবং এ সময় অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে কুঁচো চিংড়ি, শামুক, ঝিনুক, কুঁচিয়া বা কাঁকড়ার মাংস, গরু বা খাসির কলিজা ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। এরপর পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়িকে ১:১ অনুপাতে ম্যাচুরেশন ট্যাংকে মজুদ করা হয়। ম্যাচুরেশন ট্যাংকের প্রতি বর্গমিটারে ৩০০-৪০০ গ্রাম চিংড়ি মজুদ করা যায়।

গুণগতমান সম্পন্ন চিংড়ির পিএল তৈরির লক্ষ্যে সুস্থ-সবল মাদার শ্রিম্প একান্ত অপরিহার্য। কাজেই মাদার শ্রিম্প নির্বাচনের জন্য সংগৃহীত চিংড়ির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি নজর দিতে হবে:

ক) মাদার শ্রিম্প অবশ্যই স্বাস্থ্যবান এবং রোগমুক্ত হতে হবে,

খ) সবল এবং কর্মতৎপর হবে

গ) উজ্জ্বল বর্ণ,

ঘ) যতটা সম্ভব বড় এবং পরিপক্ব হবে।

উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন চিংড়ি থেকে উৎপাদিত সার্ভার বেঁচে থাকার হার ও বৃদ্ধি সন্তোষজনক হয়ে থাকে।

পর্যাপ্ত পরিমাণ ডিম পাওয়ার উদ্দেশ্যে মজুদ ট্যাংক ব্যবস্থাপনার জন্য যে বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে তা নিম্নরূপ-

ক) মজুদ ট্যাংকে পানির গভীরতা ১ মিটার রাখতে হয়।

খ) প্রতিদিন সকালে ও বিকালে ৪০% থেকে ৫০% পানি পরিবর্তন করতে হয়।

গ) ট্যাংকের তলদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হয় এবং ট্যাংকের উপরিভাগে ঢাকার ব্যবস্থা থাকতে হয় বা ট্যাংক ঘরের মধ্যে রাখতে হয়।

ঘ) প্রজনন কার্য ত্বরান্বিত করার জন্য মজুদ ট্যাংকে যতটা সম্ভব ঝরনার ব্যবস্থা থাকতে হবে, ফলে চিংড়ি যৌন কার্য সম্পাদনে বেশি তৎপর হয়।

ঙ) মাদার শ্রিম্প এর দেহের ওজনের ৫% হিসেবে সম্পূরক খাদ্য প্রতিদিন সকালে ও বিকালে প্রয়োগ করতে হয়। বিকালে সব ধরনের ভাজা খাদ্য প্রয়োগ করা ভালো। মাদার শ্রিম্প-এর খাদ্য হিসেবে কাটা মাছ, শামুক-ঝিনুকের মাংস, গরু বা খাসির কলিজা, কুচো চিংড়ি ও পরিপক্ব আর্টিমিয়া অন্যতম।

চ) প্রতিদিন খাদ্য দেয়ার পূর্বে সাইনিং প্রক্রিয়ায় ট্যাংকের তলদেশ থেকে অতিরিক্ত খাবার বা চিংড়ির মলমূত্র পরিষ্কার করে নিতে হয়। উল্লেখ্য প্রতি দু দিন পর ট্যাংকের তলদেশ এবং গাত্র ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। ব্রুড শ্রি মজুদ করার পূর্বে ২০ পিপিএম ফরমালিন দ্রবণের সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

স্বাস্থ্য পরিচর্যা

হ্যাচারিতে প্রতিপালিত মা চিংড়ি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এসব রোগ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক ও এককোষী প্রাণীর আক্রমণে চিংড়ি পোনায় সংক্রামিত হয়ে থাকে। হ্যাচারিতে রোগের প্রাদুর্ভাব বিভিন্ন কারণে হতে পারে। এগুলোর মধ্যে প্রধান কারণগুলো হচ্ছে হ্যাচারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখা, হ্যাচারিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রবাদি জীবাণুমুক্ত না রাখা, সঠিক পরিমাণে বিভিন্ন ট্যাংকের পানি পরিবর্তন না করা, খাদ্যের মান ঠিক না থাকা, পানিতে অক্সিজেন সরবরাহের স্বল্পতা প্রভৃতি। হ্যাচারি জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব দিলে সাধারণত পোনা রোগাক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে না। বিষয়গুলো হলো:

ক) হ্যাচারিতে ব্যবহৃত পানি ও যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত রাখা।

খ) প্রতিটি ট্যাংক থেকে সঠিক পরিমাণ পানি পরিবর্তন করা।

গ) প্রতিটি ট্যাংকের তলদেশ নিয়মিত পরিষ্কার করা।

ঘ) ভালো গুণাগুণ সম্পন্ন খাদ্য সঠিক মাত্রায় সরবরাহ করা।

ঙ) পোনা উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর পূর্বে ও উৎপাদন কার্যক্রম শেষে ট্যাংকসমূহ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। জীবাণুমুক্ত করা।

চ) পানিতে সব সময় বায়ু সরবরাহ নিশ্চিত রাখা।

ছ) পানির তাপমাত্রা সঠিক পর্যায়ে রাখা।

মা চিংড়ি ব্রিডিং ট্যাংকে মজুদের পূর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষা খুবই জরুরি। এক্ষেত্রে নিচের সারণিতে উল্লেখিত পরীক্ষাগুলো করা যেতে পারে।

সারণি: চিংড়ি স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য

ক্রমিক নং	পরীক্ষণীয় বিষয়	শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য
১	সংগৃহীত মাদার শ্রিম্প MBV দ্বারা আক্রান্ত কিনা	চিংড়ির বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থ MBV এর ইনক্লুসান বডি দেখা যায়
২	চিংড়ির ফুলকা বিকৃত, নোংরা বা অপরিচ্ছন্ন কিনা	চিংড়ির খোলস পরিবর্তন এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না
৩	চিংড়ির ত্বকের উপর রক্তের দাগ বা সাদা দাগ আছে কিনা	চিংড়ির খোলস পরিবর্তনে পীড়নের সৃষ্টি হয় এবং খোলস পরিবর্তনের মাধ্যমে দুর্বল চিংড়ির রূপান্তর হয়
৪	ইউরোপড ফোলা আছে কিনা	চিংড়ি দেহের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ লক্ষ্য করা যায় এবং আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়
৫	সঠিকভাবে চিংড়ি খোলস পরিবর্তন করছে কিনা	চিংড়ির দেহাবরণীর উপর শেওলা বিদ্যমান থাকে
৬	চিংড়ির দেহাবরণীর উপর কালো দাগ বিদ্যমান কিনা	স্থানীয়ভাবে ব্যাকটেরিয়াদ্বারা আক্রান্ত
৭	চিংড়ির উপাঙ্গ বা এন্টেনা ভেঙে গেছে কিনা	ত্রুটিপূর্ণ পরিবহন পদ্ধতি বা ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত
৮	দেহের আকৃতি স্বাভাবিক কিনা	ডিম দেয়ার উপযুক্ত বড় আকৃতির মাদার শ্রিম্প সাধারণত বেশি ডিম দিয়ে থাকে
৯	দেহের বর্ণ স্বাভাবিক কিনা	উজ্জ্বল বর্ণের চিংড়ি সাধারণত রোগমুক্ত

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. ম্যাচুরেশন ট্যাংকে পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়ির অনুপাত কত?

২. ম্যাচুরেশন ট্যাংকে প্রতি বর্গমিটারে কত গ্রাম চিংড়ি মজুদ করা হয়?

৩. প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত মা চিংড়িকে হ্যাচারিতে কি দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়?

৪. চিংড়ি পরিবহনের সময় প্লাস্টিক ব্যাগের তাপমাত্রা অনুকূল রাখার জন্য কি ব্যবহৃত হয়?

৫. টেকনাফ উপকূলবর্তী এলাকায় কোন্ সময়ে ব্রুড চিংড়ি পাওয়া যায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রাকৃতিক উৎস থেকে ব্রুড সংগ্রহের পদ্ধতি বর্ণনা কর ।

২. গুণগতমান সম্পন্ন পিএল পাওয়ার জন্য মা চিংড়ির কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত?

৩. হ্যাচিং-এর জন্য মাদার শ্রিম্প নির্বাচনের সময় কি কি বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা উচিত?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাদার শ্রিম্প বা মা চিংড়ি পরিবহন পদ্ধতি বর্ণনা কর ।

২. মজুদ ট্যাংক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বর্ণনা কর ।

৩. ব্রুড বাগদা চিংড়ির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা আলোচনা কর ।

২০২২

পঞ্চম অধ্যায়

বাগদা চিংড়ির নার্সারি

বাগদা চিংড়ি পিএল অবস্থায় খুব ছোট থাকে তাই পিএলকে পালন পুকুরে সরাসরি মজুদ করলে গভীরতাজনিত কারণে মারা যেতে পারে। তাই পোনার বেঁচে থাকার হার বৃদ্ধির জন্য ঘেরে নার্সারি ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। এজন্য ঘেরে স্বল্পকালীন নার্সারি তৈরি করে লালন করলে পোনার বেঁচে থাকার হার অনেকাংশে বাড়ানো সম্ভব। এ লক্ষ্যে

ক. ঘেরের যে কোনো এক পাশে মাটির বাঁধ দিয়ে বা বাঁশের চটা ও মশারির নাইলন নেটে দিয়ে ঘিরে ঘেরের আয়তনের শতকরা ১০-১৫ ভাগ আকারের নার্সারি তৈরি করতে হবে।

খ. বাঁশের চটা ও মশারির নাইলন নেট দিয়ে নার্সারি তৈরি করলে খেয়াল রাখতে হবে যাতে নেটে ছিদ্র না থাকে। নেট ছিদ্র থাকলে পোনা বের হয়ে লালন পুকুরে চলে যাবে।

গ. পোনার প্রাথমিক অবস্থায় আশ্রয়ের জন্য নার্সারিতে পরিমিত পরিমাণ বাঁশের কঞ্চি বা শুকনো নারিকেল বা খেজুর পাতা পুঁতে দিতে হবে। এতে একদিকে যেমন পোনার আশ্রয় হবে তেমনি এতে জমানো পেরিফাইটন ও ব্যাকটেরিয়াল ফিল্ম পোনার প্রাথমিক দশায় খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

চিত্রঃ নার্সারি তৈরি

নার্সারির প্রয়োজনীয়তা

ক) পোনার যত্ন ও পরিচর্যা করা সহজ হয়,

খ) পোনার খাবার প্রয়োগ সহজ হয়,

গ) পোনা সবল এবং শক্তিশালী হয়,

ঘ) পোনা বেঁচে থাকার হার বৃদ্ধি পায়,

ঙ) পোনা বেঁচে থাকার হার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়,

চ) সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা সহজ হয়,

ছ) পালন পুকুরে মজুদ ঘনত্ব ঠিক রাখা যায়,

জ) সঠিক সময়ে নির্দিষ্ট আকারের পোনা পাওয়া যায়, এবং

ঝ) পালন পুকুরে মজুদ ঘনত্বের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যায়।

নার্সারির স্থান নির্বাচন

ঘেরের যে কোনো প্রান্তে নার্সারি নির্মাণ করা যায়। তবে এক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণীয়

ক) ঘেরের অপেক্ষাকৃত গভীর অংশে ও নিরাপত্তার জন্য পাহারা ঘরের কাছাকাছি স্থানটি নার্সারির জন্য নির্ধারণ করা ভালো; এবং

খ) ঘরের অপেক্ষাকৃত ভালো মাটিযুক্ত এবং পাড়ের কাছাকাছি স্থানে নার্সারি তৈরি করা উচিত।

চিত্রঃ নার্সারির স্থান নির্বাচন

নার্সারি তৈরি

নার্সারি যথাযথভাবে তৈরি করতে হবে, ফলে পোনার মজুদকালীন মৃত্যুর হারও কমে যাবে এবং পোনা দ্রুত বাড়বে। এক্ষেত্রে পালনীয় পরামর্শগুলো হলো

ক) নার্সারিতে ৩ থেকে ৪ ফুট পানি থাকতে হবে।

খ) ঘন নেট দিয়ে নার্সারি নির্মাণ করতে হবে।

গ) নার্সারির নেট পানির উপরে এক হাত পরিমাণ বাড়তি থাকবে এবং তলার মাটিতে ৫-৬ ইঞ্চি পরিমাণ পুঁতে দিতে হবে। সেই সাথে বসানো খুঁটির সাথে শক্ত করে এঁটে দিতে হবে, যাতে বাতাসে তা পড়ে না যায়।

ঘ) নার্সারির মধ্যে শুকনো ডালপালা ও পাতা দিয়ে চিংড়ির আশ্রয়স্থল নির্মাণ করতে হবে।

ঙ) নার্সারির তলা সমান হলে ভালো হয়। ২০২২

নার্সারির আয়তন

নার্সারির আকার বা আয়তন নির্ভর করে মূলত নার্সারির ধরন, পোনা মজুদের পরিমাণ, পালন ঘেরের আয়তন, নার্সারিতে পোনা কত দিন রাখা হবে ইত্যাদির উপর । এক্ষেত্রে পরামর্শ হলো

ক) প্রতি বিঘা (৩৩ শতাংশ) পালন ঘেরের জন্য নার্সারির আয়তন হবে তিন থেকে পাঁচ শতাংশ ।

খ) নার্সারির আয়তন এক বিঘার বেশি হওয়া ঠিক নয়, প্রয়োজনে বড় ঘেরের জন্য একাধিক নার্সারি তৈরি করা যেতে পারে ।

ঘের ও নার্সারি প্রস্তুতি

প্রস্তুতি পর্বে ঘের ও নার্সারির কমপক্ষে ৫-৬ টি স্থানের মাটির পিএইচ পরিমাপ করতে হবে । মাটির পিএইচ এর উপর ভিত্তি করে নার্সারি ও ঘেরে পরিমিত হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে ।

ক) ঘের ও নার্সারির প্রস্তুতকালীন সময়ে তলদেশ ও পাড়ের উপর অংশ পর্যন্ত শতকে ১ কেজি হারে ' । ক্যালসিয়াম অক্সাইড-এর মিশ্রণ প্রয়োগ করা যেতে পারে । অথবা বিক খ) পাথুরে চুন ও ক্যালসিয়াম অক্সাইড এর মিশ্রণ ১:১ অনুপাতে প্রয়োগ করা যেতে পারে । কিংবা

গ) শুধুমাত্র ডলোমাইট বা শুধুমাত্র পাথুরে চুন উল্লিখিত হারে ছিটিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে ।

চিত্রঃ ঘের প্রস্তুতি

ঘেরে পানি উত্তোলন

সাধারণত জোয়ারের সময় ঘেরে পানি উঠানো হয় । এক্ষেত্রে একটু যত্নের সাথে এবং অন্য ঘেরের পানি না নিয়ে, ক্যানাল বা খালের পানি নেয়া উচিত । এক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিষয়গুলো হলো

ক) ঘন নেটের মাধ্যমে ছেকে পানি উঠাতে হবে, যাতে অবাঞ্ছিত প্রাণী/প্রাণীর ডিম ঢুকতে না পারে ।

খ) প্রথমেই পাড়ের পক্ষে সহনীয় সর্বোচ্চ পরিমাণ পানি উত্তোলন করে নিতে হবে । প্রয়োজনে ২-৩ দিনে পানি উত্তোলন সম্পন্ন করতে হবে, যাতে নতুন পুকুর হলে পুকুরের পাড় এবং তলার মাটি প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি শুষে নিতে পারে ।

চিত্রঃ ঘেরে পানি উত্তোলন

অবাঞ্ছিত/রাক্ষুসে মাছ দমন

চুন প্রয়োগের ৩-৭ দিন পরে ফ্রিশিং করে ঘের ও নার্সারিতে ৫০-৬০ সেমি জোয়ারের পানি ঢুকাতে হবে যাতে অবাঞ্ছিত ও রাক্ষুসে মাছ ঘেরে প্রবেশ করতে না পারে। তদুপরি জোয়ারের পানির সাথে কদাচিৎ কিছু কিছু রাক্ষুসে মাছ বা অবাঞ্ছিত প্রাণী ঘেরে ঢুকে পড়তে পারে। এদের ধ্বংসে করার জন্য রাসায়নিক উপাদানটি বাজার থেকে ক্রয় করার সময় মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ, মূল্য ইত্যাদি যাচাই করে নিতে হবে। রোটেনন, ফসটক্সিন, ব্লিচিং পাউডার, চা বীজের খৈল ইত্যাদি ব্যবহার করে অবাঞ্ছিত/রাক্ষুসে মাছ দমন করা যেতে পারে। ঘেরে পানি উঠানোর ৩-৪ দিন পর রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দমন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

চিত্রঃ রোটেনন প্রয়োগ

অবাঞ্ছিত ও রাক্ষুসে মাছ দমন করার পদ্ধতিসমূহ

অবাঞ্ছিত ও রাক্ষুসে মাছ বিভিন্নভাবে দমন করা যায়। নিচে কয়েকটি নিরাপদ ও পরিবেশ উপযোগী পদ্ধতির বর্ণনা করা হলোঃ

ক. রোটেননঃ রোটেনন দেখতে বাদামি বর্ণের এক ধরনের পাউডার জাতীয় পদার্থ। ডেরিস নামক গুল্ম জাতীয় এক প্রকার গাছের মূল শিকড়) থেকে তৈরি হয়। এ গাছ সাধারণত দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে প্রচুর

পরিমাণে জন্মে। আমাদের দেশে পাউডার আকারে রোটেনন পাওয়া যায়। রোটেননের শক্তি মাত্রা এর মধ্যে বিদ্যমান মূল কার্যকর উপাদানের উপর নির্ভরশীল। বাজারে দুই ধরনের শক্তি সম্পন্ন রোটেনন পাওয়া যায়, যেমন-৭% এবং ৯.১%। তবে ৯.১% শক্তি সম্পন্ন রোটেননই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। তাপমাত্রা বেড়ে গেলে রোটেনন এর মাত্রা কমে যাবে। তাই শীতকালে রোটেনন প্রয়োগের ক্ষেত্রে গরমকালের চেয়ে বেশি পরিমাণে রোটেনন লাগবে। রোটেনন প্রয়োগের সুবিধা হলো এ পদ্ধতিতে মারা যাওয়া মাছ খেলে কোনো সমস্যা হয় না।

প্রয়োগমাত্রা: রোটেনন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেহেতু এর প্রয়োগমাত্রা প্রজাতি, তাপমাত্রা এবং শক্তিমাত্রার উপর নির্ভর করে তারপরও আমাদের দেশে সচরাচর ৯.১% মাত্রার রোটেনন বেশি ব্যবহৃত হয়। রোটেননের প্রয়োগমাত্রা নিচে উল্লেখ করা হলো:

শক্তিমাত্রা	প্রয়োগ মাত্রা	ইউনিট
৭%	১৮-২৫ গ্রাম	প্রতি শতক/এক ফুট পানি
৯.১%	১৬-১৮ গ্রাম	

প্রয়োগ পদ্ধতি: একটি সুবিধাজনক পাত্রে পরিমাণমত রোটেনন পাউডার নিয়ে আস্তে আস্তে অল্প করে পানি যোগ করে পেইস্টের মত করে কাই তৈরি করতে হবে। অতঃপর উক্ত কাইকে সমান তিনভাগে ভাগ করে এক ভাগ অল্প পানিতে গুলে ছোট ছোট বল তৈরি করে এবং দুই ভাগ বেশি পানিতে গুলে তরল করে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। বল তৈরির ফলে কাদার নিচের ও উপরিভাগের প্রাণীসমূহ মারা যাবে এবং গুলানো অংশ উত্তমরূপে র ফলে পানিতে অবস্থিত প্রাণী মারা যাবে। এর পর জাল টেনে পানি উলট-পালট করে দিলে রোটেনন তড়িৎ কার্যকর হবে। ১৫-২০ মিনিট পর মাছ ভাসতে শুরু করলে খুব দ্রুত জাল টেনে মাছ ধরে ফেলতে হবে। কারণ একটু বেশি দেরি হলে মৃত মাছ পুকুরের তলায় চলে যাবে, মাছ জালে উঠবে না। ভোর বেলায় রোটেনন প্রয়োগ করা ভালো। কারণ এমনিতেই তখন পানিতে কম অক্সিজেন থাকে এর সঙ্গে যাগে হয় রোটেনন এর বিষক্রিয়া ফলে খুব সহসাই মাছ মারা যায়। রোটেনন দিয়ে অবাঞ্চিত মাছ মারা গেলেও চিংড়ি ও কাকড়া মারা যায় না।

উদাহরণ: ৯.১ % শক্তিমাত্রার ৩ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট ১০ শতাংশ পুকুরের রোটেননের পরিমাণ নির্ণয় করতে হলে

রোটেননের পরিমাণ = পুকুরের আয়তন (শতাংশ) × গভীরতা × রোটেননের প্রয়োগ মাত্রা

= ১০ × ৩ × ১৮= ৫৪০ গ্রাম

রোটেনন পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন নষ্ট করে ফেলে তাই পুকুরে যখন রোটেনন প্রয়োগ করা হয় তখন ঐ পানিতে অবস্থিত অবাঞ্চিত মাছ পানি হতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। মাছ যখন পানি হতে অক্সিজেন গ্রহণ করার নিমিত্ত নিঃশ্বাস নিতে থাকে তখন পানিতে দ্রবীভূত রোটেনন এর বিষক্রিয়াদ্বারা মাছের ফুলকার ল্যামেলি আক্রান্ত হয়। অর্থাৎ ফুলকায় যে গিল ল্যামেলি আছে সেই গিল ল্যামেলিগুলো ফেটে যায়। ফলে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন হিমাগোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন রূপে দেহে পরিবাহিত হতে পারে না। অক্সিজেন পরিবহনের সেই মেকানিজম বন্ধ হয়ে যায় ফলে মাছ অক্সিজেন গ্রহণ করতে না পেরে মারা যায়। রোটেনন প্রয়োগ করলে পুকুরে নিম্নলিখিত বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়—

$O_2 + Hb = HbO_2$ (অক্সিজেন+ হিমোগ্লোবিন= অক্সিহিমোগ্লোবিন)

এছাড়াও বিষযুক্ত পানি যখন নিঃশ্বাস-এর মাধ্যমে সরাসরি মাছের পাকস্থলীতে প্রবেশ করে তখন অনুরূপ প্রতিক্রিয়ায় মাছের অভ্যন্তরীণ অংশ, যেমন- পরিপাকতন্ত্র, হৃদযন্ত্র, লিভার, ফুসফুস প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত রক্তনালির দ্রুত ক্ষতিসাধন হয়। ফলে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং মাছ মারা যায়।

খ. ফসটক্সিন/কুইকফস/সেলফস: এগুলো এক ধরনের কীটনাশক। বাজারে ৩ গ্রাম ওজনের ট্যাবলেট আকারে এগুলো পাওয়া যায়। পুকুরে মৎস্যভুক ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণে এগুলো খুবই কার্যকর। তবে মানুষের জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত বিধায় সতর্কতার সাথে এগুলো ব্যবহার করতে হয়। ফসটক্সিন প্রয়োগের মাত্রা নিচে উল্লেখ করা হলো।

সারণি: পুকুরে কমটক্সিন প্রয়োগ মাত্রা।

পানির আয়তন (শতাংশ)	পানির গভীরতা	ট্যাবলেটের সংখ্যা
১	১ ফুট	১টি
১০	১ ফুট	১০ টি
৩০	১ ফুট	৩০ টি
৪০	৫ ফুট	২০০ টি
৫০	৫ ফুট	২৫০ টি

প্রয়োগ পদ্ধতি: ট্যাবলেটগুলো সমানভাবে সমত পুকুরে ছিটিয়ে দেয়ার পর জাল টেনে পানি উলট-পালট করে দিতে হবে। ট্যাবলেট প্রয়োগের ১-২ ঘণ্টা পর মাছ মরে ভাসতে শুরু করলে সাথে সাথে জাল টেনে সব মৃত মাছ উঠিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। কম গভীর পুকুরে এর কার্যকারিতা বেশি।

বিষক্রিয়ার মেয়াদকাল: প্রায় ৮ - ১০ দিন।

উদাহরণ: ৫ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট ১৫ শতাংশ পুকুরের ফসটক্সিন ট্যাবলেট পরিমাণ নির্ণয় করতে হলে

ফসটক্সিনের পরিমাণ = পুকুরের আয়তন (শতাংশ) × গভীরতা × ফসটক্সিনের প্রয়োগ মাত্রা
= ১৫ × ৫ × ১ = ৭৫ টি

গ. ব্লিচিং পাউডার: যদিও এটা পানি বিশোধনে ব্যবহৃত হয় তবু এটাদ্বারা মৎস্যভুক ও অবাঞ্চিত মাছ দূর করা যায়। ব্লিচিং পাউডার পুকুরে চুনেরও কাজ করে, ফলে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করলে আর চুন প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগের ফলে পুকুরের সমস্ত মাছ, ব্যাঙ, শামুক, ঝিনুক, পরজীবী প্রাণী এবং অন্যান্য রোগজীবাণু মারা যায়। ব্লিচিং পাউডারের প্রয়োগমাত্রা নিচে উল্লেখ করা হলো।

২০২২

সারণি: পুকুরে ব্লিচিং পাউডারের প্রয়োগমাত্রা

পানির আয়তন (শতাংশে)	পানির গভীরতা	ব্লিচিং পাউডারের পরিমাণ
১	১ ফুট	১ কেজি
২০	১ ফুট	২০ কেজি
৩৫	১ ফুট	৩৫ কেজি
৪৫	৫ ফুট	২২৫ কেজি
৫৫	৫ ফুট	২৭৫ কেজি

প্রয়োগ পদ্ধতি: ব্লিচিং পাউডার সুবিধাজনক কোনো পাত্রে পরিমাণমত নিয়ে পানি দিয়ে গুলে দ্রবণ তৈরি করতে হবে। তারপর এই দ্রবণ নিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এ পাউডার সকালে ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। পাউডার প্রয়োগের ৩০ মিনিট পরেই মাছ মরতে শুরু করলে জাল টেনে মাছ পুকুর থেকে তুলে ফেলতে হবে।

চিত্র: ঘেরে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ

বিষক্রিয়ার মেয়াদকাল: প্রায় ৮ - ১০ দিন।

> **উদাহরণ:** ৪ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট ২৫ শতাংশ পুকুরের ব্লিচিং পাউডারের পরিমাণ নির্ণয় করতে হলে ব্লিচিং পাউডারের পরিমাণ: পুকুরের আয়তন (শতাংশ) × গভীরতা × ব্লিচিং পাউডারের প্রয়োগ মাত্রা
> = ২৫ × ৪ × ১ = ১০০ কেজি

ঘ. চা বীজের খৈল: এ পাউডারের মধ্যে স্যাপোনিন নামক এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ থাকে, যা পানিতে দ্রবীভূত হয়ে মাছের রক্তের লোহিত কণিকাগুলোকে জমাট করে ফেলে, ফলশ্রুতিতে মাছ মারা যায়। চা বীজের গুঁড়া হতে এটা তৈরি করা হয়। চা বীজের খৈলের বিষাক্ততার মেয়াদকাল ৩ দিন হলেও পরে সার হিসেবে কাজ করে। পানির তাপমাত্রা বেশি থাকলে এ বিষক্রিয়া তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। তাপমাত্রা কম হলে এটা ধীরে ধীরে কাজ করে ফলে অনেক সময় ধরে এর কার্যকারিতা থাকে। তাই চা বীজের খৈল তাপমাত্রা বাড়ার আগে সকালের দিকে প্রয়োগ করা ভাল। বিষ প্রয়োগের ৩-৫ ঘণ্টার মধ্যেই মাছগুলো ভারসাম্য হারিয়ে ভাসতে শুরু করে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যায়। এটা প্রয়োগে শুধু মাছ মারা যায় না ব্যাঙাচি, ছোট শামুক, জোঁক এবং কিছু কিছু পোকামাকড়ও মারা যায়।

নির্ধারিত মাত্রায় চা বীজ খৈল প্রয়োগ করলে পুকুরের পানিতে অবস্থিত রটিফার, কপিপিড প্রভৃতি খাদ্যকণার কোনো ক্ষতি হয় না। চা বীজ খৈলের প্রয়োগমাত্রা নিচে উল্লেখ করা হলো।

সারণি: পুকুরে চা বীজ খৈলের প্রয়োগ মাত্রা

পানির আয়তন (শতাংশ)	পানির গভীরতা	চা বীজ খৈলের পরিমাণ
১	১ ফুট	১ কেজি
১৫	১ ফুট	১৫ কেজি
২৫	১ ফুট	২৫ কেজি
৪০	৫ ফুট	২০০ কেজি
৪৫	৫ ফুট	২২৫ কেজি

প্রয়োগ পদ্ধতি: নির্ধারিত পরিমাণ চা বীজের খৈল প্রথমে অল্প পানিতে গুলে নিয়ে তার সাথে আরও পানি মিশিয়ে পাতলা দ্রবণ তৈরি করে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। এর ফলে স্যাপোনিন নামক বিষাক্ত পদার্থ পানিতে দ্রবীভূত হয়। প্রখর সূর্যালোকিত দিনে সকালের দিকে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। পাউডার প্রয়োগের ২০-৩০ মিনিট পরেই মাছ মরতে শুরু করলে জাল টেনে মাছ ধরতে হবে। এই দ্রবণ প্রয়োগের সময় পুকুরে পানির গভীরতা যতদূর সম্ভব কম রাখলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

বিষক্রিয়ার মেয়াদকাল: প্রায় ২ - ৩ দিন।

চ. মহুয়া বীজের খৈল: মহুয়া বীজ হতে তৈল নিষ্কাশনের পর যে খৈল অবশিষ্ট থাকে, এটা বিষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এতে স্যাপোনিন (৪-৬%) নামক এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ বিদ্যমান থাকে। আমাদের দেশে উত্তরাঞ্চলে এই গাছ সামান্য পরিমাণে দেখা যায়। এটাও প্রথমে বিষ হিসেবে এবং পরে সার হিসেবে কাজ করে। এটা প্রয়োগ করার ২ ঘণ্টার মধ্যেই বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এবং মাছ মরে ভারসাম্যহীনভাবে ভাসতে শুরু করে। মহুয়া বীজের খৈল প্রয়াগমাত্রা নিচে উল্লেখ করা হলো।

সারণি: পুকুরে মহুয়া বীজ খৈলের প্রয়োগমাত্রা পানির

পানির আয়তন (শতাংশ)	পানির গভীরতা	মহুয়া বীজ খৈলের পরিমাণ
১	১ ফুট	৩ কেজি
১০	১ ফুট	৩০ কেজি
২০	১ ফুট	৬০ কেজি
৩০	৫ ফুট	৪৫০ কেজি
৪০	৫ ফুট	৬০০ কেজি

প্রয়োগ পদ্ধতি: প্রথমে অল্প পানিতে পরিমাণমত মহুয়া বীজের খৈল গুলে নিয়ে তার সাথে আরও পানি মিশিয়ে পাতলা দ্রবণ তৈরি করে প্রখর সূর্যালোকিত দিনে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। পাউডার প্রয়োগের ২০-৩০ মিনিট পরেই মাছ মরতে শুরু করলে জাল টেনে মাছ ধরতে হবে নতুবা এই মাছ পচে পুকুরের পরিবেশকে নষ্ট করে ফেলতে পারে।

বিষক্রিয়ার মেয়াদকাল: প্রায় ৩-৪ দিন ।

সতর্কতা

- ব্লিচিং পাউডার বা রোটেনন পানিতে গুলানো এবং ছিটানোর সময় যাতে নাকে বা মুখে ঢুকতে পারে তার জন্য মুখে গামছা বেঁধে নিতে হবে ।
- বাজে মাছ দমনের জন্য শুধুমাত্র ব্লিচিং পাউডার ব্যবহারই যথেষ্ট, তবে রোটেনন ব্যবহার করেও ভালো ফল পাওয়া যায় ।
- ব্লিচিং ব্যবহার করার পর একই ঘেরে একই সাথে চুন ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই । ব্লিচিং ব্যবহারের পর নিয়মিত হররা টেনে দিলে নার্সারিতে অধিক শেওলা জন্মানোর সম্ভাবনা কমে যাবে ।
- ব্লিচিং পাউডার বা রোটেনন পানিতে ছিটানোর সময় বাতাসের অনুকূলে থেকে ছিটাতে হবে ।
- পাস্টিকের গামলাতে গুলানো যাবে না ।
- ব্লিচিং পাউডার বা রোটেনন শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে ।

নার্সারিতে চুন প্রয়োগ

পুকুরে অবাঞ্চিত ও রাক্ষুসে মাছ দমনের পরবর্তী ধাপ হলো চুন প্রয়োগ । মাটির উর্বরতা শক্তির উপর চিংড়ির ফলন নির্ভরশীল বিধায় মাটির শোধন ও উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করা প্রয়োজন । পুকুরে চুন প্রয়োগ করলে একসঙ্গে অনেকগুলো উপকার পাওয়া যায় । এর মধ্যে প্রধান প্রধান গুণাবলিগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো—

১. চুন চিংড়ির চাষের পরিবেশকে অর্থাৎ মাটি ও পানির অম্লত্ব ও ক্ষারত্বকে নিরপেক্ষ করে । পানির অম্লীয় ও ক্ষারকীয় গুণকে ভারসাম্যের মধ্যে রাখে তথা পানির পিএইচ চিংড়ি চাষের অনুকূল অবস্থা বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে । পানির পিএইচ ৭.৫-৮.৫ এর মধ্যে থাকলে সেই পুকুরে চিংড়ির বৃদ্ধি ও ফলন ভালো হয় ।

২. চুন বাফার দ্রবণ হিসেবে মাটি বা পানির পিএইচ নিয়ন্ত্রণ করে ।

৩. চুন প্রয়োগের ফলে পুকুরের মাটি থেকে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকারক উপাদানসমূহ তথা খনিজ পদার্থ বা মিনারেলস (যা পানির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক) অতি সহজেই মুক্ত হয়ে পানিতে মিশে । ফলে পুকুরের স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায়, যা চিংড়ির প্রাকৃতিক খাবার তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে ।

৪. চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর এমন ধরনের রোগ বিস্তারের উৎস, রোগ জীবাণু এবং রোগজীবাণু পরিবাহক পরজীবীসমূহকে চুন ধ্বংস করে তথা জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে ।

৫. চুন পানিতে বিদ্যমান অতিরিক্ত জৈব কণা ও কাদাকে অধঃক্ষেপ না করে পানিকে পরিষ্কার রাখতে তথা দূর করতে সহায়তা করে । এর ফলে পুকুরে পর্যাপ্ত আলোর অনুপ্রবেশ নিশ্চিত হয়, ফলে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়ে যায় ।

৬. পুকুরের তলদেশে সঞ্চিত বাজে গ্যাস দূর করে ।

৭. চুনের ক্যালসিয়াম চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধিতে বিশেষ করে প্রজনন কালে জুণের বর্ধন ও খোসা গঠনে সহায়তা করে ।

৮. চুন পানিতে সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে পানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তথা পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্যমালা ফাইটোপ্ল্যাংকটুন ও জুপ্ল্যাংকটন তৈরি করে পানির বর্ণ সবুজ করতে সহায়তা করে।

৯. জৈব পদার্থসমূহ ভেঙে গিয়ে মাটির ও পানির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে।

১০. প্রয়োজনীয় উপকারী জীবাণুদের বংশ বৃদ্ধিতে ও জৈব পদার্থসমূহের সুষ্ঠু পচনের জন্য চুন সহায়তা করে।

১১. চুন পুকুরের পানিতে তন্তুময় অ্যালজি থেকে মুক্ত রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

১২. সালাকেসংশ্লেষণের জন্য পর্যাপ্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরির মাধ্যমে চুন পানিতে অক্সিজেন স্বল্পতার মাত্রাকে কমিয়ে আনে। সালাকেসংশেষণ প্রক্রিয়াকে বৃদ্ধির মাধ্যমে চুন পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

১৩. চুন প্রয়োগের ফলে জৈব পদার্থের পচন ক্রিয়া দ্রুত হয় এবং পুকুরের তলদেশ থেকে ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বের করে দেয় এবং পুকুরের তলার মাটি নিরপেক্ষ হয়।

১৪. চুন পুকুরের পানিতে বিদ্যমান অতিরিক্ত ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম এবং পটাসিয়াম-এর বিষক্রিয়া দূর করে এবং পানিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ফলে জলজ পরিবেশ থেকে জটিল যৌগসমূহ গ্রহণণাপযাগেী হয়।

১৫. চুন প্ল্যাংকটনের বৃদ্ধির জন্য কাদায় আবদ্ধ ফসফরাসকে মুক্ত করে দেয়।

১৬. চুন মাটি এবং পানির মধ্যে সালফিউরিক অ্যাসিডের মত অত্যন্ত ক্ষতিকারক পদার্থের স্থায়ী বন্ধ হওয়াকে প্রতিরোধ করে।

১৭. চুনের অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম পুকুরে সার হিসেবে কাজ করে।

১৮. চুন প্রয়োগে পানির ঘালোত্ব দুর হয়। ফলে পুকুরে সালাকেসংশেষণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

১৯. চুন থেকে প্রাপ্ত ক্যালসিয়াম চিংড়ির খালস তৈরির একটি অন্যতম উপাদান। ক্যালসিয়ামের অভাবে। অনেক সময় চিংড়ির খোলস বদল হয় না বা বিলম্বিত হয়। এমনকি খোলস বদল হলেও তা শক্ত হতে দেরি হয়, ফলে চিংড়ির দেহ দীর্ঘক্ষণ নরম থাকে। চুনের ক্যালসিয়াম চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

চুনের প্রকারভেদ

বাজারে বিভিন্ন ধরনের চুন পাওয়া যায়, যেমন- পাথুরে চুন, পোড়া চুন, কলিচুন ইত্যাদি। এছাড়াও শামুক ও ঝিনুকের খোলস পুড়িয়েও এক ধরনের চুন পাওয়া যায়, তবে এগুলো চিংড়ি চাষের পুকুরে ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া যায় না। এর সবগুলোই ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ। বাজারে প্রাপ্ত চুনসমূহ হলো ?

ক) পাথুরে চুন : $CaCO_3$,

খ) পোড়া চুন : CaO

গ) কলি চুন : $Ca(OH)_2$,

ঘ) ডলোমাইট : $CaMg(CO_3)_2$,

ঙ) জিপসাম : $CaSO_4.2H_2O$

২০২২

প্রয়োগের মাত্রা: পানি ও মাটির পিএইচ, পুকুরের মাটির ধরণ, (যেমন- বেলে, দোআঁশ, এঁটেল), পুকুরের বয়স, চুনের প্রকার ও গুণাগুণ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের উপর চুন প্রয়োগের মাত্রা নির্ভর করে। কাদা মাটি, এঁটেল মাটি ও লাল মাটির পুকুরে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে একটু বেশি চুন প্রয়োজন হয়। ঘের দীর্ঘ দিন অব্যাহত ও পচা আবর্জনায় পূর্ণ থাকলে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে চুন বেশি দরকার হয়। সাধারণত শতাংশে প্রতি এক কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হয়। পোড়া চুনের ক্ষমতা পাথুরে চুনের দ্বিগুণ এবং কলিচুনের ক্ষমতা পাথুরে চুনের দেড় গুণ।

পিএইচ-এর উপর ভিত্তি করে চুন প্রয়োগের মাত্রা

পিএইচ মান	৩-৫ এর মধ্যে	৫-৬ এর মধ্যে	৬-৭ এর মধ্যে
পোড়া চুনের পরিমাণ	৬ কেজি/শতাংশে	৪ কেজি/শতাংশে	১-২ কেজি/শতাংশে

ব্যবহার পদ্ধতি: পুকুর তৈরির সময় প্রয়োজনীয় চুন একটি মাটির চাড়ি বা গামলার মধ্যে কমপক্ষে ১২-২৪ ঘণ্টা আগে ভিজিয়ে নিতে হবে। তারপর প্রয়োজনীয় চুন পাড়সহ সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। চুন ব্যবহারের সময়কাল হলো চাষ দেয়ার ২-৩ দিন পর অথবা বিষ প্রয়োগের ৭-৮ দিন পর।

সতর্কতা

- ভেজানোর সময় চুন ফুটতে থাকে তাই এ সময় সতর্ক থাকুন।
- পোড়া চুন এবং কলিচুন অত্যন্ত ক্ষারীয় তাই এটি ব্যবহারে পিএইচ দ্রুত বেড়ে যায়। এজন্য পুকুর শুকানো অবস্থায় তা ব্যবহার করা নিরাপদ।
- চুন ব্যবহারের সময় নাক ও মুখ গামছা দিয়ে বেঁধে নিতে হবে এবং বাতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে।
- প্লাস্টিকের বালতিতে চুন গুলানো যাবে না।
- চুন শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে। ব্যবহারের পর পাত্র ভালোভাবে পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

চিত্র: শুকনো ঘেরে চুন প্রয়োগ

চিত্র: পানি ভর্তি ঘেরে চুন প্রয়োগ

নার্সারিতে সার প্রয়োগ

চিংড়ি পোনা মজুদের উপযুক্ত প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য ঘেরে সার প্রয়োগ জরুরি। এ লক্ষ্যে ঘেরে ব্লিচিং পাউডার বা ফসটক্সিন ট্যাবলেট প্রয়োগের ৩-৫ দিন পরে

- ঘের ও নার্সারির পানিতে ২০০ গ্রাম/শতক হারে ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম/শতক হারে টিএসপি, ৫০ গ্রাম/শতক হারে পটাশ সার এবং ১২৫ গ্রাম/শতক হারে চিটাগুড় প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- সার প্রয়োগের ৫-৭ দিনের মধ্যে ঘেরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য (প্ল্যাংকটন) উৎপন্ন হবে বলে আশা করা যায়। যদি প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা কম হয় তাহলে পুনরায় প্রথম ডোজের অর্ধেক পরিমাণ সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। সার প্রয়োগের ৩-৫ দিনের মধ্যে ঘেরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য (প্ল্যাংকটন) উৎপন্ন হবে। এমতাবস্থায়, ঘের পোনা মজুদের জন্য প্রস্তুত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

চিত্রঃ নার্সারিতে সার প্রয়োগ

পোনা মজুদকরণ

সার প্রয়োগের ৭ দিন পরে ঘেরের পানিতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য (প্ল্যাংকটন) উৎপন্ন হবে বলে আশা করা যায়। তখন এই পদ্ধতিতে ঘেরের জন্য শতকে ২০০টি সুস্থ-সবল বাগদা পোনা পরিমিত অভ্যস্তকরণ করে নার্সারিতে মজুদ করতে হবে। নার্সারিতে পোনা মজুদের ক্ষেত্রে খুবই যত্নবান হতে হবে। মনে রাখতে হবে, যথাযথভাবে পোনা মজুদ এবং মজুদকালীন খাপ-খাওয়ানোর উপর পোনা বেঁচে থাকার হার বহুলাংশে নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে পালনীয় পরামর্শগুলো হলো

ক) ব্লিচিং পাউডার দেওয়ার ৮-১০ দিন এবং রোটেনন প্রয়োগের ৫-৬ দিন পর পোনা ছাড়া উচিত।

খ) পোনা ছাড়ার পূর্বে নার্সারি থেকে কিছু পানি নিয়ে তাতে কয়েকটি পোনা দিয়ে ২৪ ঘন্টা রেখে পরীক্ষা করে তারপর পোনা ছাড়া উচিত।

গ) পিসিআর পরীক্ষিত সুস্থ পোনা ক্রয় ও মজুদ করা উচিত।

ঘ) পোনাকে নার্সারির পানিতে খাপ খাওয়ানোর জন্য (বিশেষ করে তাপমাত্রা ও লবণাক্ততার জন্য) আধা থেকে ১ ঘন্টা খাপ খাওয়ানো দরকার। পোনা বাঁচার হার বাড়ানো এবং পীড়ন কমানোর জন্য খাপ খাওয়ানো দরকার।

ঙ) নার্সারিতে পোনা লালনের সংখ্যা প্রতিবারে শতাংশ প্রতি ৪০০০ টি পর্যন্ত হতে পারে।

চ) পালন ঘেরে মাসে বিঘা প্রতি অনধিক ৮০০০টি পোনা মজুদ করা ভালো।

ছ) ভরদুপুরে বা যদি ঘেরের পানি গরম থাকে তখন পোনা ছাড়া যাবে না। এছাড়া বৃষ্টির সময় বা পানির রং অস্বাভাবিক থাকলেও ঐ সময়ে ঘেরে পোনা ছাড়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

জ) পোনা ছাড়ার পূর্বে অবশ্যই ঘেরের লবণাক্ততা পরীক্ষা করে নিতে হবে, কারণ লবণাক্ততার পার্থক্য খুব বেশি হলে মুহূর্তেই সব পোনা মারা যেতে পারে।

চিত্রঃ সুস্থ বাগদা পোনা

ভালো ও সুস্থ পোনা চেনার উপায়সমূহ হলো, ভালো পোনা—

- স্রোতের বিপরীতে চলাফেরা করে।
- তলায় জটলা বাধে না।
- প্রায় সমান আকারের এবং অপেক্ষাকৃত বড় সাইজের হয়ে থাকে।

চিত্রঃ নার্সারিতে পোনা মজুদ

নার্সারি পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ ব্যবস্থাপনা

বাগদার আশানুরূপ উৎপাদন পেতে হলে প্রয়োজনীয় খাবার প্রয়োগ করতে হবে। তাই

- পোনা মজুদের পরের দিন হতে পরিমিত খাবার সকাল-সন্ধ্যায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।
- নার্সারিতে পোনা মজুদের সর্বোচ্চ ১৪–২১ দিনের মধ্যে নার্সারি উন্মুক্ত করে আঙ্গুলী পোনা লালন পুকুরে অবমুক্ত করতে হবে।
- প্রতি ৭ দিন অন্তর কিছু জীবনত চিংড়ি ধরে ওজন নিতে হবে এবং ঘেরে মোট চিংড়ির ওজন (বায়োমাস) হিসেব করতে হবে।
- সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় খাবার কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রয়োগ করতে হবে। খাবার প্রয়োগে সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে খাবার বেশি না হয়।
- খাবার বেশি হলে তা পচে ঘেরের পানি নষ্ট হবে, দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যেতে পারে বা অনাকাঙ্ক্ষিত গ্যাস, যেমন- হাইড্রোজেন সালফাইড ও অ্যামোনিয়ার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে।
- খাবারের ট্রে ব্যবহার করে মাঝে মধ্যে খাবার গ্রহণের মাত্রা লক্ষ্য করতে হবে এবং প্রয়োজনে খাবার কম বা বেশি করা যেতে পারে।

চিত্রঃ নার্সারিতে খাদ্য প্রয়োগ

- যেহেতু নার্সারিতে স্বল্প জায়গায় বেশি পরিমাণ পোনা থাকে, তাই বাজার থেকে গুণগত মানসম্পন্ন খাবার কিনে তা ব্যবহার করা প্রয়োজন। নার্সারিতে প্রথম ৫ দিনে প্রতি হাজার পোনার জন্য দৈহিক ১৫ গ্রাম হিসেবে খাদ্য প্রদান করতে হবে। দ্বিতীয় ৫ দিনের জন্য হাজার প্রতি দৈহিক ৫ গ্রাম বাড়িয়ে ২০ গ্রাম করে খাদ্য দিতে হবে।

সারণি: পোনার বয়স অনুসারে খাবারের পরিমাণ

পোনার বয়স (দিন)	পোনার সংখ্যা	খাবারের পরিমাণ (গ্রাম)
১-৫	১০০০	১৫
৬-১০	১০০০	২০
১১-১৫	১০০০	২৫

দৈনিক খাদ্যের মোট পরিমাণকে ৪ ভাগ করে ৪ বারে খাবার প্রদান করতে হবে। তাতে খাদ্যের অপচয় কম হবে। সাধারণত খাদ্য প্রদানের সময়গুলো- ভোর ৬টা, সকাল ১০টা, বিকাল ৫টা এবং রাত ৯টা।

চিংড়ি চাষে পানি ব্যবস্থাপনা

যে কোনো জলজ উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীর ফলপ্রসূ চাষের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পানির কোনো বিকল্প নেই। অথচ সেই পানি ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাই চিংড়ি চাষের প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশে বর্তমানে উন্নত প্রচলিত পদ্ধতিতে বেশিরভাগ ঘেরে চিংড়ি চাষ হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে খুব কম ঘেরেই খাদ্য ব্যবহার করা হয়। বেশিরভাগ ঘেরেই প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতার উপরই চিংড়ির উৎপাদন নির্ভর করে। ঘেরের প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে চিংড়ি চাষের জন্য অবশ্যই ঘেরের পানি ব্যবস্থাপনার উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

চিংড়ি চাষে পানির প্রয়োজনীয়তা

ক) চিংড়ির চলাচলের জন্য

খ) চিংড়ির নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য

গ) চিংড়ির প্রাকৃতিক খাবার উৎপাদনের জন্য

ঘ) চিংড়িকে রোগবালাই হতে মুক্ত রাখার জন্য

অতএব পানি ব্যবস্থাপনার জন্য উপরালেখিত চারটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

ক. চিংড়ির চলাচলের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা

বেশিরভাগ উপকূলীয় ঘেরের তলদেশ অসমতল হওয়ায় ঘেরের সর্বত্র সমানভাবে পানি থাকে না। এমনকি কোনো কোনো ঘেরে দুই গানের মাঝামাঝি সময়ে ঘেরের প্রায় ৩০-৪০ ভাগ এলাকায় কোনো পানিই থাকে না। পানির গভীরতা কম ও স্বচ্ছতা বেশি থাকার ফলে তলদেশে সূর্যালোকে পৌছায়। ফলে নানান ধরনের উচ্চতর জলজ উদ্ভিদ (নাজাজ, কারা ইত্যাদি) জন্মে চিংড়ির চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে। এসব বিষয় বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে ঘেরের অধিকাংশ এলাকা চাষের আওতার বাইরে থাকে। ফলে চিংড়ির উৎপাদনের হারও অনেক কম হয়। অতএব ঘেরের সম্পূর্ণ এলাকা চাষযোগ্য করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

খ. চিংড়ির নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা

চিংড়ির স্বাভাবিক শ্বাস গ্রহণের জন্য পানিতে ৪ পিপিএম-এর বেশি দ্রবীভূত অক্সিজেনের প্রয়োজন। অক্সিজেন এক ধরনের গ্যাস। পানিতে অক্সিজেন ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় গ্যাস, যথা- কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি দ্রবীভূত থাকে। অপ্রয়োজনীয় গ্যাসসমূহের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে মজুদকৃত চিংড়ি মারা যেতে পারে। পানির গ্যাস ধারণের একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। যদি কোনো কারণে অপ্রয়োজনীয় গ্যাসের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজনীয় গ্যাসের পরিমাণ কমে যাবে। নিচের সারণিতে চিংড়ি চাষের জন্য বিভিন্ন গ্যাসের প্রয়োজনীয় মাত্রা দেয়া হলো।

গ. প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য পানি ব্যবস্থাপনা

প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বলতে পানিতে সাধারণত ফাইটোপ্ল্যাংকটন-এর উৎপাদনের হারকে বুঝায়। ফাইটোপ্লাংকটন শুধু পানিতে প্রাথমিক খাদ্যের যোগান দেয় না, সালাকেসংশেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিংড়ির শ্বাস গ্রহণ ও অন্যান্য প্রয়োজনে পানিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং ক্ষতিকর গ্যাসসমূহের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। পর্যাপ্ত ফাইটোপ্ল্যাংকটনের উপস্থিতি মাটির তলায় জন্মানো ক্ষতিকর উদ্ভিদ জন্মাতে বাধা সৃষ্টি করে এবং পানিতে দ্রবীভূত অতিরিক্ত নাইট্রোজেন ও ফসফরাস খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে পানিকে দুষণমুক্ত রাখে কথায় চিংডির সঠিক উৎপাদনের জন্য পানির প্রাকিতিক উৎপাদনশীলতা সহনশীল পর্যায়ে থাকা বিশেষ প্র এছাড়া পানিতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশসহ বিভিন্ন খাদ্যোপাদানের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ. চিংড়ির রোগ প্রতিরোধে পানি ব্যবস্থাপনা

যে কোনো পানিতেই চিংড়ি রোগের জীবাণু বিদ্যমান থাকে। উপযুক্ত পরিবেশ এবং চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলেই কেবলমাত্র রোগ জীবাণু চিংড়িকে আক্রমণ করতে সক্ষম হয়। সে পরিবেশ চিংড়ির বসবাসের জন্য অসহনশীল, সেই পরিবেশেই রোগ জীবাণুর বংশবৃদ্ধি বেশি হয় এবং চিংড়িকে আক্রমণ করতে সহায়ক হয়। চিংড়ির চলাফেরা কোনো কারণে অস্বাভাবিক কিংবা চিংড়িকে রোগাক্রান্ত মনে হলে তাৎক্ষণিকভাবে পানির পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন ও অ্যালাকালিনিটি পরীক্ষা করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। পানি পরিবর্তনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রবেশকৃত পানির গুণগতমান সহনীয় পর্যায়ে থাকে। উন্নত পদ্ধতির চিংড়ি চাষে জলাধারে পানি পরিশোধনপূর্বক ঘেরে সরবরাহ করা যেতে পারে। পানি পরিশোধনের জন্য ২০-২৫ পিপিএম হারে ব্লিচিং পাউডার ট্রিটমেন্ট করা যেতে পারে। রোগ প্রতিরোধের জন্য পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলি সহনশীল মাত্রায় বজায় রাখতে হবে।

নার্সারিতে আহরণ বা পোনা স্থানান্তর

নার্সারিতে পোনা লালনের সময় নিয়মিত তদারকি করতে হবে, অন্যথায় আসল উদ্দেশ্যই ব্যহত হবে। যথেষ্ট সতর্কতার সাথে নার্সারি উন্মুক্ত করে পোনা বেরিয়ে যাওয়ার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাজগুলো হলো

ক) নার্সারি তৈরির পাশাপাশি পালন ঘের পোনা ছাড়ার উপযোগী করা।

খ) নার্সারিতে পোনা ২-৩ সপ্তাহ লালন করার পর ঘের প্রস্তুত হয়ে থাকলে পোনা স্থানান্তর করা।

গ) নার্সারির দু পাশের নেট পানির উপরে তুলে দিয়ে পোনা বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করা।

২০২২

ঘ) নার্সারি দূরে হলে, জাল দিয়ে ছোট পোনা ধরেও পালন পুকুরে স্থানান্তর করা যেতে পারে। কাজটি ঠান্ডা পরিবেশে করা ভালো। তবে কাজটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় অনেক সময় আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায় না।

পালন ঘের ব্যবস্থাপনা

সার প্রয়োগঃ ঘেরে প্রাকৃতিক খাবারের ভারসাম্য রক্ষা ও সার্বিক পরিবেশ চিংড়ির পক্ষে সহনীয় রাখার জন্য সার প্রদান করা অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে পালনীয় পরামর্শগুলো হলোঃ

ক) প্রাকৃতিক খাবার উৎপাদনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনে শুধুমাত্র রাসায়নিক সার (ইউরিয়া, টিএসপি ইত্যাদি) ব্যবহার করা যেতে পারে।

খ) পানিতে প্রাকৃতিক খাবার কম থাকলে উপরোক্ত মাত্রায় ১৫ দিন অন্তর ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ) ঘেরে শেওলার আধিক্য দেখা দিলে ইউরিয়াসহ সকল রাসায়নিক সার ব্যবহার না করাই ভালো।

পানি পুনঃউত্তোলন/রিজার্ভার ব্যবস্থাপনাঃ পালন ঘেরে প্রয়োজনে শোধিত পানি সরবরাহের জন্য রিজার্ভারের গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই রিজার্ভারে পানি পুনঃউত্তোলন, শোধন ও জৈব নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে

ক) পালন ঘেরের প্রয়োজন অনুযায়ী রিজার্ভারে পানি উঠাতে হবে।

খ) সম্ভব হলে ভালো উৎস থেকে পানি সংগ্রহ এবং তা ঘন নেটের মাধ্যমে হেঁকে দিতে হবে।

গ) ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পানি শোধনের ৪-৫ দিন পর তা পালন ঘেরে ব্যবহার করতে হবে।

ঘ) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রিজার্ভারসহ পুরো ঘেরের জৈব নিরাপত্তা কোনোভাবেই শিথিল করা যাবে না।

ঙ) ভূগর্ভস্থ পানি ঘেরে উত্তোলন ব্যবহার করা পরিবেশসম্মত নয়।

চ) পানি শাধেনের প্রক্রিয়াটি রিজার্ভারের ক্ষেত্রেও একই রকম হবে।

চিত্রঃ পালন ঘেরে পানি পুনঃউত্তোলন

পীড়ন নিয়ন্ত্রণ: চিংড়ি বিভিন্নভাবে পীড়নের (শেওলা পরিষ্কার, জাল টানা ইত্যাদি) শিকার হয়ে থাকে, যা চিংড়ি মৃত্যুর তথা সামগ্রিক চিংড়ি উৎপাদন কমে যাওয়ার একটি বড় কারণ । এক্ষেত্রে পালনীয় দিকগুলো হলো

ক) ঘেরে কোনো রকম শেওলা রাখা যাবে না, তবে একই সাথে পুরো ঘেরের শেওলা পরিষ্কার করা অনুচিত ।

খ) ঘেরটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে প্রতিদিন একটি করে অংশ পরিষ্কার করা যেতে পারে । তুলে ফেলা । শেওলা ঘেরের পানিতে তূপীকৃত করা যাবে না ।

গ) চিংড়ি ছোট থাকা অবস্থায় অধিক রোদ্র, কম পানি এবং গোণের সময় বা খোলস বদলানোর সময় শেওলা পরিষ্কার না করাই ভালো ।

ঘ) যদি কোনো কারণে আংশিক আহরণের প্রয়োজন হয়, তাহলে বড় ছিদ্র আটল, চাড়, জাল ইত্যাদি দিয়ে ঘেরে চিংড়ি ধরা উত্তম । তাতে ছোট চিংড়িগুলো বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে এবং আহত হবে না ।

ঙ) পালন ঘেরে ব্লিচিং পাউডারের পর থেকে কিছুদিন নিয়মিত হররা টেনে দিলে শেওলা কম হয় ।

চ) প্রতি গাণের সময় ডলোমাইট দিলে ভালো হয়, তবে বৃষ্টির পর তা প্রয়োগ করা আবশ্যক । বিঘা প্রতি (৩৩ শতাংশ) ২ কেজি হারে ডলোমাইট প্রয়োগ করা যেতে পারে । মাটি ও পানির ধরনভেদে এর পরিমাণ কম বেশি হতে পারে ।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা (প্রাকৃতিক ও সম্পূরক): প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি প্রত্যাশিত উৎপাদন পাওয়ার জন্য ঘেরে সম্পূরক খাবারের ব্যবহার অপরিহার্য । ঘেরে জীবিত চিংড়ির পরিমাণ হিসেব করে খাবারের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে । এক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিষয়গুলো হলো

ক) চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধিতে প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পরিমাণে সম্পূরক খাবার দিতে হবে ।

খ) সম্পূরক খাবারের মধ্যে বাজার থেকে তৈরি গুণগত মানসম্পন্ন খাবার কিনে ব্যবহার করা যায়, আবার উপাদান সংগ্রহ করে ঘরে তৈরি করেও তা প্রয়োগ করা যায় ।

গ) অ্যান্টিবায়োটিক মুক্ত খাবার ব্যবহার করা ।

ঘ) প্রত্যাশিত গতিতে ঘেরে চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি না হলে নমুনায়নপূর্বক চিংড়ির প্রকৃত পরিমাণের উপর ভিত্তি করে খাবারের পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করতে হবে ।

ঙ) চিংড়ির বয়স ১ মাস হলে পালন ঘেরে কম খরচে তৈরি খাবার ট্রে ঝুলিয়ে দিতে হবে এবং চাহিদাভিত্তিক খাবার প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে । তাতে খাবারের অপচয় কমে যাবে । ট্রের সংখ্যা প্রতি হেক্টরে ৪০-৬০টি পর্যন্ত হতে পারে ।

চ) গাণের সময় চিংড়ি খোলস পাল্টায় এবং কম খাবার গ্রহণ করে । তাই শুধুমাত্র ঐ সময়ে সম্পূরক খাবার প্রদানের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে ।

ছ) দৈনিক খাদ্যের মোট পরিমাণকে ৪ ভাগ করে ৪ বারে খাবার প্রদান করতে হবে, তাতে খাদ্যের অপচয় কম হবে ।

জ) সাধারণত খাদ্য প্রদানের সময়গুলো হলো- ভোর ৬টা, সকাল ১০টা, বিকাল ৫টা এবং রাত ৯টা ।

আগাছা নিয়ন্ত্রণ: অতিরিক্ত আগাছা ঘেরের জন্য ক্ষতিকর, তবে সাধারণ পদ্ধতির ঘেরে শতকরা ৩০-৪০ ভাগ পর্যন্ত আগাছা আবৃত থাকলে গ্রহণযোগ্য হবে । কিন্তু উন্নত পদ্ধতিতে চাষকৃত চিংড়ি ঘেরে কোনো ধরনের আগাছা রাখায় বাঞ্ছনীয় । এক সাথে পুরো ঘেরের আগাছা পরিষ্কার না করে ২-৩ দিন সময় নিয়ে, ঘেরটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তা সম্পন্ন করা যেতে পারে ।

নমুনায়ন ও পর্যবেক্ষণ: চিংড়ির নিয়মিত নমুনায়ন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং সর্বোপরি পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। প্রতি ১৫ দিন অন্তর চিংড়ি ধরে নমুনায়ন ও পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। বৃদ্ধি বা রোগ সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যার দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সে সময় নিচের সারণিতে উল্লেখিত বিষয়গুলো অনুসরণীয়।

সারণি: চিংড়ির নমুনায়নের সময় পর্যবেক্ষণ বিষয় ও করণীয়

ক্রমিক নং	পর্যবেক্ষণ বিষয়	করণীয়
১	শিরায়/পেটে খাবার আছে কিনা	খাবার না থাকলে, কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং প্রয়োজনে খাবার প্রদান বৃদ্ধি করতে হবে
২	খোলসের উপর সাদা চাকা চাকা দাগ আছে কিনা	চিংড়ির ভাইরাস হলো কিনা নিশ্চিত হয়ে প্রয়োজনে উদ্যোগ গ্রহণ
৩	ফুলকা কালো হয়ে গেছে কিনা	চিংড়ি আক্রান্তের সংখ্যা বেশি হলে, ঘেরে হররা/পালা টেনে দিতে হবে এবং স্বল্পমাত্রায় চুন প্রয়োগ করতে হবে
৪	লেজ ফোলা এবং তাতে পানি জমেছে কিনা	চিংড়ি আক্রান্তের সংখ্যা বেশি হলে, বিঘা প্রতি ১.৫ কেজি হিসেবে পটাশ পানিতে গুলিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে
৫	চিংড়ি দুর্বল/সতেজ কিনা	দুর্বল চিংড়ি বেশি হলে কারণ নির্ণয় করে প্রয়োজনে স্বল্প পরিমাণে আহরণের উদ্যোগ নিতে হবে
৬	খোলস নরম/শক্ত কিনা	নরম চিংড়ি সংখ্যায় বেশি হলে কারণ নির্ণয় করে চুন প্রয়োগ করতে হবে
৭	মাংশ এবং খোলসের মধ্যে কোনো ফাঁকা আছে কিনা	খাবার প্রদানের তালিকা পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজনে পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে
৮	বয়স অনুযায়ী বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা	কমপক্ষে ১৫ দিন অন্তর অন্তর পরীক্ষা করতে হবে

রোগ প্রতিকার ও ব্যবস্থাপনা: যদি ঘেরের পরিবেশ ভালো রাখা যায়, তাহলে সংক্রামক জীবাণু দুর্বল থাকবে এবং রোগবালাই হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে, ফলশ্রুতিতে চিংড়ি ভালো থাকবে। বাজারে বর্তমানে বিভিন্ন কোম্পানির অনেক ধরনের প্রোবায়োটিক বেরিয়েছে। চিংড়ি বিশেষজ্ঞের মতামতের ভিত্তিতে মানসম্মত প্রাবোয়াটিক তথা পরিবেশ সহায়ক অণুজীব প্রয়োগ করা যেতে পারে। যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হলে তাতে প্রাকৃতিক খাদ্য রূপান্তরের পাশাপাশি দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং রোগ সংক্রমণ থেকে অনেকাংশে নিরাপদ থাকা যায়।

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. প্রতি বিঘা পালন ঘেরের জন্য নার্সারির আয়তন কত শতাংশ হওয়া উচিত?
২. রোটেনন কি ও বাজারে সচরাচর প্রাপ্ত রোটেননের মাত্রা কত?
৩. রোটেনন প্রয়োগের ফলে মাছের দেহে কী বিক্রিয়া সংঘটিত হয়?
৪. ফসটক্সিনের বিষক্রিয়ার মেয়াদকাল কত?
৫. চা বীজের খৈলের বিষক্রিয়ার মেয়াদকাল কত?
৬. পাথুরে চুন ও জিপসামের সংকেত লিখ।
৭. নার্সারি পুকুর প্রস্তুতকালে প্রতি শতাংশে কী পরিমাণ চুন প্রয়োগ করা হয়?
৮. বাগদা চিংড়ির পিএল নার্সারি পুকুরে কত দিন লালন-পালন করা হয়?
৯. বাগদা চিংড়ির নার্সারি পুকুর প্রস্তুতির সময় সার প্রয়োগের মাত্রা কত?
১০. বাগদার নার্সারি পুকুরে কোন সময় খাদ্য প্রয়োগ করা উচিত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাগদা চিংড়ির নার্সারির প্রয়োজনীয়তা কি?
২. বাগদা চিংড়ির নার্সারি ব্যবস্থাপনা বলতে ক বোঝ?
৩. রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ কি দিয়ে দমন করা হয়?
৪. ব্লিচিং পাউডার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়?
৫. বাগদা চিংড়ির নার্সারি পুকুরের চুন প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
৬. পুকুরে চুন প্রয়োগের সময় কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়?
৭. বাগদা চিংড়ির পোনা মজুদকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ।
৮. চিংড়ি চাষে পানির ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাগুলো উল্লেখ কর।
৯. চিংড়ির পীড়ন নিয়ন্ত্রয়ণের জন্য করণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণের পদ্ধতি বর্ণনা কর।
২. পুকুরে চুন প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৩. প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
৪. চিংড়ি নমুনায়ন ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাগদা চিংড়ির রোগ ব্যবস্থাপনা

চিংড়ির পরিবেশ

চিংড়ির পরিবেশ বলতে শুধু পানির মধ্যেই সীমাবদ্ধতা নয়। চিংড়ির পরিবেশের মধ্যে প্রধান হলো মাটির গুণাগুণ। কারণ মাটিই জলাশয়কে ধারণ করে রেখেছে। পুকুর বা ঘেরে মাটির গুণাগুণের ওপর চিংড়ির ফলন অনেকাংশে নির্ভরশীল। এটা জানা দরকার যে পানিতে অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন এবং সালফার গ্যাস বেশি হলে চিংড়ির মড়ক দেখা দেয়। পুকুর বা ঘেরের মাটিতে সূর্যের আলো ঠিকমত না পৌঁছিলে জৈব পদার্থ সরল রাসায়নিক পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে না। পানিতে নোংরা জৈব সার, অব্যবহার্য পরিপূরক খাবার ও জলজ আগাছা বেশি হলে পানি দূষিত হয়ে চিংড়ির পরিবেশ নষ্ট হয়, ফলে চিংড়ির মড়ক দেখা দেয়। এছাড়া বৃষ্টি ধৌত কীটনাশক ঔষধ পুকুরে বা ঘেরে এসে পড়লে চিংড়ি মারা যেতে পারে। রাসায়নিক সার ও চিংড়ির জন্য ব্যবহার্য ঔষধের পরিমাণ বেশি হলেও চিংড়ি মারা যেতে পারে। তবে চিংড়ির রোগের প্রধান কারণ হলো খামারে সুষ্ঠু চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার অভাব।

চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আলোচিত রোগ ভাইরোগের মূলত কোনো চিকিৎসা নেই। তাই শুরু থেকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়াই উত্তম, যেমন- ভালোভাবে ঘের তৈরি করা, পিসিআর পরীক্ষিত পোনা ক্রয় ও মজুদ, পরিমিত হারে সার ও খাবার প্রয়োগ ইত্যাদি। উন্নত পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষে তিনটি বিষয় সর্বোপরি গুরুত্বপূর্ণ, যেমন- চিংড়ি, জীবাণু ও পরিবেশ। এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হলেই চিংড়ি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

চিংড়ির রোগকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন-দীর্ঘস্থায়ী রোগ ও সংকটময় রোগ। চিংড়ি হঠাৎ জীবাণু বা ভাইরাসদ্বারা আক্রান্ত হলে সংকটময় রোগে আক্রান্ত হয়। সংকটময় রোগে আক্রান্ত চিংড়িকে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা না করলে ২-৩ দিনের মধ্যে খামারের সব চিংড়ি মারা যেতে পারে। চিংড়িকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর উপর খেয়াল রাখা দরকার।

চিত্রঃ রোগাক্রান্ত চিংড়ি

ক) সুনির্দিষ্ট মাত্রায় পোনা মজুদসহ সুস্থ, সবল, রোগমুক্ত ও কৌলিতাত্ত্বিক গুণগত মানসম্পন্ন পোনা মজুদ করতে হবে।

খ) পুকুরের পানির গুণাগুণের ওপর সার্বক্ষণিক খেয়াল রাখতে হবে, পানির গুণাগুণ পরিবর্তন হলে সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

গ) সুষম খাদ্য পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার ব্যবহার করা যাবে না।

ঘ) পুকুরের তলদেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে পানি পরিবর্তনের সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে।

ঙ) পুকুরে রোগাক্রান্ত চিংড়ি দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে রোগ শনাক্ত করে চিকিৎসা করতে হবে।

চ) পানির তাপমাত্রা, স্বচ্ছতা ও পিএইচ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

ছ) পুকুরে সঠিক স্থানে পেডেল তুইল স্থাপন করে বাতাস সরবরাহ করতে হবে।

জ) প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদনের জন্য নিয়মিত পরিমিত পরিমাণে সার প্রয়োগ করতে হবে।

পানির গুণাগুণ সংরক্ষণ

পানির গুণাগুণ রক্ষার জন্য প্রধানত তাপমাত্রা, দ্রবীভূত অক্সিজেন, পানির লবণাক্ততা, অ্যামোনিয়া, নাইট্রাইট, নাইট্রেট, খরতা ও ক্ষারত্ব, পিএইচ, হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতির ওপর বিশেষ নজর রাখা হয়। এসব প্রয়োজনীয় গুণাগুণ না থাকলে চিংড়ির বৃদ্ধি ও বাঁচার হার কমে যায়।

ক. তাপমাত্রা: সাধারণত তাপমাত্রা সমস্ত প্রাণীর জৈব বিপাক (Metabolism) ক্রিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৭° সে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে চিংড়ির বিপাকীয় কার্যক্রম প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জৈব ও রাসায়নিক ক্রিয়া যেমন বাড়ে ঠিক তেমনি তাপমাত্রা কম হলে সমস্ত ক্রিয়া কমে যায়। এই জন্য দেখা যায় ২০° সে তাপমাত্রার চেয়ে ৩০° সে তাপমাত্রায় জলজ প্রাণীসমূহের অক্সিজেনের চাহিদা, খাদ্যের চাহিদা, বৃদ্ধির হার ইত্যাদি প্রায় দ্বিগুণ দ্রুততার সাথে বেড়ে যায়। বাগদা চিংড়ির উৎপাদনের জন্য ২৫-৩০° সে তাপমাত্রা উত্তম। ২৫° সে তাপমাত্রার নিচে চিংড়ির বৃদ্ধির হার কমতে থাকে এবং ২০° সে এর নিচে প্রায় থেমে যায়। পানির তাপমাত্রা ১৩° সে এর নিচে এবং ৩৪° সে এর উপরে হলে চিংড়ির ব্যাপক মড়ক দেখা দিতে পারে। তাপমাত্রা অত্যধিক হলে খাদ্য ও সার প্রয়োগ প্রয়োজনমত কম বা বেশি অথবা বন্ধ করে দিতে হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে পানি পরিবর্তন করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সনাতন ও হালকা উন্নত পদ্ধতির চাষের পুকুরে পানির গভীরতা ঠিক রাখা সম্ভব হয় না। ফলে এ সমস্ত খামারে গরমের সময় পানির তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় চিংড়ির আশ্রয়ের জন্য খামারের ভিতরের পার্শ্বে চারদিকে বা কোণাকুণি নালা থাকা প্রয়োজন। এছাড়া প্রয়োজনমত পানি পরিবর্তন করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। নার্সারিতে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য ৪-৬ % এলাকাতে কচুরিপানা দেয়া যেতে পারে।

খ. দ্রবীভূত অক্সিজেন: চিংড়ি চাষের জন্য পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাগদা চিংড়ির অক্সিজেন চাহিদা বেশি। চিংড়ি চাষের পুকুরে ৫-৭ পিপিএম অক্সিজেন থাকা উত্তম। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ২.৫ পিপিএম এর নিচে নামলে চিংড়ি মারা যেতে শুরু করে এবং ১ পিপিএম এর কম হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত চিংড়ি মারা যাবে। পানিতে অক্সিজেন দ্রবীভূত হওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে পানির তাপমাত্রা, লবণাক্ততা ও বায়ুচাপের ওপর। সাধারণত তাপমাত্রা, লবণাক্ততা ও বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে গেলে পানিতে অক্সিজেনের দ্রবণীয়তা কমে যায়। পানিতে অক্সিজেনের উৎস দু'টি, যথা- বাতাস ও সালাকেসংশেষণ। আর পানিতে অক্সিজেন ঘাটতি তিনভাবে হয়ে থাকে, যথা- ১. রাত্রিকালে উদ্ভিদের শ্বাস গ্রহণ, ২. প্রাণীকূলের শ্বাস গ্রহণ এবং ৩. পচনশীল জৈব পদার্থের পচন। অক্সিজেন হ্রাসের কারণে চিংড়ির

দৈহিক ক্লেশ, ক্ষুদামন্দা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস এবং দৈহিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। পুকুরে অক্সিজেন হ্রাসের লক্ষণসমূহ হলোঃ

ক) পানির উপর সরের মত বুদ্বুদ জমা হয়।

খ) পুকুরের তলা থেকে বুদ্বুদের আকারে গ্যাস উঠে।

গ) শামুক-ঝিনুক পুকুরের কিনারায় চলে আসে।

ঘ) সমস্ত চিংড়ি সাঁতার কাটতে থাকে।

ঙ) মিশ্র চাষের পুকুর হলে মরা মাছের মুখ হা করা থাকবে, ফুলকা ফেটে যাবে।

সাধারণত মেঘলা দিনে, খুব গরম পড়লে এবং মধ্যরাত থেকে ভারেবেলা পর্যন্ত পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন তাপমাত্রায় অক্সিজেনের দ্রবণীয়তা নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো।

সারণিঃ বিভিন্ন তাপমাত্রায় অক্সিজেনের দ্রবণীয়তার মাত্রা

তাপমাত্রা (° সে)	অক্সিজেনের দ্রবণীয়তা (মিগ্রা/লিটার)	
	মিঠা পানি	সমুদ্রের পানি (৩৫ পিপিটি)
১৬	৯.৬৬	৮.০০
১৮	৯.৪৫	৭.৬৬
২০	৯.০৮	৭.৩৮
২২	৮.৭৩	৭.১২
২৪	৮.৪০	৬.৮৭
২৬	৯.০৯	৬.৫৪
২৮	৭.৮১	৬.৪২
৩০	৭.৫৪	৬.২২

রাতের বেলায় যখন সালাকেসংশেষণ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে তখন এরা অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে থাকে। তাই যেসব পুকুরে ফাইটোপ্ল্যাংকটনের আধিক্য বেশি থাকে সেসব পুকুরে সাধারণত বিকেল বেলায় অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে এবং ভোর বেলায় অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে। ফাইটোপ্ল্যাংকটন সমৃদ্ধ পুকুরের উপরিভাগে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে এবং তলদেশে কম থাকে। নিম্নোক্ত উপায়ে পুকুরের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়ঃ

ক) পানিতে ঢেউ এর সৃষ্টি করে, যেমনঃ সাঁতার কাটা, বাঁশ পেটানো ইত্যাদি।

খ) পুকুরে নতুন পানি সরবরাহ করে অর্থাৎ পানি পরিবর্তন করে।

গ) কৃত্রিমভাবে বায়ু সঞ্চালন করে। এয়ারেটর বা প্যাডেল হুইল স্থাপন করে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনর পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। পানিতে স্তর সৃষ্টি রাধে, বর্জ্য বের করা এবং অক্সিজেন মাত্রা বাড়াতে এয়ারেটর অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। পুকুরের চারদিকে ৪টি এয়ারেটর ব্যবহার করলে বর্জ্য পদার্থ সঠিকভাবে এক জায়গায় জমা হতে পারে। সবগুলো এয়ারেটর এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে সবগুলো এয়ারেটর একই দিকে ঘুরে।

২০২২

পাড় থেকে এয়ারেটরকে ৫-১০ মিটার দূরে এবং একটি থেকে অন্যটি ৩০-৩৫ মিটার দূরে স্থাপন করতে হবে।

গ. পানির লবণাক্ততা: বাগদা চিংড়ি প্রায় শূন্য থেকে ৭০ পিপিটি লবণাক্ততায় বেঁচে থাকতে পারে। তবে ১০-২৫ পিপিটি লবণাক্ততায় এদের দৈহিক বৃদ্ধি ভাল হয়। পানির লবণাক্ততা ২৫ পিপিটির বেশি হলে মিঠা পানি সরবরাহ করে পানির কমাতে বাড়াতে হবে। রিফ্রাক্টোমিটার বা স্যালাইনামেটারের সাহায্যে পানি লবণাক্ততা পরিমাপ করা যায়।

ঘ. অ্যামোনিয়া (NH_4): পুকুরের তলদেশে পুঞ্জিভূত জৈব পদার্থের পচন ও জলজ প্রাণীর বিপাকীয় ক্রিয়ায় অ্যামোনিয়ার সৃষ্টি হয়। আধানিবিড় ও নিবিড় চাষের পুকুরে সাধারণত হঠাৎ ব্যাপক হারে ফাইটোপ্ল্যাংকটনের মড়ক ও অন্যান্য ময়লা-আবর্জনা পচনের কারণে অনায়নিত অ্যামোনিয়া উৎপাদিত হয়। আয়োনিত (NH_4^+) ও অনায়নিত (NH_4) অবস্থায় অ্যামোনিয়া পানিতে বিদ্যমান থাকে। অনায়নিত অ্যামোনিয়া চিংড়ির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। পুকুরের পানিতে অনায়নিত অ্যামোনিয়ার মাত্রা ০.০২৫ মিগ্রা/লিটার এর কম থাকতে হবে যা চিংড়ির জন্য সহনীয়। এতে চিংড়ি উৎপাদনে কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। পানিতে অনায়নিত অ্যামোনিয়ার পরিমাণ ০.১ পিপিএম-এর বেশি হলে চিংড়ির দৈনিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ০.৪৫ পিপিএম এর বেশি হলে বৃদ্ধির হার অর্ধেকে নেমে আসে। সাধারণত পানির পিএইচ বৃদ্ধির সাথে সাথে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এজন্য পানির পিএইচ ৮.৫ এর বেশি হওয়া উচিত নয়। অ্যামোনিয়ার বৃদ্ধি পিএইচ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলে বিকাল বেলা পানিতে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেশি থাকে এবং ভোর বেলায় কম থাকে। পানিতে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য চিংড়ির মজুদ ঘনত্ব হ্রাস, অত্যধিক সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।

ঙ. নাইট্রাইট (NO_2): নাইট্রাইট হচ্ছে অ্যামোনিয়া ও নাইট্রেটের মধ্যবর্তী যৌগ। অনেক সময় এই যৌগ চিংড়ির ব্যাপক মড়ক ও বৃদ্ধির হার হ্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নাইট্রাইটজনিত কারণে চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয়। নাইট্রাইটের মাত্রা ০.১ পিপিএম এর নিচে থাকা চিংড়ির জন্য নিরাপদ। তবে সাগরের পানিতে নাইট্রাইট কম বিষাক্ত। চিংড়ির ঘনত্ব হ্রাস ও পানি পরিবর্তন করে জিওলাইট এবং চরম বিপর্যয়ের সময় ৩.৩ কেজি/শতাংশ/৩০ সেমি পানির গভীরতায় লবণ প্রয়োগ করে নাইট্রাইটের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

চ. নাইট্রেট (NO_3): পানিতে নাইট্রেটের মাত্রা ২০ পিপিএম-এর নিচে রাখা চিংড়ির জন্য উত্তম। নাইট্রেট চিংড়ির জন্য তেমন একটা বিষাক্ত নয়, বরং শেওলার জন্য একটি পুষ্টিকর উপাদান।

ছ. খরতা ও ক্ষারত্ব: পানিতে দ্রবীভূত বাই-কার্বনেট ও কার্বনেট-এর ঘনত্বই হলো ক্ষারত্ব। বাই-কার্বনেট ও কার্বনেট অন্য কতকগুলো উপাদানের সাথে একত্রে মিলিত আকারে থাকে। উপাদানগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম অন্যতম। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম এর ঘনত্বকে খরতা বলে। খরতা ও ক্ষারত্বের মান হ্রাস-বৃদ্ধি হলে পানির বাফারিং ক্ষমতা কমে যায় এবং পানির পিএইচ দ্রুত উঠা-নামা করে। এই হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে পুকুরে সার দিলে তা কার্যকর হয় না এবং চিংড়ির খোলস বদলানো বাধাপ্রাপ্ত হয়। খরতা ও ক্ষারত্বের মান ৪০-২০০ মিগ্রা/লিটার চিংড়ির জন্য ভালো। পুকুরের পানি পরিবর্তন করে এবং চুন বা জিপসাম প্রয়োগ করে পানির খরতা ও ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

জ. পিএইচ: চিংড়ির জন্য পানির পিএইচ ৭.৫-৮.৫ উত্তম। পানির পিএইচ-এর মান ৫ পিপিএম-এর কম হলে এবং ৯.৫ পিপিএম-এর বেশি হলে চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর। সাধারণত খামারে পানির পিএইচ ফাইটোপ্ল্যাংকটন, অব্যবহৃত খাদ্যের চর্বি ও ময়লা-আবর্জনাদ্বারা প্রভাবিত হয়। দিনের বেলায় ফাইটোপ্ল্যাংকটন সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করার ফলে বিকাল বেলায় পুকুরের পানিতে পিএইচ বেড়ে যায় এবং রাতের বেলায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করার ফলে ভোর বেলায় পিএইচ কমে যায়। পিএইচ এর দ্রুত উঠা-নামা চিংড়ির জন্য মোটেও ভালো নয়। পানির পিএইচ কমে গেলে চিংড়ির উপর নিম্নক্ত প্রভাবগুলো পরিলক্ষিত হয়:

ক) চিংড়ির দেহ থেকে সোডিয়াম ও ক্লোরাইড বেরিয়ে যায় ফলে চিংড়ি দুর্বল হয়ে মারা যায়।

খ) চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং খাবারে অরুচিভাব দেখা দেয়।

গ) পুকুরে খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পায়।

আবার পানির পিএইচ বেড়ে গেল চিংড়ির উপর নিম্নেক্ত প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ?

ক) চিংড়ির ফুলকা ও চোখ নষ্ট হয়ে যায়।

খ) অভিস্রবণ (Osmoregulation) ক্ষমতা হ্রাস পায়।

গ) চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ কন্ধ করে দেয়।

চুন ও জিপসাম প্রয়োগ করে পানির পিএইচ বাড়ানো যায় এবং অ্যামোনিয়াম সালফেট (১ কেজি/শতাংশ) অথবা কুঁতে (৬-১২ গ্রাম/শতাংশ/৩০ সেমি) প্রয়োগ করে পানির পিএইচ কমানো যায়।

ঝ. হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S): সাধারণত পচনশীল জৈব পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়া ও অক্সিজেনের ঘাটতির ফলে পুকুরের তলদেশের মাটিতে পচা ডিমের গন্ধ পাওয়া যায় এবং মাটির উপরিভাগে কালো আবরণের সৃষ্টি হয়। পানিতে হাইড্রোজেন সালফাইডের মাত্রা ০.১-০.২ পিপিএম হলে চিংড়ি শরীরের ভারসাম্য হারায় ও খাদ্য গ্রহণে অনীহাভাব দেখায় ফলে চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। হাইড্রোজেন সালফাইডের মাত্রা ১ পিপিএম এর বেশি হলে চিংড়ির মড়ক আরম্ভ হয়। পুকুরে অক্সিজেন বৃদ্ধি, সার ও খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা হ্রাস ও পিএইচ-এর মাত্রা বৃদ্ধি করে হাইড্রোজেন সালফাইডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পুকুরের পানি পরিবর্তনের মাধ্যমেও হাইড্রোজেন সালফাইডজনিত সমস্যা সমাধান করা যায়।

চিংড়ি রোগের লক্ষণসমূহ

পোনা অবস্থায় কিংবা দেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থায় চিংড়ি রোগাক্রান্ত হতে পারে। রোগাক্রান্ত চিংড়ি নিম্নবর্ণিত লক্ষণদ্বারা রোগ শনাক্ত করা যায়:

১. বাইরের খোলস বা শিরোবক্ষ এলাকায় ক্যারাপেসে কালো রং কিংবা ফাটল দেখা দেয়।

২. পদ উপাঙ্গ, ইউরোপডড ও পিওপড়ে কালো দাগের সৃষ্টি হয়। চিংড়ির ফুলকা বাদামি বর্ণ ধারণ করে।

৩. বহিঃকঙ্কালে হালকা সাদা বর্ণ দেখা দেয়।

৪. চিংড়ি অলস হয়ে যায় এবং চিংড়ির চলন ক্ষমতা হ্রাস পায়। পুকুরের কিনারায় ভেসে থাকতে দেখা যায়।

৫. সংকুচিত পেশী, অনিয়মিত সাঁতার, শক্ত দেহ বা দেহ বাঁকানো দেখা যায়।

৬. আক্রান্ত চিংড়ি নরম হয়। নিবিড় চিংড়ি চাষে সাদা রঙের দেহে আঙুল দিয়ে চাপ দিলে কিছুটা বসে যায়। কিন্তু সুস্থ সবল চিংড়িতে এ রকম গর্ত হয় না।

৭. খাদ্যনীল কেটে দেখলে খাদ্য শুন্য থাকে।

৮. ফুলকা কমলা, হলদে, লাল, বাদামি বা তামোট বর্ণ ধারণ করে। ফুলকা স্বাভাবিক মনে হয় না, ফুলকা ছিড়ে যায়।

৯. যকৃত ও অগ্নাশয় গ্রন্থিতে স্বাভাবিক রঙের পরিবর্তন ঘটে এবং হলুদ বর্ণ দেখা দেয়।

১০. চিংড়ি মলের রং পরীক্ষা করলে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

১১. চক্ষু দণ্ডের বর্ণ ছাই ও ঘালোটে রঙের মাধ্যমে রোগ শনাক্ত করা যায়।

১২. খোলস ফ্যাকাশে এবং শক্ত আকৃতির দেখা দেয়।

১৩. লেজ নিচের দিকে হেলে পড়ে এবং ভালোভাবে সংকোচন ও সম্প্রসারিত করতে পারে না।

১৪. স্বাভাবিক চিংড়ির চোখের বর্ণ লাল। রোগাক্রান্ত চিংড়ির চোখের বর্ণ সাদা হয়।

১৫. চিংড়ির মাংসপেশীর সংযাগেস্থলে কিংবা লেজের নিম্নাংশের মাংসপেশীতে কালো দাগ বা লম্বা কালো । আঁচড় দেখা যায়।

১৬. খোলসের নিচে দলবদ্ধ অবস্থায় অসংখ্য ছোট ছোট সাদা ফোটা দাগ দেখা যায়।

১৭. উদর এবং শিরোবক্ষ খোলসের সংযাগে স্থানে বাদামি বর্ণের ফোটা দাগ কিংবা ডোরা কাটা দাগ দেখা যায়।

১৮. চিংড়ির লেজ লাল বর্ণ দেখা দেয় ও চিংড়ির বহিঃত্বক হালকা লাল বর্ণ ধারণ করে।

১৯. পদ উপাঙ্গের আকৃতি অস্বাভাবিক দেখা যায়।

২০. চিংড়ির দেহ নোংরা দেখালে বুঝতে হবে ফাউলিং-এর আক্রমণ ঘটেছে।

২১. লেজের অংশে ফোটা ফোটা দাগ এবং স্ফীত হয়ে থাকে।

২২. চিংড়ির মাংস পেশীতে ডোরাকাটা বাদামি আঁচড় দাগ লক্ষণ ধরা পড়ে।

২৩. চিংড়ির স্বাভাবিক গতি মন্থর হয়।

২৪. হ্যাচারিতে চিংড়ি পোনা উৎপাদনের সময় ডিম অস্বচ্ছ সাদা দেখায় ও ডিম ফোটে না।

২৫. ছত্রাকজনিত রোগের আক্রমণে লার্ভা দুর্বল হয় ও ভারসাম্য হারিয়ে এলামেলাভোবে ঘুরে বেড়ায়।

বাহ্যিকভাবে পর্যবেক্ষণের সময় নিম্ন বর্ণিত লক্ষণসমূহ দেখে খামারের চিংড়িতে রোগের আক্রমণ প্রত্যক্ষ করা যায়:

১. খামারে হঠাৎ চিংড়ি মারা যাওয়া।

২. ভারে চিংড়ি খামারের কিনারা ঘেঁষে পানিতে অচেতন অবস্থায় চলাচল করে কিনা তা দেখা।

৩. আকস্মিকভাবে পানির বর্ণের পরিবর্তন ঘটলে। খামারের পানির বর্ণ কালচে রং ধারণ ও পানির উপরে। বুদ্বুদের সৃষ্টি হয়।

৪. খামারের আশেপাশে পচা ডিমের মত গন্ধ পেলে মনে করতে হবে খামারের তলদেশে পচা জৈব পদার্থ রয়েছে।

৫. দিনের বেলায় পানির উপর দিয়ে চিংড়ি দ্রুত সাঁতার কাটলে বুঝতে হবে খামারের অক্সিজেনের অভাব ঘটেছে।

৬. পানির তাপমাত্রা যদি ৩২০°সে-এর উপরে হয়।

৭. প্রবল বাতাসের সময় পানির উপরে ভাসমান স্তর পড়লে বুঝতে হবে বেশি পরিমাণ জৈব পদার্থ পানিতে আছে।

৮. পানির পিএইচ মাত্রা কম বেশি হলে।

৯. পানির স্বচ্ছতা কম বেশি হলে।

১০. পানির লবণাক্ততা আকস্মিকভাবে কমে গেলে।

১১. কখনও কখনও রাতে নিশাচর প্রাণীদের ঘারো ফেরা লক্ষ্য করা যায়।

১২. দিনের বেলায় মাছরাঙ্গা বা মৎস্যভূক পাখি খামারের আশে পাশে অধিক লক্ষ্য করা যায়।

চিংড়ির রোগের কারণ

সাধারণত চারটি প্রধান কারণে চিংড়ির রোগ হতে পারে

ক) পরিবেশের ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলির পরিবর্তন জনিত কারণে,

খ) পুষ্টিহীনতা বা খাদ্যের অভাবজনিত কারণে,

গ) পরজীবীর আক্রমণ হলে,

ঘ) প্রযুক্তি বাস্তবায়নগত অসুবিধা হলে।

ক. পরিবেশের ভৌত রাসায়নিক গুণাবলির পরিবর্তনজনিত কারণ।

ক) প্রাকৃতিক পরিবেশে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে বা ৫ মিগ্রা/লিটার-এর কম হলেচিংড়ি রোগাক্রান্ত হতে পারে।

খ) তাপমাত্রা বেড়ে গেলে (৩২০°সে এর বেশি) চিংড়ি রোগাক্রান্ত হতে পারে।

গ) যে কোনো কারণে পানি দূষিত হয়ে পানিতে দ্রবীভূত বিষাক্ত গ্যাসসমূহের (কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড, প্রভৃতি) মাত্রা বৃদ্ধি পেলে চিংড়ি রোগাক্রান্ত হতে পারে।

ঘ) আকস্মিক বা পর্যায়ক্রমে পানির স্বাভাবিক রং বিনষ্ট হলে।

ঙ) পানির লবণাক্ততা প্রয়াজেনের চেয়ে বৃদ্ধি পেলে কমে গেলে চিংড়ি রোগাক্রান্ত হতে পারে।

চ) ঘেরে পর্যাপ্ত সূর্যালাকে সুবিধা না থাকলে

প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক খাদ্যের অভাবে চিংড়ি রোগাক্রান্ত হতে পারে।

ছ) জলাশয়ের ভৌগালিক অবস্থাগত কারণে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে বাইরের দূষিত পানি ঘেরে প্রবেশ করলেও চিংড়ি রোগাক্রান্ত হতে পারে।

খ. পুষ্টিহীনতা বা খাদ্যের অভাবজনিত কারণ

ক) চিংড়ির শরীরের ওজন অনুপাতে প্রয়োগ না করা।

খ) খাদ্যের গুণগতমান বজায় না রাখা।

গ) উপযুক্ত পরিবেশে সুষম খাদ্য সংরক্ষণ না করা।

ঘ) চিংড়ির পছন্দ অনুযায়ী খাদ্য উপাদান নির্ধারণ না করা।

ঙ) সম্পূরক খাদ্য সহজ পাচা না হওয়া।

চ) ঘেরে পর্যাপ্ত পরিমাণে সার প্রয়োগের অভাবে প্রাকৃতিক খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে না হওয়া।

গ. পরজীবীর আক্রমণ

ক) অণুজীবঘটিত রোগ, যথা- ক) ভাইরাসজনিত রোগ ও খ) ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ।

২০২২ খ) প্রোটোজোয়া বা এককোষী প্রাণীঘটিত রোগ।

গ) পরজীবী কৃমিঘটিত রোগ।

ঘ) ছত্রাকঘটিত রোগ।

ঘ. প্রযুক্তি বাস্তবায়নগত অসুবিধা

ক) পরিবহনজনিত ত্রুটি ও পোনা অভ্যস্তকরণ না করা।

খ) সঠিক সংখ্যায় পোনা মজুদ না করা।

গ) অধিক পরিমাণে সার ও খাদ্য প্রয়োগের মাধ্যমে প্ল্যাংকটন কম সৃষ্টি করা।

ঘ) দুর্বল ও রোগাক্রান্ত পোনা মজুদ করা।

ঙ) সুষম খাদ্য পরিমাণমত ও সময়মত প্রয়োগ না করা।

চ) খাদ্য সঠিকভাবে প্রয়োগ না করা।

ছ) সময়মত পানি পরিবর্তন না করা।

জ) তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকা।

বাগদা চিংড়ির পরজীবীর আক্রমণের ফলে সৃষ্ট রোগসমূহ

ক. অণুজীবঘটিত রোগ (Microbial)

খ. প্রোটোজোয়া বা এককোষী প্রাণী ঘটিত রোগ (Protozoan)

গ. পরজীবী কৃমিঘটিত রোগ (Parasitic warm)

ঘ. ছত্রাকঘটিত রোগ (Fungal disease)

ক. অণুজীবঘটিত রোগঃ চিংড়ি চাষে অণুজীবঘটিত রোগসমূহ সাধারণত দু'ভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে যথা- ক) ভাইরাসজনিত রোগ ও খ) ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ।

ক) ভাইরাসজনিত রোগঃ ভাইরাস আকারে খুব ছোট, যা ইলেকট্রনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। পাঁচ ধরনের ভাইরাস প্রজাতি বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করে থাকে, যথাঃ Baculovirus penaei (BP), Monodon baculovirus (MBV),TCBV, Infectious hypoderalk haemattopietic necrosis (IHHNV) I Hepatopancreatic parvo virus (HPV)। আমাদের দেশে ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে অনেক সময় চিংড়ির ব্যাপক মড়ক দেখা যায়।

খ) ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগঃ ব্যাকটেরিয়া খুবই ক্ষুদ্র অণুবীক্ষণিক জীব। এদেও শরীরের ব্যাস সাধারণত ০.০০১ মিমি এর মত হয়ে থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালী চোখে এদের দেখা যায় না। তবে জল, স্থল ও বাতাস সর্বত্রই ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি রয়েছে। চিংড়ির দেহে প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটেরিয়া থাকে। রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার প্রজাতিসমূহ হলো- Vibrio parahaeino hysticus, Vibrio damsela, Vibrio alginolyticus, Vibrio anguillarum, Vibrio vulnificus, Vibrio alginotiticus, Vibrio harveyi I Vibrio splendidus|

খ. প্রোটোজোয়া বা এককোষী প্রাণীঘটিত রোগঃ বাগদা চিংড়ির রোগ সৃষ্টিকারী প্রাটোজোয়ার মধ্যে Ameson, Agmasoma, Ficistophora, Gregrines, Nematopses I Cephalolobno:CERCTISSI

গ. পরজীবী কৃমিঘটিত রোগঃ বিভিন্ন প্রকার পরজীবী চিংড়ির রোগ সৃষ্টি করে থাকে। এই পরজীবী এককোষী বা বহুকোষী হয়ে থাকে। বহুকোষী পরজীবীর মধ্যে ট্রেমোটাড (Trematode), নেমোটাড (Nematode) ও ২০২২

সিস্টোড (Cestode) জাতীয় কৃমিদ্বারা চিংড়ি আক্রান্ত হয়ে থাকে। এসব পরজীবী চিংড়ির খোলস, ফুলকা ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আক্রমণ করে থাকে।

ঘ. ছত্রাকঘটিত রোগ: বাগদা চিংড়ির খামারে ছত্রাকঘটিত রোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে Lagenidium, Sirolpidium, Fusarium solani I Haliphthoras প্রজাতির ছত্রাকসমূহ মূলত দায়ী। ছত্রাক সাধারণত চিংড়ির ফুলকায় আক্রমণ করে থাকে। ফলে চিংড়ি শ্বাসকষ্টে মারা যায়।

বাগদা চিংড়ির রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা

ক. চায়না ভাইরাস রোগ (White spot baculovirus disease- WSBV)

চিত্র: ভাইরাস আক্রান্ত মৃত চিংড়ি

লক্ষণ

- চিংড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে।
- চলাফেরা ক্ষুণ্ন হয় ও জলাশয়ের কিনারা ঘেঁষে উপরের স্তরে চলে।
- বর্ণ ফ্যাকাসে বা লালচে থাকে।
- খোলসের নিচে সাদা ক্যালসিয়াম সল্ট জমা হয়ে স্পষ্ট হয়।
- আক্রান্ত ঘেরের ১০০% চিংড়ি সাধারণত ৩-৭ দিনের মধ্যেই মারা যায়।

চিকিৎসা

- এই রোগের কোনো প্রতিষেধক ঔষধ নেই বললেই চলে।
- রোগ বহনকারী পোনা কিংবা অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে ঘেরে যেন ভাইরাস প্রবেশ না করে।
- খামারের পরিবেশ উন্নত ও ভালো ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধের জন্য খামারের পানি প্রবেশের আগেই ক্লোরিন (৩০০ কেজি/হেক্টর) অথবা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড (৬০%) অথবা মেলিন ৭০ পিপিএম অথবা ফরমালিন ২০ পিপিএম হারে প্রয়োগ করে খামারকে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

খ. মস্তক হলুদ রোগ (Yellow head disease)

লক্ষণ

- কিশোর (৫-১০ গ্রাম ওজনের) পর্যায়ে আক্রান্ত হয়।
- প্রাথমিক দিকে বেশি খাবার খায় ও হঠাৎ করে খাবার বন্ধ করে দেয়।
- দেহ ফ্যাকাশে রঙের হয় ও শিরোবক্ষ এলাকা হলুদ বর্ণ ধারণ করে।
- পুকুরের কিনারায় রোগাক্রান্ত চিংড়ি ধীরে ধীরে চলাফেরা করে।
- কয়েক ঘন্টার মধ্যে মৃত্যু হয়ে পুকুরের তলায় ও কিনারায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে।

চিকিৎসা

- সাধারণত ঔষধ প্রয়োগে কোনো চিকিৎসা নেই।
- খামারের পানিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ফাইটোপ্ল্যাংকটনের উপস্থিতি এই রোগের প্রকোপ কমায়।
- প্রতি সপ্তাহে ২-৩ দিন যাবৎ ২৫০ কেজি/হেক্টর হারে পাথুরে চুন প্রয়োগ করে রোগের প্রকোপ কমানো যেতে পারে।
- খামারের পানিতে ৫-১৫ পিপিএম হারে ক্লোরিন প্রয়োগ করে রোগের সম্ভাবনাকে কমানো যেতে পারে।

গ. Monodon baculovirus (MBV)

লক্ষণ

- সাধারণত লার্ভা অবস্থা থেকে আক্রান্ত হয় এবং পোস্ট লার্ভা ভেনাইল অবস্থায় সক্রিয় হয়।
- চাষকালীন সময়ে প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো লক্ষণ ধরা পড়ে না।
- হ্যাচারিতে বহনকৃত ব্রুড স্টক এই ভাইরাস বহন করতে পারে না।
- যকৃত, অগ্নাশয় গ্রন্থি ও খাদ্যনালিতে ভাইরাস শনাক্ত করা যায়।
- পরিবেশ অসহনীয় হলে এই ভাইরোগর উপস্থিতিতে চিংড়ি সর্বদায় দুর্বল হয় ও মারা যায়।

চিকিৎসা

- ভাইরাস বহনকারী লার্ভা (পোস্ট লার্ভা) খামারে ব্যবহার করা যাবে না।
- খামারের পোনার দেহে ভাইরাস শনাক্ত হলে ব্যবস্থাপনায় সতর্ক হতে হবে এবং পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে ঝুঁকি কমাতে হবে।
- কোনো সুষ্ঠু চিকিৎসা নেই। তবে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

ঘ. কালো ফোটা রোগ (Black spot disease)

লক্ষণ

- শরীরের একাধিক স্থানে খালেসে কালো দাগ পরিলক্ষিত হয়।
- গ্রীষ্মের শেষে অথবা শীতে প্রধানত জুভেনাইল বা কিশোর অবস্থায় চিংড়ি আক্রান্ত হয়।
- খোলস সহজেই ভেঙে যেতে পারে।
- ব্যাকটেরিয়াদ্বারা রোগ সংঘটিত হয়।

চিকিৎসা

- খামারের পানি বদলাতে হবে।
- চিংড়িকে একত্রে সন্নিবেশিত করে ২০ পিপিএম মাত্রায় ফরমালিন অথবা ০.৩ পিপিএম মাত্রায় মেলাকাইট গ্রিনে অন্তত ১২ ঘণ্টা রাখতে হবে।
- অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, ফুরাজলিডন ইত্যাদি জীবাণুনাশক খাবারের সঙ্গে ২-৩ গ্রাম/কেজি হারে দিনে ২-৩ বার প্রয়োগ করতে হবে।

২০২২

ঙ. ফুলকা পচা রোগ (Gill rot disease)

লক্ষণ

- ফুলকায় ময়লা জমে দুর্গন্ধ হয়।
- ফুলকার রং কালো বা বাদামি হয়।
- খাবারের প্রবণতা কমে যায়।
- পরিবেশ দূষণের কারণে অথবা ব্যাকটেরিয়া/ছত্রাকদ্বারা রোগ সংঘটিত হয়।

চিকিৎসা

- খামারের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নসহ পুকুরের তলদেশ পরিষ্কার ও পানির গুণাগুণ ঠিক রাখতে হবে।
- আক্রান্ত চিংড়িকে সন্নিবেশিত করে অন্তত ১২ ঘণ্টা ০.৫-০.৮ পিপিএম মাত্রার মেলাকাইট গ্রিন দ্রবণে রাখতে হবে।

চ. লেজ পচা রোগ (Tail rot disease)

লক্ষণ

- চিংড়ির লেজ নিচের দিকে হেলে পড়ে ও কালো বর্ণ ধারণ করে।
- লেজের ধারসমূহ বিবর্ণ হয়ে পড়ে। ও গ্রীষ্মের শেষে এবং শীতে প্রধানত এ রোগ দেখা যায়।
- লেজের অংশ বিশেষ ক্ষয় অথবা লেজের মাংসপেশীতে পচন ধরে ও পচা অংশ লাল বর্ণ হয়।
- অধিক সময় চিংড়ি স্থির থাকতে দেখা যায়।
- ব্যাকটেরিয়া ও মাংসাশী স্বভাবের কারণে হয়ে থাকে।

চিকিৎসা

- ব্যাপকভাবে পানি পরিবর্তন করতে হবে।
- ১৫ পিপিএম মাত্রায় ফরমালিন অথবা ০.৩ পিপিএম মেলাকাইট গ্রিন দ্রবণে সংগৃহীত চিংড়িকে ১০-১২ ঘণ্টা রাখতে হবে।
- খাবারে প্রতি কেজিতে ২/৩ গ্রাম হারে জীবাণুনাশক ঔষধ, যেমন- অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, ১০-১২ দিন প্রয়োগ করতে হবে।

ছ. লাল বর্ণ রোগ (Red coloration disease)

লক্ষণ

- গ্রীষ্ম ও শরতে এ রোগ অধিক দেখা যায়।
- ফুলকা ও শরীর প্রথমে হলদে সবুজ ও পরে লাল বর্ণ ধারণ করে।
- লেজ ও পদ উপাঙ্গা লালচে রং দেখা যায়।
- উদর খাদ্য শূন্য থাকে।

- যকৃত ও অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি ছোট হয়ে যায় ও নষ্ট হয়ে যায়।
- চিংড়ির গতি ধীর থাকে।
- মজুদের ১ থেকে ১১/২ মাস সময়ের মধ্যে অধিক আক্রান্ত হতে দেখা যায়।
- পুষ্টির অভাব/ব্যাকটেরিয়াদ্বারা সংক্রমিত।
- পরিবেশগত কারণেও এ রোগ হতে পারে।

চিকিৎসা

- পুষ্টির অভাব দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- পুষ্টির অভাব দ্রুত দূরীকরণে ঝিনুক-শামুকের সতেজ মাংস সরবরাহ ও উচ্ছিষ্টাংশ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- খামারের পানিতে কোনো পরিত্যক্ত পচা খাবার বা অন্য কোনোরূপ জৈব পচন থাকলে তা পরিষ্কার করতে হবে।

জ. দেহ খিচুনি রোগ (Body cramp disease)

লক্ষণ

- গ্রীষ্মকালে উত্তপ্ত আবহাওয়ায় এই রোগ দেখা যায়।
- উদর ও লেজের মাংসপেশী সংকুচিত হয়।
- দৈহিক বৃদ্ধি কমে যায়।
- স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারে না।
- প্রধানত পরিবশেগত কারণে ও পুষ্টির অভাবে ঘটে থাকে।

চিকিৎসা

- খামারের পানির তাপ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ঘন ঘন পানি বদল করতে হবে এবং খামারের পানির গভীরতা ন্যূনতম ১ মিটার রাখতে হবে।
- খামারে মজুদকৃত চিংড়ির পরিমাণ হিসেব করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- খামারের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা ৫-৮ পিপিএম এর মধ্যে রাখতে হবে। খামারের দূষিত তলদেশ এই রোগের সহায়ক।

ঝ. ইপিকমেন্সাল রোগ (Epicommensal disease)

লক্ষণ

- দেহে মাটি জাতীয় পদার্থ থাকে।
- দেখতে বিবর্ণ দেখায়।
- চিংড়ির স্বাভাবিক শ্বসন প্রক্রিয়া, চলাফেরা ও খোসা বিবর্তনে বাধার সৃষ্টি হয়।

- প্রধানত পরজীবী বা শেওলাদ্বারা সংঘটিত হয়।
- খামারের দূষিত তলদেশ এই রোগের সহায়ক।

চিকিৎসা

- ফরমালিন (১৫-৫০ পিপিএম) এবং মেলাকাইট গ্রিন (০.৫-১.০ পিপিএম) দ্রবণে চিংড়িকে পর্যায়ক্রমে গাসেল করাতে হবে।
- খামারের তলদেশে ফাইটোপ্ল্যাংকটন ও শেওলার অধিক বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- খোলস বিমাচেনের জন্য চা-বীজ খৈল (৫০ পিপিএম) ও কপার সালফেট (০.৩-০.৫ পিপিএম) প্রয়োগ করতে হবে।
- খামারের পানি পরিবর্তনে গুরুত্ব দিতে হবে।
- ৭-১০ দিন অন্তর ৫-৭ কিস্তিতে ১০০-১৫০ কেজি/হেক্টর হারে খামারে পাথুর চুন প্রয়োগ করতে হবে।

ঞ. খোসা নরম রোগ (Soft shell disease)

লক্ষণ

- প্রধানত পুষ্টির অভাব, ব্যাকটেরিয়া সংক্রান্ত অথবা পানিতে বাই-কার্বনেটের অভাবে এই ধরনের রোগসমূহ দেখা দেয়।
- চিংড়ি দেহের আবরণ ও মাংস নরম হয়ে পড়ে।
- শিরোবক্ষ খোলসের নিচের মাংস ও পর্দা কালচে বর্ণ ধারণ করে।
- Secondary infection হয়
- দেহের ওজন কমে যেতে পারে।

চিকিৎসা

- খামারের পানিতে পাথুর চুন ২৫০-৩০০ কেজি/হেক্টর হারে প্রয়োগ করতে হবে। অধিক বৃষ্টির পর বার বার চুন প্রয়োগ করতে হবে।
- পুকুরে প্রয়োগকৃত খাবারের সঙ্গে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-সি যথাক্রমে ২০০ গ্রাম/কেজি ২০০০ মিগ্রা/কেজি হারে এক মাস প্রয়োগ করতে হবে।

ট. কালো দাগ বা ব্যাক স্প্লিন্টার (Black splinter)

লক্ষণ

- খামারের পরিবেশ ঠিক না থাকলে ও বৃষ্টিপাতে খামারের লবণাক্ততা হ্রাস পেলে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এই রোগ সংক্রমিত হয়। তবে এই রোগ চিংড়ির মড়ক কিংবা দেহ বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটায় না।
- লেজের মাংসপেশীতে ও শরীরের অন্যান্য অংশে আঁচড়ের মত কালো দাগ দেখা যায়।
- খোলসের নিচে কালো চেপ্টা দাগ দেখা যায়।

২০২২

- সাধারণত খামারে মজুদ করার দুই মাস সময়ের মধ্যে এই রোগ দেখা দেয়।

চিকিৎসা

- খামারের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং খামারে খাবারের প্রয়োগমাত্রা কমাতে হবে।
- রোগের ব্যাপকতা থাকলে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগে কোনো সফলতা আসে না।
- প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নিরাময়ের জন্য অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ২-৩ গ্রাম/কেজি খাবারে ৭-১০ দিন প্রয়োগ করতে হবে।
- বৃষ্টির পর পর খামারে ২৫০-৩০০ কেজি/হেক্টর হারে পাথুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

ঠ. শেওলার বিষক্রিয়াজনিত রোগ (Algal poisoning)

লক্ষণ

- চিংড়ির এই রোগকে Blue shrimp syridroine (BSS) হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়।
- বিশেষ ধরনের শেওলা ডাইনাফ্লোজিলেট (Dinoflageliate) এর বিষক্রিয়ার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।
- চিংড়ির দেহ ও খোলস নীল রং ধারণ করে।
- চিংড়ির দেহ ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-সি এর অভাবে রোগের প্রকোপ অধিক পরিলক্ষিত হয়।

চিকিৎসা

- চিংড়ির খাবারের সাথে ক্যালসিয়াম (২০ গ্রাম/কেজি) ও ভিটামিন-সি (২০০০ মিগ্রা/কেজি) মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।
- বাড়তি সুবিধার জন্য পাথুরে চুন ২৫০ কেজি/হেক্টর হারে প্রয়োগ করতে হবে।
- শেওলা ও এর বিষক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাথমিকভাবে পর্যায়ক্রমে FGC mycin ০.১ পিপিএম ও Hai chon-por ৬.২৫ কেজি/হেক্টর হারে তিন দিন খামারে প্রয়োগ করতে হবে।

ড. কালো বর্ণ ফুলকা রোগ (Black gill disease)

লক্ষণ

- দূষিত পরিবেশে ছত্রাক (Fasarium sp) ও এককোষী প্রাণীদ্বারা আক্রান্ত হয়।
- ফুলকায় কালো বর্ণ দেখা দেয়।
- চিংড়ির শ্বাস প্রশ্বাসে ব্যাঘাত ঘটে।
- চিংড়ি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

চিকিৎসা

- ভাসমান খাদ্য সরবরাহকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং খাবারের সাথে ভিটামিন-সি ২০০০ মিগ্রা/কেজি হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে।
- ঘন ঘন পানি বদলের মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- খাবার সরবরাহের পরিমাণ কমানোসহ আমিষ জাতীয় সরবরাহ বন্ধ রাখতে হবে।

ঢ. বুদবুদ রোগ (Gas bubble disease)

লক্ষণ

- খামারের পানিতে অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন গ্যাসের দ্রবণ বেশি থাকে।
- ফুলকাতে ছোট ছোট গ্যাস বুদবুদ রোগ দেখা যায়।
- চিংড়ি পানির উপরে ভাসতে থাকে।
- খামারের অব্যবস্থাগত কারণে দুষিত পরিবেশে চিংড়ি আক্রান্ত হয়।

চিকিৎসা

- খামারের পানিতে কৃত্রিম স্রোত সৃষ্টি বা নাড়াচাড়া করে গ্যাস অবমুক্ত করে গ্যাসের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।
- খামারের পানির গভীরতা ১ মিটার রাখতে হবে।
- খামারের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নসহ পুকুরের তলদেশ পরিষ্কার রাখতে হবে।

ণ. ছত্রাক রোগ (Fungal disease)

লক্ষণ

- সেপ্রালেগনিয়া *(Saprolegnia sp.)* এ রোগের জন্য দায়ী
- প্রধানত হ্যাচারির লার্ভার বিভিন্ন পর্যায়ে ফুলকায় আক্রমণ করে।
- খামারে পোস্ট-লার্ভা পর্যায়েও আক্রান্ত হয়।
- ফুলকায় অসংখ্য কালো দাগ দেখা যায়।
- এই ব্যাপক আক্রমণের ক্ষেত্রে ফুলকার ল্যামিলা নষ্ট হয়ে যায়।
- চিংড়ির শ্বাস প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে।
- ২-৩ দিনের মধ্যে আক্রান্ত চিংড়ি মারা যায়।

চিকিৎসা

- ৭-১০ দিন ব্যাপকভাবে পানি পরিবর্তন করতে হবে।
- আক্রান্ত চিংড়ি খামার থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- অক্সালিক অ্যাসিড ০.১-০.৫ পিপিএম (৩-৫ দিন) এবং জেনসিয়ান ভায়োলেট (Gentian violet) ০.১-০.২ পিপিএম (৩-৫ দিন) পর্যায়ক্রমে আক্রান্ত চিংড়িকে গাসেল দিতে হবে।

ত. ফুসেরিয়াম (Fusarium sp.)

লক্ষণ

- সাধারণত চিংড়ির ফুলকায় আক্রমণ হয়।
- মস্তিষ্কের গোড়ায় এবং ফুলকা কোষের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ক্ষত দেখা যায়।

- ফুলকা এবং মষিক এলাকা ছাড়াও পেরিওপড, ইউরোপড ও লেজে এই ছত্রাকের আক্রমণের কারণে চিংড়িতে রঞ্জক কণার বিচ্যুতির পরে লালচে বর্ণ ধারণ করে।

চিকিৎসা

- ৭-১০ দিন ব্যাপকভাবে পানি পরিবর্তন করতে হবে।
- Gentian violet ১-২ পিপিএম ও মিথাইল ব্লু ৩.১-১.২ পিপিএম মিশ্রিত দ্রবণে ৫-১০ মিনিট আক্রান্ত চিংড়িকে গোসল দিতে হবে।
- আক্রান্ত চিংড়ি খামার থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

বাগদা চিংড়ির রোগ প্রতিরোধের বিভিন্ন উপায়সমূহ

ক) প্রয়াজেনের অতিরিক্ত জৈব সার ও খাদ্য প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে।

খ) অত্যধিক বৃষ্টি বাহিত পানি খামারে জমা হলে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

গ) চিংড়ি পোনা খামারে ছাড়ার পূর্বে এদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ চাষকালীন সময়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, । চিংড়ির দৈহিক গতিবিধি ও খাবার গ্রহণের প্রবণতার উপর নজর রাখতে হবে।

ঘ) রোগাক্রান্ত পুকুরে ব্যবহৃত বা অন্যান্য সামগ্রী জীবাণুমুক্ত না করে সুস্থ পুকুরে ব্যবহার করা যাবে না।

ঙ) চিংড়ির খামারে পানি পরিবর্তনের সময় রোগাক্রান্ত জলাশয়ের পানি পরিহার করতে হবে।

চ) খামার স্থাপন থেকে শুরু করে চিংড়ি ধরার পূর্ব পর্যনত প্রতিটি স্তরে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই চিংড়িকে রোগমুক্ত করা সম্ভব।

ছ) চিংড়ি চিকিৎসার ক্ষেত্রে সঠিক ঔষধ সঠিক মাত্রায় সঠিক সময়ের জন্য প্রয়োগ করা জরুরি।

জ) বেশি সংখ্যক চিংড়ির চিকিৎসার পূর্বে ক্ষুদ্র আকারে বালতিতে চিংড়ির সহ্য ক্ষমতা পরীক্ষা করে নেওয়ার মাধ্যমে চিকিৎসার ত্রুটিজনিত মৃত্যু থেকে এদের রক্ষা করা সম্ভব।

বাগদা চিংড়ির রোগ দমনের জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার

ফাঙ্গাসজনিত রোগ

ক) রোগের প্রাথমিক অবস্তায় ঘেরে ২০-৫০% পানির পরিবর্তন।

খ) রোগের তীব্রতার ক্ষেত্রে ০.১-০.২ পিপিএম মিথিলিন ব্দ্বারা রোগাক্রানত চিংড়িকে গোসল।

পরজীবীজনিত রোগ

ক) পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলিসমুহের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

খ) অতিরিক্ত জৈব খাবার বা সার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে।

গ) পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়াতে হবে (যন্ত্রের সাহায্যে বা পানি আন্দোলিত করে)

ঘ) খামারের পানিতে ৭-৯ পিপিএম হারে ক্লোরিন বা ডায়ামেটিল প্রয়োগ করতে হবে।

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ

ক) সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রতি চন্দ্র পক্ষে পানি পরিবর্তন (২০-৪০%} করতে হবে।

খ) নির্দিষ্ট মাত্রার অ্যান্টিবায়োটিকযুক্ত পানি, ফরমালিন (২০ পিপিএম) অথবা ম্যালাকাইট গ্রিন (০.৩ পিপিএম) দ্রবণে ১২ ঘন্টা আক্রানত চিংড়িকে গাসেল দেয়া যেতে পারে।

গ) প্রতি কেজি খাবারের সাথে ১-১.৫ গ্রাম অক্সিটেট্রাসাইক্লিন মিশিয়ে ৫-৭ দিন লাল বর্ণ রোগে আক্রানত চিংড়িকে খাওয়ানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে অন্তত ১৫ দিন চিংড়িকে খামারে রাখতে হবে অন্যথায় চিংড়ির দেহে এই এন্টিবায়োটিকের কার্যকরিতা থেকে যায়, যা খাবার হিসেবে মানুষের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়।

ঘ) খামারের তলদেশ সর্বদাই পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

ভাইরাসজনিত রোগ

ক) চিংড়ির ভাইরাসজনিত রোগ নির্ণয় তুলনামূলকভাবে জটিল।

খ) একবার সংক্রমিত হলে দ্রুত ব্যাপক মড়ক দেখা দেয়।

গ) শুধুমাত্র সুস্থ-সবল পোনা মজুদ, বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নত ব্যবস্থাপনা ও সতর্কতা ভাইরাসজনিত রোগ প্রতিরোধের একমাত্র উপায়।

ঘ) মজুদ ঘনত্ব ও পরিমাণ মোতাবেক নির্দিষ্ট হারে মানসম্পন্ন খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ) পুকুরের তলদেশে অতিরিক্ত শেওলা জন্মাতে দেয়া যাবে না।

চ) ক্যালসিয়াম (২০০ মিগ্রা/কেজি) ও ভিটামিন-সি (২ গ্রাম/কেজি) হিসেবে এক মাস প্রতিদিন খাবারের সাথে দিতে হবে।

ছ) অ্যালজির বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে খামারে তিনদিন এফজিসি মাইসিন (০.১ পিপিএম) অথবা হাইকনপর (২.৫ কেজি/একর) প্রয়োগ করতে হবে।

বাগদা চিংড়ি রোগ দমনে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ

১. ব্লিচিং পাউডার (Bleaching powder)
২. কপার সালফেট (Copper sulfate)
৩. ফরমালিন (Formalin)
৪. ম্যালাকাইট গ্রিন (Malachite green)
৫. মিথিলিন ব্লু (Metheline blue)
৬. ট্রাফলান (Traflan),
৭. প্রোটোজোয়াসাইড (Protozoacide),
৮. জুথামনিসাইড (Zoothannicide) ইত্যাদি।

হ্যাচারিতে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিক

১. অ্যালবাজিন (Albazin)
২. সিপরোফ্লোক্সাসিন (Ciprofloxacin)
৩. ইরাইথ্রোমাইসিন (Erythromycin)
৪. কেনামাইসিন (Kenamycin)
৫. অক্সোলিনিক অ্যাসিড (Oxolinic acid)
৬. অক্সিটেট্রাসাইক্লিন (Oxytefracyclin)

৭. স্ট্রেপটোমাইসিন (Streptomycin), ইত্যাদি

নিষিদ্ধ অ্যান্টিবায়োটিক

১. ক্লোরামফেনিকল (Chloramphenicol)

২. নাইট্রোফুরান (Nitrofuran)

৩. ফিউরাজলিডন (Furazolidon)

৪. নিওমাইসিন (Neomycin), ইত্যাদি

কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিকস

Ciprofloxacin 1 Erythromycin

অকার্যকর অ্যান্টিবায়োটিকস

Neomycin, Ampicillin, Chloramphenicol, Nalidixic acid, Erythromycin, Ciprofloxacin,Amoxicillin, Kenamycin,ইত্যাদি

বাগদা চিংড়ি চাষকালে উদ্ভূত সমস্যা ও সমাধান

পানির উপর সবুজ স্তর

পানিতে অতিরিক্ত সার ও খাদ্য প্রয়োগের ফলে অনেক সময় পানিতে সবুজ স্তর হয়। শতকে ১ কেজি চুন প্রয়োগের মাধ্যমে তা দমন করা যায়। এছাড়া কুঁতে ৬-১২ গ্রাম/শতক/ফুট হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। শতকে ১ টি করে সিলভার কার্প মজুদ করে জৈবিকভাবে সবুজ স্তর দমন করা যেতে পারে।

পানির উপর লাল স্তর

পানিতে আয়রনের পরিমাণ বেশি হলে অথবা ইউগেনা নামক প্রজাতির উপস্থিতিতে পানির উপর লাল তর হয়। ফিটকিরি শতকে ১০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করে দমন করা যেতে পারে। ফিটকিরি সরাসরি গুলে প্রয়োগ না করে পানিতে কঞ্চি পুঁতে ছোট ছোট পোটলাতে বেধে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এছাড়া কলার পাতা বা খড়ের বিচালী প্যাচিয়ে পানির উপর থেকে লাল তর টেনে তুলে ফেলা যেতে পারে।

পানিতে কাকড়ার উপদ্রব

পানিতে কাকড়ার উপদ্রব বেশি হলে প্রতি গর্তে ২-৩ টি ক্যালসিয়াম কার্বাইড ট্যাবলেট দিতে হবে।

পানিতে শামুক ঝিনুকের উপদ্রব

পানিতে শামুক-ঝিনুকের উপদ্রব বেশি হলে তাল পাতা বা নারিকেল বা খেজুরের ডাল পানিতে পুঁতে দেওয়া যেতে পারে। শামুক-ঝিনুক ডালে আশ্রয় নিলে উক্ত শামুক-ঝিনুক পাড়ে তুলে মেরে ফেলতে হবে।

পানিতে ব্যাঙের উপদ্রব

পানিতে ব্যাঙের উপদ্রব বেশি হলে কোচ দিয়ে মেরে ফেলতে হবে বা অন্য কোনো ভাবে ধরে ফেলতে হবে।

২০২২

নার্সারি পুকুরে গভীরতাজনিত সমস্যা

নার্সারি পুকুরে অনেক সময় পানির গভীরতা কমে যেতে পারে। এক্ষেত্রে পুকুরের আয়তন অনুসারে শতকরা ৪-৬ ভাগ জায়গাতে কচুরিপানা দেওয়া যেতে পারে।

ঘেরে আগাছাজনিত সমস্যা

ভালো ফলন পেতে হলে অবশ্যই নিয়মিত আগাছা দমন করতে হবে। আগাছার পরিমাণ বেশি হলে প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন কমে যাবে এবং রোগ-বালাই বেশি হবে।

চিত্র: ঘেরে আগাছা দমন

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. চিংড়ির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পানির অনুকূল তাপমাত্রা কত হওয়া উচিত ?
২. চিংড়ির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা কত হওয়া উচিত?
৩. বাগদা চিংড়ির সুষম দৈহিক বৃদ্ধির জন্য পানির লবণাক্ততা কত হওয়া উচিত?
৪. পানির তাপমাত্রা কত হলে চিংড়ি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে?
৫. চিংড়ির রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুসমূহকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?
৬. ব্যাকটেরিয়া কোন ধরনের জীব?
৭. যে কোনো একটি কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিকের নাম লিখ।
৮. যে কোনো একটি নিষিদ্ধ অ্যান্টিবায়োটিকের নাম লিখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. চিংড়ির রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুসমূহের নাম লিখ।
২. পুকুরে অক্সিজেন হ্রাসের লক্ষণসমূহ বর্ণনা কর।
৩. চিংড়ির রোগ প্রতিকারে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকের নাম লিখ।
৪. চিংড়ির রোগ সৃষ্টিতে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিগুলো কী কী?
৫. চিংড়ির রোগের সাধারণ লক্ষণগুলো লিখ।
৬. চিংড়ির রোগ দমনে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যসমূহের নাম লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিংড়ির রোগ ও রোগের লক্ষণসমূহ বর্ণনা কর।
২. চিংড়ির রোগ প্রতিরোধের উপায়সমূহ বর্ণনা কর।
৩. চিংড়ি চাষকালে উদ্ভূত সমস্যা ও সমাধান বর্ণনা কর।

২০২৫

সপ্তম অধ্যায়

বাগদা চিংড়ি চাষের প্রকল্প প্রণয়ন

যে কোনো প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে সম্পদ হিসেব করে লক্ষ্য স্থির করতে হবে কোন ধরনের পণ্য উৎপাদন করা হবে। হ্যাচারির মাধ্যমে পিএল, নাকি চাষের মাধ্যমে চিংড়ি, নাকি নার্সারির মাধ্যমে আঙুলী পোনা উৎপাদন করা হবে। অতঃপর লক্ষ্য অনুয়ায়ী স্থান নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত স্থানে প্রয়োজনীয় জনবল আছে কিনা, বাজারজাতকরণের পর্যাপ্ত সুবিধা আছে কিনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। কোনো প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। এসব প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদনশীল ইউনিটের উন্নয়ন, সমপ্রসারণ, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া নির্দিষ্ট সময়ে কিছু উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে কর্মপদ্ধতি নির্দেশনার জন্য সাধারণত প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্প প্রণয়নের মাধ্যমে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও কর্মসংস্থানের দিক নির্দেশনা দেয়া হয়।

বাগদা চিংড়ির ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়নের কৌশলসমূহ

প্রকল্প প্রণয়নের কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে একটি সুষ্ঠু বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প প্রণয়ন করা সহজ হয়। প্রকল্প প্রণয়নকালে যে সকল বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে সেগুলো হলোঃ

ক) প্রবল্পটির স্থান লোনা পানির উৎসের কাছাকাছি হতে হবে।

খ) প্রকল্প যে স্থানে স্থাপিত হবে সে স্থানের মাটির গুণাগুণ উন্নত হতে হবে।

গ) যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হবে এবং প্রকল্প স্থানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবস্থা সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে।

ঘ) জোয়ার-ভাটার পানি প্রস্তাবিত প্রকল্পের কাছাকাছি হতে হবে।

ঙ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন- ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলাচ্ছ্বাস ইত্যাদি মুক্ত এলাকায় প্রকল্প স্থান নির্বাচন করতে হবে।

চ) বাগদা চিংড়ির পোনা প্রাপ্তির উৎসের কাছাকাছি হতে হবে।

ছ) বিগত কয়েক বছরে রোগ-বালাইয়ের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে।

জ) চিংড়ি চাষে দক্ষ জনশক্তির সহজ প্রাপ্যতা থাকতে হবে।

ঝ) উৎপাদিত চিংড়ি সহজে বাজারজাতকরণের সুবিধা থাকতে হবে।

ঞ) বিদ্যুতের সহজ প্রাপ্যতা থাকতে হবে।

ট) চিংড়ি চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ, যেমন- চিংড়ির খাদ্য, পেডেল হইল ইত্যাদির সহজ প্রাপ্যতা থাকতে হবে।

ঠ) প্রকল্প এলাকায় সামাজিকভাবে চিংড়ি চাষের গ্রহণযোগ্যতা থাকতে হবে।

ড) নিরাপত্তাজনিত বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে।

উপরোক্ত সুযোগ-সুবিধার বিষয় মনে রেখে প্রকল্প প্রণয়ন করা হলে উক্ত প্রকল্প সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অপরদিকে উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা না করে প্রকল্প প্রণয়ন করা হলে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উপরন্তু প্রকল্পটি অর্থনৈতিক দিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে বা আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা থেকে যায়।

চিংড়ি চাষে ব্যয়ের খাত নির্ধারণ

চিংড়ি চাষের প্রয়োজনীয় ব্যয়কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, ক, মূলধন খরচ (Capital cost), যা একবার করলে ৫-১০ বৎসর আর ব্যয় করতে হয় না এবং খ. আবর্তক খরচ (Recurring cost), যা প্রতি বছর ব্যয় করতে হয়।

ক. মূলধন ব্যয়ের খাতসমূহ

ক) নির্মাণ ব্যয়	১. বাঁধ নির্মাণ, ২. পাকা স্লুইস গেট নির্মাণ, ৩. নার্সারি পাইপ লাইন, ৪. পিলারসহ কাঁটা তারের বেড়া, ৫. পাম্প হাউজ, ৬. স্টাফ কোয়ার্টার, ৭. গার্ড সেড, ৮. বিদ্যুতের জন্য খুঁটি, ৯, বিদ্যুতের তারসহ ভাল্ব, ১০. গেট, ইত্যাদি।
খ) আসবাবপত্র	১. স্টিলের আলমারি , ২. কাঠের আলমারি, ৩. চেয়ার, ৪, টেবিল, ৫. সে, ৬. বিভিন্ন রেজিস্টার, ৭. আলো জ্বালানারে উপকরণ, ইত্যাদি।
গ) মেশিনপত্র	১. ওয়াটার পাম্প, ২. ডিপ টিউবওয়েল, ৩. জেনারেটর, ৪. এয়ারেটর, ৫. অগ্নিনির্বাপক উপকরণ, ইত্যাদি।
ঘ) যন্ত্রপাতি	১. পিএইচ মিটার (বাফার ট্যাবলেট ৭ ও ১০ সহকারে), ২. ডিও মিটার, ৩. রিফ্রাক্টোমিটার, ৪. অণুবীক্ষণ যন্ত্র, ৫. ওয়াটার এনালাইজার সেট, ৬. থার্মোমিটার, ৭. ডিস্টিল ওয়াটার, ৮, সেক্কি ডিস্ক, ইত্যাদি।

খ. আবর্তক ব্যয়ের খাত

ক) বেতন ও মজুরি	১. প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ২, সহকারী ব্যবস্থাপক, ৩. ক্যাশিয়ার, ৪. মেশিন অপারেটর, ৫, সাধারণ কর্মচারী, ৬. নৈশপ্রহরী, ৭. দৈনিক শ্রমিক ৮, মাস্টার রোল শ্রমিক, ইত্যাদি জনবল
খ) উৎপাদন ব্যয়	১. চিংড়ি পোনা, ২. চুন, ৩. সার, ৪. সম্পূরক খাদ্য, ৫. নেট/বাঁশ, ৬, যাতায়াত ও পরিবহন, ৭. জ্বালানি , ৮, জমি লীজ, ৯. স্টেশনারি দ্রবাদি, ১০. রোটেনন, ১১. বিচিং পাউডার, ইত্যাদি।

খাতওয়ারী ব্যয় নির্ধারণ: একটি ১০ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট আধানিবিড় চাষ পদ্ধতির বাগদা চিংড়ি খামারের খাতওয়ারী ব্যয় ও আয় নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

ক. মূলধন ব্যয়

প্রধান খাত	ক্রমিক নং	খাতসমূহ	প্রাক্কলিত খরচ (টাকা)
	১.	বাঁধ নির্মাণ	৫৫০০০০,০০
	২.	পাকা স্লুইস গেট নির্মাণ	৩৫০০০০.০০
	৩.	নার্সারি পাইপ লাইন	১১০০০০.০০

২০২২

প্রধান খাত	ক্রমিক নং	খাতসমূহ	প্রাক্কলিত খরচ (টাকা)
	৪.	কাটা তারের বেড়া	১ ৭৫০০০.০০
	৫.	পাম্প হাউজ	২৫০০০.০০
	৬.	স্টাফ কোয়ার্টার	৩৫০০০.০০
	৭.	গার্ড সেড	১০০০০.০০
	৮.	বিদ্যুতের জন্য খুঁটি	২০০০.০০
	৯.	বিদ্যুতের তারসহ বাল্ব	৭০০০.০০
	১০.	গেট	৩০০০০.০০
		মোট	১ ২৯৪০০.০০
খ) আসবাবপত্র	১.	স্টিল আলমারি (১টি)	৬০০০.০০
	২.	কাঠের আলমারি (১টি)	৪০০০.০০
	৩.	চেয়ার (৫টি)	২৫০০.০০
	৪.	টেবিল (২টি)	৩০০০.০০
	৫.	সেল্ফ	১৫০০.০০
	৬.	বিভিন্ন রেজিস্টার	৫০০.০০
	৭.	আলো জ্বালানোর উপকরণ	১০০০.০০
	৮.	বিবিধ	৩০০০.০০
		মোট	২১৫০০.০০
গ) মেশিনপত্র	১.	ওয়াটার পাম্প (৫টি)	২০০০০০.০০
	২.	এয়ার পাম্প (১টি)	৪৫০০০.০০
	৩.	ডিপ টিউবওয়েল (১টি)	১২০০০০.০০
	৪.	জেনারেটর (১টি)	৪৫০০০.০০
	৫.	এয়ারেটর	৬০০০.০০
	৬.	অগ্নিনির্বাপক উপকরণ	১০০০০.০০
		মোট	৪২৬০০০.০০
ঘ) যন্ত্রপাতি	১.	পিএইচ মিটার (৩ টি- বাফার ট্যাবলেটসহ)	৬৫০০.০০
	২.	ডিও মিটার	১৫০০০.০০
	৩.	রিফ্রাক্টোমিটার	১০০০০.০০
	৪.	অণুবীক্ষণ যন্ত্র	১০০০০.০০
	৫.	ওয়াটার এনালাইজার সেট	২০০০০.০০
	৬.	থার্মোমিটার (৫ টি)	২৫০.০০
	৭.	ডিস্টিল ওয়াটার (১ কেজি)	৫০০.০০
	৮.	সেক্কি ডিস্ক	২০০.০০
	৯.	বিবিধ	১০০০.০০
		মোট	৬৩৪৫০.০০
		সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)	১৮০৪৯৫০.০০

২০২২

খ. আবর্তক খরচ

প্রধান খাত	ক্রমিক নং	খাতসমূহ	প্রাক্কলিত খরচ (টাকা)
ক) বেতন ও মজুরি	১.	প্রকল্প ব্যবস্থাপক (১ জন)	৬০০০০.০০
	২.	সহকারী ব্যবস্থাপক কাম ক্যাশিয়ার (১ জন)	৪৮০০০.০০
	৩.	মেশিন অপারেটর (১ জুন)	৩৬০০০.০০
	৪.	সাধারণ কর্মচারী (৬ জন)	১০৮০০০.০০
	৫.	নৈশপ্রহরী (৬ জন)	১০৮০০০.০০
	৬.	দৈনিক শ্রমিক	৪০০০০.০০
	৭.	মাস্টার রোল শ্রমিক	২০০০০.০০
		মোট	৪২০০০০.০০
খ) উৎপাদন ব্যয়	১.	চিংড়ির পোনা ক্রয় (২৯৬৪০০ × ০.৪০)	১১৮৫৬০.০০
	২.	চুন	২৫০০০.০০
	৩.	সার	৯৩৭৫০.০০
	৪.	সম্পূরক খাদ্য (৩৬০০০ কেজি × ৩০.০০)	১০৮০০০০.০০
	৫.	নেট/বাঁশ	২৫০০০.০০
	৬.	যাতায়াত ও পরিবহন	১৫০০০.০০
	৭.	জ্বালানি	১৪৫০০০.০০
	৮.	জমি লিজ (২৫ একর × ১০০০০.০০)	২৫০০০০.০০
	৯.	স্টেশনারি দ্রব্যাদি	৮০০০.০০
	১০.	খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মেরামত	৩৫০০০.০০
	১১.	বিবিধ	৬০০০০.০০
		মোট	১৮৫৫৩১০.০০
		মোট সর্বমোট (ক+খ)	২২৭৫৩১০.০০

আয় নির্ধারণ: উক্ত খামারে বছরে ২টি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব বলে এখানে বার্ষিক আয়ের হিসাবে চিংড়ির উৎপাদন দ্বিগুণ দেখানো হলো:

ক) উৎপাদন পুকুরে কিশোর চিংড়ি মজুদের পরিমাণ = ৫০০০০০ টি

খ) পাঁচ মাস পর ১০% মৃত্যুহার ধরে বেঁচে থাকা চিংড়ির পরিমাণ = ৪৫০০০০ টি

গ) মোট উৎপাদন (৪৫০০০০+৪০ গ্রাম+২) = ৩৬০০০ কেজি

ঘ) মোট আয় (৩৬০০০ কেজি+২০০.০০ টাকা) =৭২০০০০০.০০ টাকা

প্রকৃত আয় (মোট আয়-আবর্তক ব্যয়) = ৭২০০০০০.০০ - ২২৭৫৩১০.০০ টাকা= ৪৯২৪৬৯০.০০ টাকা

চিংড়ি হ্যাচারির ব্যয়ের খাত নির্ধারণ

বাংলাদেশে লোনা পানির বাগদা চিংড়ির হ্যাচারি বিদ্যমান। বাগদা চিংড়ির হ্যাচারির ব্যয়ের খাতসমূহ নিম্নরূপঃ

ক. চিংড়ি হ্যাচারির বিনিয়োগ বা মূলধন ব্যয়

ক) জমির মূল্য
খ) ভূমি উন্নয়ন ব্যয়
গ) অফিস ও ল্যাবরেটরি স্থাপনের নির্মাণ ব্যয়
ঘ) বিভিন্ন ধরনের ট্যাংক ও স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ ব্যয়
ঙ) পানি উত্তোলন ও নির্গমন লাইন স্থাপন ব্যয়
চ) পাম্প হাউজ স্থাপন ও জেনারেটর স্থাপন ব্যয়
ছ) এ্যারেশন নেটওয়ার্ক স্থাপন ব্যয়
জ) বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক স্থাপন ব্যয়
ঝ) যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ব্যয়
ঞ) আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ব্যয়
ট) বাঁধ নির্মাণ ব্যয়
ঠ) বিপণন ব্যবস্থার অবকাঠামো নির্মাণ ব্যয়
ড) অন্যান্য ব্যয়।

খ. চিংড়ি হ্যাচারির পরিচালনা ব্যয়

ক) ডিমওয়ালা চিংড়ির ক্রয় বাবদ ব্যয়
খ) খাদ্য ক্রয় বাবদ ব্যয়
গ) পানি পরিশোধন ব্যয়
ঘ) স্থায়ী স্থাপনা সংস্কার ব্যয়
ঙ) বিদ্যুৎ ব্যয়
চ) ল্যাবরেটরি পরিচালনা ব্যয়
ছ) হ্যাচারিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয় বাবদ ব্যয়
জ) অক্সিজেন ও পলিথিন ব্যাগ ক্রয় বাবদ ব্যয়
ঝ) ঔষধ ক্রয় বাবদ ব্যয়
ঞ) অন্যান্য ব্যয়

গ. হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা ব্যয়

ক) হ্যাচারি ব্যবস্থাপক ও বিশেষজ্ঞদের বেতন সংক্রান্ত ব্যয়
খ) কর্মচারীদের বেতন বাবদ ব্যয়
গ) অফিস পরিচালনা ব্যয়
ঘ) বাজারজাতকরণ ব্যয়
ঙ) পরিবহন ব্যয়
চ) বীমা ব্যয়
ছ) ট্যাক্স ভ্যাট বাবদ ব্যয়
জ) বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয়
ঝ) অন্যান্য ব্যয়

হ্যাচারিতে আয়ের খাত নির্ধারণ

ক. প্রচলিত আয়ের উৎস

ক) উৎপাদিত পোনা বিক্রি
খ) পোনা উৎপাদনের পর ব্রুড চিংড়ি বিক্রি

খ. বিকল্প আয়ের উৎস।

ক) বাগদা হ্যাচারিতে বাগদার পর গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন।
খ) চিংড়ির পোনা উৎপাদন শেষে মাছের পোনা উৎপাদন।
গ) অর্থের বিনিময়ে হ্যাচারি ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান।
ঘ) হ্যাচারি কমপেক্সের অব্যবহৃত জায়গার শাক-সবজি, ফলমূল উৎপাদন।
ঙ) আর্টিমিয়া সিস্ট ক্রয় করে রেখে উৎপাদন চলাকালীন বিক্রি।

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. কোন ধরনের মাটিতে হ্যাচারি স্থাপন করা উচিত নয়?

২. হ্যাচারিতে প্রয়োজনীয় ব্যয়কে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

৩. হ্যাচারিতে প্রতি বছর কোন ধরনের খরচ নির্বাহ করতে হয়?

৪. হ্যাচারিতে ট্যাংক নির্মাণ ব্যয় কোন ধরনের ব্যয় ?

৫. হ্যাচারিতে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন ব্যয় কোন ধরনের ব্যয়?

৬. খামারে কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ ব্যয় কোন ধরনের ব্যয় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাগদা চিংড়ির প্রকল্প প্রণয়নের উদ্দেশ্য কি?

২. চিংড়ি হ্যাচারির ক্ষেত্রে ছোট প্রকল্প বাস্তবায়নের সুবিধাগুলো লিখ ।

৩. মূলধন খরচ ও আবর্তন খরচ বলতে কি বাঝে?

৪. প্রচলিত পদ্ধতির বাগদা চিংড়ির খামারের উৎপাদন ব্যয়ের উপখাতগুলোর নাম লিখ ।

৫. আধা নিবিড় চাষ পদ্ধতির বাগদা চিংড়ির খামারের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উপখাতগুলোর নাম লিখ ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাগদা চিংড়ির প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব প্রদান করতে হয় সেগুলো লিপিবদ্ধ কর ।

২. বাগদা চিংড়ির প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপকৃত বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ কর ।

৩. একটি ১০ একর বিশিষ্ট আধানিবিড় চাষ পদ্ধতির খামারের বার্ষিক আয় নির্ধারণ কর ।

৪. চিংড়ি হ্যাচারিতে আয়ের খাতগুলো বর্ণনা কর ।

শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-১

দ্বিতীয় পত্র

ব্যবহারিক

২০২২

ব্যবহারিক- ১: বাগদা চিংড়ির পোনা পরিবহনের কৌশল

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. পোনা দুটি পদ্ধতিতে পরিবহন করা যায়, যথা- সনাতন পদ্ধতি ও আধুনিক পদ্ধতি।

২. প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত পোনা সাধারণত সনাতন পদ্ধতিতে পরিবহন করা হয়। সনাতন পদ্ধতির পরিবহনে অ্যালুমিনিয়াম/মাটির হাড়িতে পোনা পরিবহন করা হয়। এই পদ্ধতিতে সাধারণত ৩ থেকে ৪ ঘন্টার দূরত্বে পোনা পরিবহন করা হয়।

৩. হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা সাধারণত আধুনিক পদ্ধতিতে পরিবহন করা হয়। এই পদ্ধতিতে পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেন সরবরাহ করে পোনা পরিবহন করা হয়। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য তাপ নিরোধক বাক্স ও বরফ ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে ৪ থেকে ৩৬ ঘন্টার দূরত্বে পোনা পরিবহন করা যায়।

চিত্র: অ্যালুমিনিয়াম পাত্রে চিংড়ি পোনা পরিবহন

চিত্র: সাইকেলে পোনা পরিবহন

চিত্র: ড্রামে পোনা পরিবহন

চিত্র: নৌকাতে পোনা পরিবহন

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. পলিথিন ব্যাগ
২. অক্সিজেন ভর্তি সিলিন্ডার
৩. বরফ
৪. তাপ নিরোধক বাক্স
৫. অ্যালুমিনিয়াম পাত্র মাটির হাড়ি
৬. সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত জাল
৭. রাবার ব্যান্ড
৮. ব্যবহারিক খাতা
৯. পেনসিল
১০. ইরেজার,

কাজের ধারা

১. কোনো ফড়িয়া বা প্রাকৃতিক উৎস থেকে পোনা সংগ্রহকারীর নিকট গমন করে অ্যালুমিনিয়াম পাত্র/মাটির । হাড়িতে পোনা পরিবহন পদ্ধতিটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা ।

২. হ্যাচারি থেকে আধুনিক পদ্ধতিতে পোনা পরিবহন কার্যক্রমটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য যেতে হবে ।

৩. অতঃপর পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেন সরবরাহ পদ্ধতিটি এবং পলিথিন ব্যাগের মুখ রাবার ব্যান্ড দিয়ে বন্ধ করার পদ্ধতিটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর ।

৪. সনাতন ও আধুনিক পদ্ধতিতে পোনা পরিবহনের নিয়মগুলো ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখ ।

ব্যবহারিক- ২ঃ বাগদা চিংড়ির পোনা পরিবহনের জন্য প্যাকিং অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. চিংড়ি পোনা পরিবহনের সময় ৪ ঘন্টার বেশি হলে বরফ এবং অক্সিজেন দুই-ই ব্যবহার করতে হবে ।

২. পরিবহন পাত্রে তাপমাত্রার দ্রুত হ্রাস-বৃদ্ধি রোধের জন্য তাপ নিরোধক পাত্র ব্যবহার করা হয় । পরিবহনকালে পানির তাপমাত্রা ২০-২৫° সে এর মধ্যে রাখতে হবে ।

৩. প্রতি লিটার পানিতে প্রতি ঘন্টা পরিবহনের জন্য ১০ গ্রাম বরফের প্রয়োজন হয় ।

৪. অক্সিজেন সরবরাহকৃত পলিথিন ব্যাগে প্রতি লিটার পানিতে ৫০০টি ছোট পোনা পরিবহন করা যায় ।

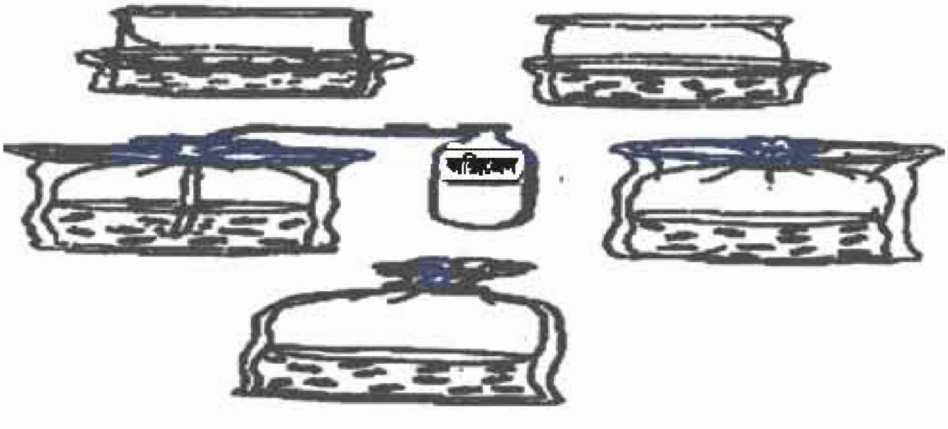

চিত্রঃ পলিথিন ব্যাগে বাগদা চিংড়ির পোনা পরিবহনের জন্য প্যাকিং পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. পলিথিন ব্যাগ (৬০ সেমিদ্দ৪০ সেমি)
২. অক্সিজেন ভর্তি সিলিন্ডার
৩. লবণাক্ত পানি (৬-৮ লিটার)
৪. মগ
৫. পাস্টিকের বড় গামলা
৬. চিংড়ি পোনা (৩ - ৪ হাজার টি)
৭. রাবার ব্যান্ড
৮. ব্যবহারিক খাতা
৯. পেনসিল
১০. ইরেজার,ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ বাজার থেকে ৬০ সেমি ৪০ সেমি আকার ও ০.০৬-০.৩৮ মিমি পুরুত্ব বিশিষ্ট ২টি পলিথিন ব্যাগ সংগ্রহ কর ।

২. এবার নিকটবর্তী কোনো হ্যাচারিতে গমন কর ।

৩. একটি পলিথিন ব্যাগকে আরেকটি পলিথিন ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে ব্যাগ দুটিকে একত্রিত করে এর ভিতর ৬ থেকে ৮ লিটার লবণাক্ত পানি ভর্তি কর ।

৪. এবার পলিথিন ব্যাগের পানিতে ৩ থেকে ৪ হাজার চিংড়ির পোনা/পিএল রেখে এতে অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে অক্সিজেন সরবরাহ কর ।

৫. পলিথিন ব্যাগ অক্সিজেন পূর্ণ হলে অক্সিজেন সিলিন্ডারের নলটি ব্যাগ থেকে বের করে নিয়ে ব্যাগের মুখ রাবার ব্যান্ড দিয়ে ভালোভাবে বাধতে হবে যাতে অক্সিজেন বের না হয়ে যায় ।

৬. অতঃপর পলিথিনের ব্যাগের নিচের দুই কোণা রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধতে হবে যাতে পানি ও অক্সিজেনের চাপে ব্যাগ ফেটে না যায় ।

৭. শেষে অনুশীলনকৃত প্যাকিং পদ্ধতিটি ব্যবহারিক খাতায় ধারাবাহিকভাবে লিখ ।

২০২২

ব্যবহারিক- ৩: পোনা বেঁচে থাকার হার পরীক্ষা

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পোনা মজুদের পর বিভিন্ন কারণে কিছু পোনা বিশেষ করে দুর্বল ও রোগাক্রান্ত পোনা মারা যেতে পারে। পোনা মারা গেলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পানির উপর ভেসে উঠে। মৃত পোনা ঢেউ-এর অনুকূলে পাড়ের কাছাকাছি চলে আসে।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. সিলভারের সাদা পেটগামলা
২. প্লাস্টিকের ছোট মগ
৩. ব্যবহারিক খাতা
৪. পেনসিল
৫. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ খামারে পোনা মজুদকৃত পুকুরের পাড়ে গিয়ে পোনা মজুদের ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা পর পুকুরের পাড়ের কাছাকাছি পোনার চলাফেরা পর্যবেক্ষণ কর।

২. পুকুর পাড়ের কিনারা থেকে মগ দিয়ে মৃত পোনা সংগ্রহ করে প্লেট বা গামলায় রাখ।

৩. এবার মৃত পোনা গণনা করে মোট সংখ্যা বের কর।

৪. মৃত পোনার সমসংখ্যক পোনা পুনরায় মজুদের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. পোনা পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখ।

ব্যবহারিক- ৪ঃ সম্পূরক খাদ্য উপাদান শনাক্তকরণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বাংলাদেশে চিংড়ি খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান সহজেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এসব খাদ্য উপাদানের মধ্যে ফিসমিল, চালের কুঁড়া, তিলের খৈল, গমের ভুষি, ময়দা ও চিটা গুড় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. ফিসমিল
২. চালের কুঁড়া
৩. তিলের খৈল
৪. গমের ভুষি
৫. ময়দা
৬. সয়াবিন খৈল
৭. সরিষার খৈল
৮. পলিথিন ব্যাগ
৯. ট্রে
১০. ব্যবহারিক খাতা
১১. পেনসিল
১২. ইরেজার, ইত্যাদি

চিত্রঃ সম্পূরক খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ বাজার থেকে ১০০ গ্রাম করে ফিসমিল, চালের কুঁড়া, তিলের খৈল, গমের ভুষি, ময়দা, সয়াবিন খৈল, সরিষার খৈল ও চিটা গুড় প্রভৃতি উপাদান আলাদা আলাদাভাবে ছোট পলিথিন ব্যাগে সংগ্রহ কর।

২. সংগৃহীত খাদ্য উপাদানগুলো ব্যাগসহ পরীক্ষাগারের কক্ষে নিয়ে বিভিন্ন ট্রের উপর সারিবদ্ধভাবে পলিথিন রাখ।

৩. প্রতিটি পলিথিন ব্যাগের মুখ খুলে খাদ্য উপাদানগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৪. প্রতিটি খাদ্য উপাদানের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যবহারিক খাতায় ভালোভাবে লিখ।

৫. এবার খাদ্য উপাদানগুলো পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিটি ধারাবাহিকতাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখ।

ব্যবহারিক- ৫: বাগদা হ্যাচারিতে চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

যে পরিমাণ সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা হবে তার শতকরা ৪০ ভাগ চালের কুঁড়া, ২০ ভাগ চিংড়ির মাথা চূর্ণ, ১২.৫ ভাগ সরিষার খৈল, ২০ ভাগ ফিসমিল, ৪ ভাগ সাগু দানা, ৩ ভাগ মাছের তৈল, ০.২৫ ভাগ লবণ ও ০.২৫ ভাগ ভিটামিন থাকা বাঞ্ছনীয়। ২ কেজি সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ হলো

১. চালের কুঁড়া/গমের ভুষি (৪০%)		= ৮০০ গ্রাম
২. চিংড়ির মাথা চূর্ণ (২০%)		= ৪০০ গ্রাম
৩. সরিষার খৈল (১২.৫%)		= ২৫০ গ্রাম
৪. ফিসমিল (২০%)		= ৪০০ গ্রাম
৫. সাগু দানা (৪%)		= ৮০ গ্রাম
৬. মাছের তৈল (৩%)		= ৬০ গ্রাম
৭. লবণ (০.২৫%)		= ৫ গ্রাম
৮. ভিটামিন (০.২৫%)		= ৫ গ্রাম
	মোট	= ২০০০ গ্রাম

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. ছোট ড্রাম
২. বালতি
৩. ছোট মগ
৪. সেমাই বা শিপিং মেশিন
৫. বাঁশের চাটাই
৬. ব্যবহারিক খাতা
৭. পেনসিল
৮. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. উপরে বর্ণিত খাদ্য উপাদানগুলো নিকটস্থ বাজার থেকে বাজারদর যাচাই করে সংগ্রহ কর।

২. অতঃপর খাদ্য উপাদানগুলো পরীক্ষাগারে নিয়ে শুকনো অবস্থায় ড্রামে ভালোভাবে মিশিয়ে ফেল।

৩. উপাদানগুলো উত্তমরূপে মেশানারে পর মগ দিয়ে অল্প অল্প পানি দিয়ে সমগ্র মিশ্রণটি ভালোভাবে নেড়ে আঠালো পেস্ট বা মণ্ডে পরিণত কর।

৪. এবার এই মণ্ডের কিছু অংশ নিয়ে হাত দিয়ে ছোট ছোট বল তৈরি কর এবং অবশিষ্ট অংশ সেমাই বা শিপিং মেশিন দিয়ে পিলেট খাদ্য তৈরি কর।

৫. পিলেট খাদ্যগুলো এবার চাটাই এর উপর ছড়িয়ে দিয়ে রৌদ্রে ভালোভাবে শুকিয়ে নাও।

৬. শেষে অনুশীলনকৃত কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখ।

ব্যবহারিক- ৬ঃ ফিডিং ট্রেতে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পুকুর বা ঘেরে ফিডিং ট্রের মাধ্যমে খাদ্য প্রয়োগ করলে খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা সহজ হয় এবং খাদ্যের অপচয় কম হয়। ট্রে দেখতে অনেকটা ছোট ফাসযুক্ত ধর্মজালের মত এবং আনুমানিক আকার ১ বর্গমিটার। প্রতি ৩০-৪৫ শতাংশে পানির আয়তনে একটি ট্রে স্থাপন করা যায়। নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। মজুদকৃত চিংড়ির মোট ওজনের ৫-১০% হারে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতিদিন খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ = মোট মজুদকৃত চিংড়ি × বেঁচে থাকার হার (%) × প্রতিটি চিংড়ির গড় ওজন × খাবার প্রয়োগের মাত্রা (%)

চিত্রঃ ফিডিং ট্রেতে খাদ্য প্রয়োগ

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. পিলেট খাদ্য
২. ব্যালান্স
৩. হাফ ড্রাম
৪. ঝাকি জাল
৫. ব্যবহারিক খাতা
৬. পেনসিল
৭. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. নমুনা সংগ্রহ করে মজুদকৃত মোট চিংড়ির ওজন নির্ণয় করে উপরোক্ত সূত্রের সাহায্যে খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ নির্ণয় কর।

২. এবার নির্ধারিত মোট খাদ্যকে দুটি সমান অংশে ভাগ কর।

৩. এক অংশ সকালে ট্রে'র মাধ্যমে পুকুরে প্রয়োগ কর।

৪. অবশিষ্ট অংশ সন্ধ্যায় ট্রে'র মাধ্যমে পুকুরে প্রয়োগ কর।

৫. সন্ধ্যায় খাদ্য প্রয়োগের পূর্বে ট্রে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখ কোন খাদ্য অবশিষ্ট আছে কিনা। যদি খাদ্য অবশিষ্ট থাকে তবে খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ কমাতে হবে এবং অবশিষ্ট না থাকলে খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

৬. শেষে ট্রে'র মাধ্যমে প্রয়োগ পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতার লিখ।

ব্যবহারিক- ৭ঃ বাগদা চিংড়ি আহরণ কৌশল পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

একসাথে একই আকারের পোনা মজুদ করা হলেও একই সময়ের ব্যবধানে প্রতিটি চিংড়ি সমান বড় হয় না। বাগদার পোনা মজুদের ৩ মাসের মধ্যে কিছু চিংড়ির ওজন ৫০ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আংশিক বা সম্পূর্ণ আহরণ পদ্ধতিতে চিংড়ি ধরা হয়। আংশিক আহরণ পদ্ধতিতে চিংড়ি আহরণের জন্য খেপলা বা ঝাঁকি জাল, বেড় জাল বা বাঁশের চাই ব্যবহার করা হয়। চিংড়ি চাষের পরিকল্পিত মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে অথবা পুকুরের পানির স্তর কমে গেলে সম্পূর্ণ আহরণ পদ্ধতিতে চিংড়ি আহরণ করা হয়। সম্পূর্ণ আহরণ পদ্ধতিতে পুকুর শুকিয়ে অথবা বেড় জাল টেনে চিংড়ি ধরা হয়। তাছাড়া অমাবস্যা-পূর্ণিমা তিথিতে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সময় চিংড়ি সহজেই আহরণ করা যায়।

চিত্রঃ বাগদা চিংড়ি আহরণ

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. ঝাঁকি জাল
২. বেড় জাল
৩. পাম্প মেশিন
৪. বাশের চাই
৫. ঝুঁড়ি (মাঝারি আকারের)
৬. ব্যবহারিক খাতা
৭. পেনসিল
৮. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

ক. আংশিক আহরণ

১. অমাবস্যা-পূর্ণিমা তিথিতে নিকটবর্তী কোনো বাগদা চিংড়ি চাষকৃত পুকুরের পাড়ে যাও।

২. পানি সরবরাহ গেটের কাছে সন্ধ্যার সময় চাই স্থাপন কর।

৩. পরবর্তী দিন সকালে পানি থেকে চাই পাড়ে উঠিয়ে চাই থেকে ৭০-৮০ গ্রাম ওজনের বাগদা চিংড়ি সগ্রহ করে ঝুড়িতে রাখ। ছোট ছোট চিংড়িগুলো পুনরায় পুকুরে ছেড়ে দাও।

২০২৫

৪. পুকুরের যেসব স্থানে খাবার প্রয়োগ করা হয় সেসব জায়গা থেকেও সন্ধ্যা বা সকাল বেলায় ঝাকি জাল দিয়ে। ৭০-৮০ ওজনের চিংড়ি আহরণ করা যেতে পারে।

৫. আহরণকৃত চিংড়ি ঝুড়িতে রাখ।

৬. শেষে আংশিক আহরণ পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখ।

খ. সম্পূর্ণ আহরণ

১. নিকটস্থ কোনো বাগদা চিংড়ি চাষকৃত পুকুর পাড়ে যাও।

২. এবার বেড় জাল দিয়ে যতটা সম্ভব চিংড়ি ধরে ফেল।

৩. এরপর পাম্প মেশিন দিয়ে পুকুরের পানি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন করে ফেল।

৪. অতঃপর হাত দিয়ে ছোট-বড় নির্বিশেষে সব চিংড়ি ধরে ফেল।

৫. আহরিত চিংড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় ঝুড়িতে রাখ।

৬. সম্পূর্ণ আহরণ পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখ।

ব্যবহারিক- ৮: আহরিত চিংড়ি বাছাইকরণ অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

তাপমাত্রা বেশি থাকলে আহরণের প্রথম ৩ ঘন্টার মধ্যেই চিংড়ির গুণগত অবস্থার বেশ অবনতি ঘটে। এ অবস্থা রাধেকল্পে অল্প পরিমাণ চিংড়ি আহরণপূর্বক ঠান্ডা পানি দিয়ে ধৌত করে ছায়ামুক্ত স্থানে রাখতে হবে। উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার জন্য চিংড়ির গ্রেডিং বা বাছাইকরণ যথাযথভাবে হওয়া একান্ত দরকার। এজন্য আহরিত চিংড়ি খামার থেকেই সঠিকভাবে গ্রেডিং করে বাজারজাতকরণের জন্য প্যাকিং করতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. চিংড়ি
২. ছোট ড্রাম
৩. পরিষ্কার পানি
৪. বরফ মিশ্রিত পানি
৫. বাঁশের চাটাই/হোগলা
৬. ট্রে
৭. ব্যবহারিক খাতা
৮. পেনসিল
৯. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. চিংড়ি ধরার পর পরই ছায়াযুক্ত স্থানে চাটাই বা হাগেলার উপর রাখ।

২. এবার চিংড়িগুলো পরিষ্কার পানি দিয়ে ধৌত কর।

৩. পরিষ্কার পানি দিয়ে ধৌত চিংড়িগুলোকে এবার ড্রামের ভিতর ব্রফ মিশ্রিত পানিতে রাখ।

৪. এবার চিংড়িগুলোকে বরফ থেকে তুলে ট্রেতে রাখ।

৫. অতঃপর চিংড়িগুলো বিভিন্ন গ্রেডে বাছাই কর।

৬. গ্রেড অনুযায়ী চিংড়িগুলো বিভিন্ন ট্রেতে বরফ ও চিংড়ি স্তরে স্তরে সাজাও।

৭. চিংড়ি গ্রেডিং-এর পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখ।

২০২২

ব্যবহারিক- ৯: খামারে চিংড়ি প্যাকিং ও পরিবহন অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

স্বাস্থ্যসম্মতভাবে চিংড়ি সংরক্ষণ না করলে চিংড়ির ন্যায্য মূল্য পাওয়া যায় না। এজন্য একই প্রজাতির ও একই আকারের শক্ত খোলস বিশিষ্ট, পরজীবীমুক্ত এবং দেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই এমন চিংড়ি বাজারজাতকরণের জন্য প্যাকিং করতে হবে। চিংড়ির গুণগতমান আহরণ পরবর্তী সময় ও তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল। তাই চিংড়ির গুণগতমান সংরক্ষণের জন্যে স্বল্প পরিমাণ চিংড়ি আহরণ করত মাথাসহ চিংড়ি পরিবহন করা ভালো।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. তাপ নিরোধক পাত্র
২. চিংড়ি
৩. বরফ
৪. ব্যবহারিক খাতা
৫. পেনসিল
৬. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ বাজার বা খামার থেকে ভালোমানের কিছু চিংড়ি সংগ্রহ কর।

২. বরফ মিশ্রিত পানি দিয়ে চিংড়িগুলো ভালোভাবে ধুয়ে ফেল।

৩. তাপ নিরোধক পাত্রের তলায় এক স্তর বরফ সাজানোর পর তার উপর এক স্তর চিংড়ি সাজাও। এভাবে এক স্তর বরফ ও এক স্তর চিংড়ি সাজাও। মনে রাখতে হবে যেন পাত্রে ৬০ সেমি-এর বেশি উচ্চতায় চিংড়ি সাজানো না হয়।

৪. পাত্রে চিংড়ি সাজানো শেষ হলে পাত্রের মুখটি তাপ নিরোধক ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দাও।

৫. এভাবে প্যাকিং করা শেষ হলে পাত্রের মুখটি তাপ নিরোধক ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দাও।

৬. প্যাকিং পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

ব্যবহারিক - ১০: চিংড়ির রোগ পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

খামারে নিম্নবর্ণিত লক্ষণ দেখে রোগাক্রান্ত চিংড়ি শনাক্ত করা যায়, যেমন-

১. পুকুরে হঠাৎ মৃত চিংড়ি পাওয়া গেলে।

২. সকালে চিংড়ি খামারের পাড় ঘেষে বা পানিতে ভেসে চলাচল করলে।

৩. হঠাৎ পানির রঙের পরিবর্তন ঘটলে।

৪. পুকুরের পানি থেকে পচা ডিমের মতো গন্ধ পেলে।

৫. দিনের বেলায় পানির উপর দিয়ে চিংড়ি দ্রুত সাঁতার কাটলে।

৬. পানির তাপমাত্রা ৩২°সে- এর উপরে হলে।

৭. পানির পিএইচ-এর মাত্রা খুব কম বা খুব বেশি হলে।

২০২২

চিংড়ির দৈহিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেও চিংড়ির রোগ শনাক্ত করা যায়, যেমন —

১. চিংড়ির খোলস বা ক্যারাপেসে কাল বা বাদামি রং দেখা দিলে।

২. বহিঃখোলস হালকা সাদা বর্ণ ধারণ করলে।

৩. চলন উপাঙ্গ, ইউরোপডড এবং ক্যারাপসে ফাটল দেখা দিলে বা কালো দাগের সৃষ্টি হলে।

৪. পুকুর পাড়ের কাছে চিংড়ি অলসভাবে ঘারোফেরা করলে।

৫. চিংড়ির খোলস নরম হলে।

৬. ফুলকায় কালো বা হলদে দাগ দেখা গেলে।

৭. নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ না করলে।

৮. দেহ কিংবা লেজ বেঁকে গেলে।

৯. চিংড়ির দেহে আঙুল দিয়ে চাপ দিলে আঙুল কিছুটা বসে গেলে।

চিংড়িকে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে নিম্নবর্ণিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়

১. পুকুর নিয়মিত শুকিয়ে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

২. নিয়মিতভাবে ৪০-৫০% পানি পরিবর্তন করতে হবে।

৩. কম ঘনত্বে পোনা মজুদ করতে হবে।

৪. উন্নতমানের সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

৫. দ্রবীভূত অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. পুকুরের তলদেশ পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. চিংড়ি
২. পাস্টিকের বালতি
৩. নিডল
৪. ফরসেপ
৫. ট্রে
৬. ব্যবহারিক খাতা
৭. পেনসিল
৮. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধারা

১. নিকটস্থ খামার থেকে ৮/১০ টি চিংড়ি সংগ্রহ কর।

২. সংগৃহীত চিংড়ি বালতিতে করে দ্রুত পরীক্ষাগারে নিয়ে আস।

৩. ফরসেপ দিয়ে চিংড়িগুলো বালতি থেকে তুলে ট্রেতে রাখ।

৪. নিডিল দিয়ে নেড়ে চেড়ে চিংড়িগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৫. চিংড়ির খোলসের রং, ফুলকার রং, উপাঙ্গাসমূহের অবস্থা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ কর এবং এসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবস্থা খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

৬. চিংড়ির রোগ শনাক্তকরণের পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখ।

ব্যবহারিক- ১১: আর্টিমিয়া সিস্ট থেকে নপ্লি উৎপাদন অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বাগদা চিংড়ি উৎপাদনের জন্য খুব গুরুত্বপুর্ণ উপাদান হলো আর্টিমিয়া। বাগদা রেণু উৎপাদন নির্ভর করে আর্টিমিয়া নপ্লির পর্যাপ্ততার উপর। আমাদের দেশে আর্টিমিয়া শুকনো অবস্থায় কৌটাতে পাওয়া যায়। আর্টিমিয়া আমেরিকার সল্ট লেকে অধিক লবণাক্ত পানিতে উৎপাদন হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. আর্টিমিয়া সিস্ট
২. ব্লিচিং পাউডার
৩. সামুদ্রিক পানি
৪, স্বাদু পানি
৫. ১২০ ক্রমিক মেসের নেট
৬. থার্মোমিটার
৭. পাস্টিকের বালতি
৮. এয়ারেটর
৯. ট্রে
১০. ব্যবহারিক খাতা
১১. পেনসিল
১২. ইরেজার, ইত্যাদি

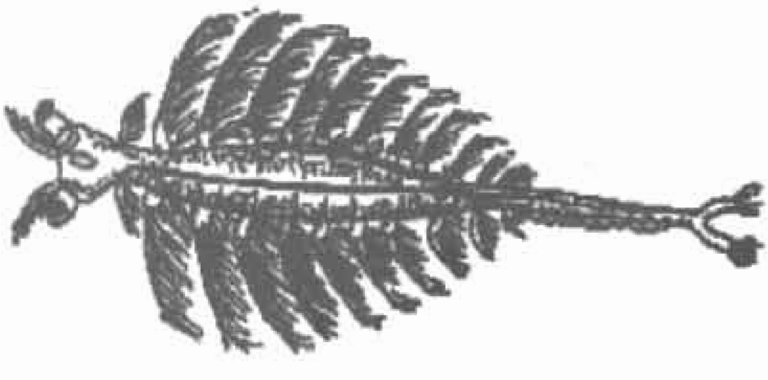

চিত্রঃ পূর্ণাঙ্গ আর্টিমিয়া

কাজের ধারা

১. আর্টিমিয়া সিস্ট সংগ্রহ করে সিস্ট ব্লিচিং পাউডারের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। ১ গ্রাম সিস্ট এর সাথে ১৫ মিলি ব্লিচিং পাউডার এর দ্রবণে জীবাণুমুক্ত করা যেতে পারে।

২. অতঃপর ৩৫ পিপিটির পানিতে আর্টিমিয়া নপ্লি রেখে অ্যারেটর পুরো গতিতে চালাতে হবে।

৩. ২৪ ঘন্টা অ্যারেশন দিলে আর্টিমিয়া গি হ্যাচ করবে।

৪. হ্যাচ সম্পূর্ণ হওয়ার পর মেস নেট দিয়ে ছেকে নিতে হবে।

৫. হ্যাচ হওয়ার পর আর্টিমিয়া নপ্লি চিংড়ির ফিডিং উপযোগী হয়।

৬. পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

২০২২

ব্যবহারিক - ১২ঃ আহরিত চিংড়ি বরফায়ন কৌশল অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বরফ একটি আদর্শ শীতলীকরণ মাধ্যম। বরফের ঠান্ডাকরণ ক্ষমতা খুব বেশি নিরাপদ, তুলনামূলকভাবে সস্তা এবং চিংড়ির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে চিংড়িকে দ্রুত শীতল করে। কার্যকর শীতলীকরণের জন্য বরফকে অবশ্যই গলতে দিতে হবে। অধিকন্তু গলিত বরফ চিংড়িকে আর্দ্র ও চকচকে রাখে।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. তাপ নিরোধক পাত্র
২. চিংড়ি
৩. বরফ
৪. ব্যবহারিক খাতা
৫. পেনসিল
৬. ইরেজার, ইত্যাদি

চিত্রঃ চিংড়ি বরফায়ন

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ বাজার বা খামার থেকে ভালোমানের কিছু চিংড়ি সংগ্রহ কর।

২. বরফ মিশ্রিত পানি দিয়ে চিংড়িগুলো ভালোভাবে ধুয়ে ফেল।

৩. তাপ নিরোধক পাত্রের তলায় এক স্তর বরফ সাজানোর পর তার উপর এক স্তর চিংড়ি সাজাও। এভাবে। একস্তর বরফ ও এক স্তর চিংড়ি সাজাও যেন পাত্রে ৬০ সেমি এর বেশি উচ্চতর চিংড়ি সাজানো না হয়।

৪. এভাবে প্যাকিং করা শেষ হলে পাত্রের মুখটি তাপ নিরোধক ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দাও।

৫. বরফায়ন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

ব্যবহারিক- ১৩: অর্গানোলেপ্টিক (স্পর্শ করে, গন্ধ শুকে ও দেখে) পদ্ধতিতে ভালো ও খারাপ চিংড়ি শনাক্তকরণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বাংলাদেশে চিংড়ির উৎপাদন - যোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও ঘের/পুকুর মালিকরা চিংড়ির সঠিক মূল্য পাচ্ছে না মূলত চিংড়ি ধরার পর উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ও সঠিকভাবে স্থানান্তরের অভাবে। স্থানান্তর সঠিকভাবে না হওয়ার কারণে চিংড়ির গুণগত ও সংখ্যাগত ক্ষতি হচ্ছে। চিংড়ি আহরণ করা থেকে প্রক্রিয়াজাত করার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মাঝে এনজাইমের বিক্রিয়া, অক্সিডেশন, ব্যাকটেরিয়ার কর্মতৎপরতা ইত্যাদি কারণে চিংড়ির পচন ত্বরান্বিত হয়ে থাকে। তাই পচন রাধে করার জন্য চিংড়ি ধরার পর পরই সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

চিংড়ির গন্ধ, স্পর্শ ও দৃষ্টিজনিত বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক্রমিক	গন্ধজনিত বৈশিষ্ট্য	স্পর্শজনিত বৈশিষ্ট্য	দৃষ্টিজনিত বৈশিষ্ট্য	স্কোর
১.	তাজা চিংড়ির গন্ধ/ভালো গন্ধ	শক্ত	উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ	১০
২.	তুলনামূলকভাবে ভালো গন্ধ	হালকা শক্ত	তুলনামূলক স্বচ্ছ	৯
৩.	মিষ্টি গন্ধ	তুলনামূলকভাবে শক্ত	হালকা স্বচ্ছ	৮
৪.	হালকা গন্ধহীন	হালকা শক্ত	হালকা অনুজ্জ্বল	৭
৫.	তুলনামূলকভাবে গন্ধহীন	তুলনামূলকভাবে কম শক্ত	তুলনামূলকভাবে অনুজ্জ্বল	৫
৬.	পচা গন্ধযুক্ত	নরম	অনুজ্জ্বল ও অস্বচ্ছ	৩
৭.	খুব পচা গন্ধ	খুব নরম	সম্পূর্ণ অনুজ্জ্বল ও অস্বচ্ছ	০

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. চিংড়ি
২. একটি টেস্ট প্যানেল
৩. ব্যবহারিক খাতা
৪. পেনসিল
৫. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ বাজার বা খামার থেকে ভালোমানের কিছু চিংড়ি সংগ্রহ কর।
২. বরফ মিশ্রিত পানি দিয়ে চিংড়িগুলো ভালোভাবে ধুয়ে ফেল।
৩. এরপর কোর সিট অনুযায়ী চিংড়িগুলোকে মার্কিং কর।
৪. পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

ব্যবহারিক- ১৪: চিংড়ি হ্যাচারির বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

কোনো হ্যাচারি পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণের পূর্বে হ্যাচারি কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি নেয়া প্রয়োজন। হ্যাচারি কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে হ্যাচারির নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

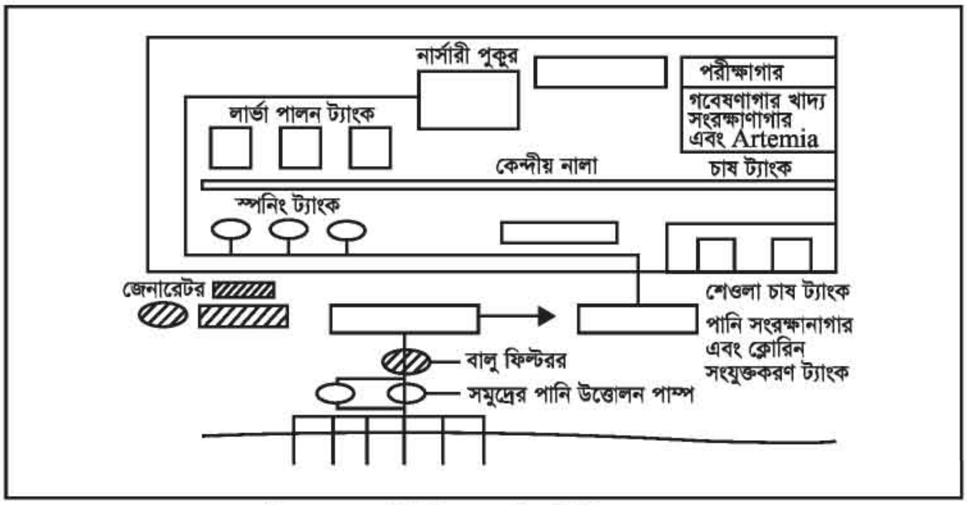

চিত্রঃ বাগদা চিংড়ি হ্যাচারির বিভিন্ন স্থাপনা

হ্যাচারির গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ

১. ব্রুড চিংড়ি প্রতিপালন ট্যাংক
২. পনিং ট্যাংক
৩. লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংক
৪. অ্যালজি চাষের ট্যাংক
৫. আর্টিমিয়া চাষের ট্যাংক
৬. রটিফার চাষের ট্যাংক
৭. লোনা পানির জলাধার
৮. মিঠা পানির জলাধার
৯, লোনা পানির ওভারহেড ট্যাংক
১০. পরিস্রাবণ ট্যাংক
১১. পাম্প হাউস
১২. নার্সারি পুকুর
১৩. গুদাম ঘর
১৪. জেনারেটর হাউস

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. মেজারিং টেপ
২. ব্যবহারিক খাতা
৩. পেনসিল
৪. ইরেজার, ইত্যাদি

২০২২

কাজের ধারা

১. নিকটস্থ কোনো চিংড়ি হ্যাচারিতে গমন কর।

১. হ্যাচারির আয়তন, হ্যাচারির প্রতিষ্ঠাকাল, কর্মরত জনবল, ব্রুড চিংড়ির উৎস, পিএল উৎপাদনের পরিমাণ ও পোনা প্যাকিং সুবিধাসহ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ কর।

২. এবার হ্যাচারির উপরালেখিত উল্লেখযোগ্য অংশসমূহ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৩. অতঃপর ব্যবহারিক খাতায় চিংড়ি হ্যাচারির বিভিন্ন অংশের ছবি আঁক।

৪. হ্যাচারি পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

ব্যবহারিক- ১৫: একটি চিংড়ি হ্যাচারির বিভিন্ন যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

কোনো হ্যাচারির যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ করার পূর্বে হ্যাচারি কর্তৃপক্ষেও পূর্বানুমতি নেয়া প্রয়োজন। হ্যাচারি কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে হ্যাচারির নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতিসমূহ পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

১.মাইক্রোস্কোপ (Microscope)
২. ব্যালান্স (Balance)
৩. ক্যাথেটার (Catheter)
৪. টিস্যু হোমোজেনাইজার (Tissue homozenizer)
৫. সেন্ট্রিফিউজ (Centrifuge)
৬. সিরিঞ্জ (Syringe)
৭. ডিসেক্টিং বক্স (Dissecting box)
৮. থার্মোমিটার (Thermometer)
৯. রিফ্রাক্টোমিটার (Refractometer)
১০. পিএইচ মিটার (pH meter)
১১. অক্সিজেন মিটার (Oxygen meter)
১২. রেফ্রিজারেটর (Refrigerator)
১৩. ডিপ ফ্রিজার (Deep frezer)
১৪. এ্যারেটর (Aerator)
১৫. জেনারেটর (Generator)
১৬. বৈদ্যুতিক চুলা (Electric heater)
১৭. অক্সিজেন সিলিন্ডার (Oxygen Cylinder)
১৮. সেক্কি ডিক (Sechi disk)
১৯. প্ল্যাংকটন গণনাকারী এসআর সেল (Plankton counting SR cell)
২০. ট্রলি/পিক আপ
২১. হ্যাক করাত (Hack saw)
২২. বেন্ডার (Blender)
২৩. ডেসিকেটর (Desicator)
২৪. হ্যাককীট (Hack-kit), ইত্যাদি

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. মেজারিং টেপ

২. ব্যবহারিক খাতা

৩. পেনসিল

৪. ইরেজার, ইত্যাদি

২০২২

কাজের ধারা

১. নিকটস্থ কোনো চিংড়ি হ্যাচারিতে গমন কর।

২. হ্যাচারির বিভিন্ন যন্ত্রপাতিগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৩. হ্যাচারির বিভিন্ন যন্ত্রপাতিসমূহ পর্যবেক্ষণকালে এসব যন্ত্রপাতির ব্যবহার/পরিচালনা সম্বন্ধে হ্যাচারি। ব্যবস্থাপকের নিকট থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ কর।

৪. হ্যাচারির বিভিন্ন যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখ।

ব্যবহারিক- ১৬ঃ বাগদা চিংড়ির চক্ষু ডাটা অপসারণ পদ্ধতি অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

স্ত্রী চিংড়ির চোখের বাটোয় এক্স-অঙ্গ ও সাইনাস থাকে। এই এক্স অঙ্গা ডিম্বাশয় পরিপক্কতা রোধের হরমোন MIH, GIH অবমুক্ত করে এবং সাইনাস গ্রন্থিতে তা মজুদ থাকে। কাঙ্খিত উৎপাদনের লক্ষ্যে স্ত্রী চিংড়ির যে কোনো একটি চোখের ডাটা কেটে বা অন্য কোনোভাবে উক্ত চোখের ক্ষমতা নষ্ট করে দিতে হয়। কোন হ্যাচারি পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণের পূর্বে হ্যাচারি কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নেয়া প্রয়োজন।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. পরিপক্ক চিংড়ি বা মাদার শ্রীম্প	৬. রাবার
২. চিমটা	৭. গ্যাস বক্স
৩. গ্যাস বাক্স	৮. ব্যবহারিক খাতা
৪. ট্রে	৯. পেনসিল
৫. মিথিলিন ব্লু	১০. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধারা

১. অনুমতি সাপেক্ষে নিকটস্থ কোনো চিংড়ি হ্যাচারিতে গমন করে হ্যাচারিটি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

২. প্রথমে ব্রুড ট্যাংক থেকে মাদার শ্রিম্প নিয়ে ২-৫ পিপিএম মিথিলিন ব দ্রবণে চিংড়ি রেখে জীবাণুমুক্ত কর।

৩. অতঃপর গ্যাস বক্সের আগুন দিয়ে চিমটা ভালোভাবে গরম কর।

৪. চিমটা উত্তপ্ত হয়ে লাল হলে অন্য একজনের সহায়তায় মাদার শ্রিম্পটিকে ধরে একচাপে চিংড়ির চোখ কেটে ফেলতে হবে।

৫. ব্যবহারিক খাতায় চিংড়ি চোখ কাটার ছবি আঁক।

৬. হ্যাচারি পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর। ২০২২

ব্যবহারিক- ১৭: হ্যাচারিতে ব্যবহৃত পানির লবণাক্ততা, অক্সিজেন, তাপমাত্রা, পিএইচ ও অ্যামোনিয়ার মাত্রা নির্ণয়

ক. রিফ্রাক্টোমিটারের সাহায্যে পানির লবণাক্ততা পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বাগদা চিংড়ি লোনা পানির চিংড়ি। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের লোনা পানির জলাশয়সমূহে বাগদা চিংড়ি পাওয়া যায় এবং উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় লোনা পানিতে বাগদা চিংড়ির চাষ করা হয়। দশ থেকে পঁচিশ পিপিটি লবণাক্ততাযুক্ত পানি বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য । যদিও বাগদা চিংড়ি ০-৭০ পিপিটি লবণাক্তযুক্ত পানিতে বেঁচে থাকতে পারে। পানির লবণাক্ততা পরিমাপ করা যায় রিফ্রাক্টোমিটার ব্যবহার করে।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. ছিপিসহ বোতল
২. বটিং পেপার
৩. রিফ্রাক্টোমিটার
৪. ড্রপার
৫. পাতিত পানি
৬. দুইটি জানা লবণের দ্রবণ
৭. ব্যবহারিক খাতা
৮. পেনসিল
৯. ইরেজার, ইত্যাদি

চিত্র: রিফ্রাক্টোমিটার

কাজের ধাপ

১. যে জলাশয়, পুকুর বা খামারের পানি লবণাক্ত তা নির্ণয় করতে হবে সেই পুকুর/খামার থেকে এক বোতল পানি সংগ্রহ কর।

২. পানি সংগ্রহের বিস্তারিত তথ্য, যেমন- চাষির নাম, খামারের অবস্থান, পানি সংগ্রহের সময়, তারিখ, পানির গভীরতা, পানির রং প্রভৃতি লিপিবদ্ধ কর।

৩. প্রথমে জানা লবণের দ্রবণ তৈরি করে নিতে হবে। ধরা যাক দ্রবণ দুটির মাত্রা ৫ পিপিটি ও ১০ পিপিটি।

৪. ১ লিটার পানিতে ৫ গ্রাম লবণ মিশিয়ে ৫ পিপিটি তৈরি করতে হবে ও ১ লিটার পানিতে ১০ গ্রাম লবন মিশিয়ে ১০ পিপিটি তৈরি করতে হবে।

৫. প্রথমে দ্রবণ দুটিতে রিফ্রাক্টোমিটারটি রেখে পরীক্ষা করে নিতে হবে যে রিফ্রাক্টোমিটার ঠিক আছে কিনা।

৬. এবার রিফ্রাক্টোমিটারের অগ্রভাগে অবস্থিত কভার স্লাইড উঠিয়ে বটিং পেপার বা টিস্যু পেপার দিয়ে রিফ্রাক্টোমিটারের অগ্রভাগ ভালোভাবে পরিষ্কার কর।

৭. রিফ্রাক্টোমিটারের অগ্রভাগে কভার স্লাইডের নিচে ড্রপারের সাহায্যে কয়েক ফোঁটা পাতিত পানি দাও।

৮. রিফ্রাক্টোমিটারের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত আইপিসে চোখ লাগিয়ে রিফ্রাক্টোমিটারের অভ্যন্তরে অবস্থিত কেলটি শূন্যে অ্যাডজাস্ট কর।

৯. এবার রিফ্রাক্টোমিটারের অগ্রভাগে কলার স্লাইডের নিচে কয়েক ফোটা লবণাক্ত পানি দাও।

১০. অতঃপর আইপিসে চোখ লাগিয়ে পানির লবণাক্ত ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা।

১১. রিফ্রাক্টোমিটারের অভ্যন্তরস্থ কেল থেকে সরাসরি লবণাক্ততার মাত্রা পরিমাপ করা।

১২. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

খ. ডিও মিটারের সাহায্যে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ণয়

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বাগদা চিংড়ির অক্সিজেনের চাহিদা অন্যান্য জলজ প্রাণীর তুলনায় বেশি। চিংড়ি চাষের জন্য সর্বোত্তম অক্সিজেন মাত্রা হচ্ছে ৫-৭ মিগ্রা/লিটার। কোনো পুকুরে সাধারণত দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাপ সকালে সবচেয়ে কম এবং বিকালে সবচেয়ে বেশি থাকে। ডিও মিটারের সাহায্যে পানির দ্রবীভূত অক্সিজের পরিমাণ পরিমাপ করা যায়।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. ডিও মিটার

২. ব্যবহারিক খাতা

৩. পেনসিল

৪. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. শুরুতেই ল্যাবরেটরিতে ডিও মিটারটি ক্যালিবারেশন করে ৬ তে স্থির করে নিতে হবে।

২. এরপর নিকটস্থ কোনো চিংড়ি খামারে গমন কর।

৩. খামারের যে কোনো একটি পুকুরের পানিতে ডিও মিটারটির সংবেদনশীল অংশ অল্প সময়ের জন্য ডুবিয়ে

৪. এভাবে পুকুরের কয়েকটি স্থান থেকে ডিও মিটারের সাহায্যে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ পরিমাপ কর।

৫. পেনসিল দিয়ে ডিও মিটারের রিডিংগুলো সময়সহ লিপিবদ্ধ কর।

৬. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

গ. থার্মোমিটারের সাহায্যে পানির তাপমাত্রা নির্ণয়

প্রাসঙ্গিক তথ্য

সাধারণত তাপমাত্রা সমস্ত প্রাণীর জৈব বিপাক (Metabolism) ক্রিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ১° সে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে চিংড়ির বিপাকীয় কার্যক্রম প্রায় ১০% বৃদ্ধি হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জৈব ও রাসায়নিক ক্রিয়া যেমন বাড়ে ঠিক তেমনি তাপমাত্রা কম হলে সমস্ত ক্রিয়া কমে যায়। এই জন্য দেখা যায় ২০° সে তাপমাত্রার চেয়ে ৩০° সে তাপমাত্রায় জলজ প্রাণীসমূহের অক্সিজেন চাহিদা, খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধির হার ইত্যাদি প্রায় দ্বিগুণ হারে বেড়ে যায়। বাগদা চিংড়ির উৎপাদনের জন্য ২৫° - ৩০° সে তাপমাত্রা উত্তম। ২৫° সে তাপমাত্রার নিচে চিংড়ির বৃদ্ধির হার কমতে থাকে এবং ২০° সে এর নিচে বৃদ্ধি প্রায় থেমে যায়। পানির তাপমাত্রা ১৩° সে এর নিচে এবং ৩৪° সে এর উপরে হলে চিংড়ির ব্যাপক মড়ক দেখা দিতে পারে। তাপমাত্রা অত্যধিক হলে খাদ্য ও সার প্রয়োগ প্রয়োজনমত কম বা বেশি অথবা বন্ধ করে দিতে হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে পানি পরিবর্তন করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. থার্মোমিটার
২. ব্যবহারিক খাতা
৩. পেনসিল
৪. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. শুরুতেই ল্যাবরেটরিতে থার্মোমিটারটি ১০০°সে ও ০° সে তাপমাত্রায় পরীক্ষা করে নিতে হবে।
২. এরপর নিকটস্থ কোনো চিংড়ি খামারে গমন কর।
৩. খামারের যে কোনো একটি পুকুরের পানিতে থার্মোমিটারটির সংবেদনশীল অংশ অল্প সময়ের জন্য ডুবিয়ে রাখ।
৪. এভাবে পুকুরের কয়েকটি স্থান থেকে থার্মোমিটারটির সাহায্যে পানির তাপমাত্রার পরিমাণ পরিমাপ কর।
৫. পেনসিল দিয়ে থার্মোমিটারের রিডিংগুলো সময়সহ লিপিবদ্ধ কর।
৬. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

ঘ. পানির পিএইচ নির্ণয়

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পিএইচ হচ্ছে পানিতে দ্রবীভূত হাইড্রোজেন আয়নের মাত্রার পরিমাপ যা ০ হতে ১৪ পর্যন্ত হয়। পিএইচ ৭ হলো নিরপেক্ষ। পিএইচের মান হাইড্রোজেন আয়নের কার্যকারিতা নির্দেশ করে। চিংড়ি চাষের জন্য পানির আদর্শ পিএইচ হচ্ছে ৭.৫ থেকে ৯। পানির পিএইচ কমে গেলে পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পায় এবং চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও খাবার রুচি কমে যায়। আর পানির পিএইচ বেড়ে গেলে চিংড়ির ফুলকা ও চোখ নষ্ট হয়ে যায় এবং চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয়। পিএইচ মিটারের সাহায্যে পানির পিএইচ নির্ণয় করা যায়।

২০২২

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. পিএইচ মিটার
২. ব্যবহারিক খাতা
৩. পেনসিল
৪. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. শুরুতেই ল্যাবরেটরিতে পিএইচ মিটারটি বাফার দ্রবণ ৪ ও ১০ দিয়ে ক্যালিবারেশন করে স্থির করে নিতে হবে।

২. তারপর নিকটস্থ কোনো চিংড়ি খামারে প্রবেশ কর।

৩. খামারের যে কোনো একটি পুকুরের পানিতে পিএইচ মিটারের সংবেদনশীল অংশ কিছুক্ষণের জন্য ডুবিয়ে রাখ।

৪. পিএইচ মিটারের ডিজিটাল স্কেল থেকে পিএইচ এর মাত্রা পরিমাপ কর। কয়েকবার রিডিং নিয়ে গড় মান বের কর এবং সময়সহ ব্যবহারিক খাতায় লিখ।

৫. অনুশীলন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

ঙ. অ্যামোনিয়া টেস্ট কিটের সাহায্যে পানির অ্যামোনিয়া নির্ণয়

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পুকুরের তলদেশে পুঞ্জিভূত জৈব পদার্থের পচন ও জলজ প্রাণীর বিপাকীয় ক্রিয়ায় অ্যামোনিয়ার সৃষ্টি হয়। আধা নিবিড় ও নিবিড় চাষের পুকুরে সাধারণত হঠাৎ ব্যাপক হারে ফাইটোপ্ল্যাংকটনের মড়ক ও অন্যান্য ময়লা-আবর্জনা পচনের কারণে অনায়নিত অ্যামোনিয়া উৎপাদিত হয়। আয়োনিত (NH_4^+) ও অনায়নিত (NH_3) অবস্থায় অ্যামোনিয়া পানিতে বিদ্যমান থাকে। অনায়নিত অ্যামোনিয়া চিংড়ির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। পুকুরের পানিতে অনায়নিত অ্যামোনিয়ার মাত্রা ০.০২৭৫ মিগ্রা/লিটার এর কম থাকতে হবে যা চিংড়ির জন্য সহনীয়। এতে চিংড়ি উৎপাদনে কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। পানিতে অনায়নিত অ্যামোনিয়ার পরিমাণ ০.১ পিপিএম এর বেশি হলে চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ০.৪৫ পিপিএম এর বেশি হলে বৃদ্ধির হার অর্ধেকে নেমে আসে।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. টেস্ট টিউব
২. টেস্ট টিউব হাল্ডোর
৩. বার্নার
৪. লিটমাস পেপার
৫. ব্যবহারিক খাতা
৬. পেনসিল
৭. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. প্রথমে নিকটস্থ কোনো চিংড়ি খামারে গমন করে এক বোতল পানি নাও।

২. অতঃপর ২ মিলি টেস্ট কিটের সাথে ২ মিলি পানি মিশ্রিত কর।

৩. মিশ্রণটি বার্নারে ধরলে অ্যামোনিয়ার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শনাক্তকারী গন্ধ পাওয়া যাবে।

৪. এতে লিটমাস পেপার ধরলে নীল বর্ণ ধারণ করবে।

৫. গন্ধ ও বর্ণের উপস্থিতি অ্যামোনিয়ার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। দ্রবণটি বাছোট দেখা যেতে পারে।

৬. অনুশীলন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

২০২২

ব্যবহারিক - ১৮ঃ ডিমওয়ালা বাগদা চিংড়ি পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

ডিমওয়ালা বাগদা চিংড়ি গভীর সমুদ্র থেকে চিংড়ি/মাছ ধরার ট্রলার দিয়ে সংগ্রহ করা হয়। কোনো কোনো সময় হ্যাচারিতেও বাগদা চিংড়ি চোখ কাটা বা এ্যাবলেশনের মাধ্যমে পরিপক্ক করা হয়। পরিপক্ব চিংড়ি পর্যবেক্ষণ করলে মাথার নিম্নাংশ থেকে লেজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পরিপক্ক কালো ডিম্বাশয় স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এ সময় উদরাঞ্চলের **১ম** ভাগে ডিম্বাশয় পরিপূর্ণ ডায়মন্ড বা প্রজাপতির আকৃতি ধারণ করে।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. জীবন্ত ডিমওয়ালা চিংড়ি
২. টেস্ট টিউব হাল্ডোর
৩. পরিষ্কার লবণাক্ত পানি
৪. ট্রে
৫. পেনসিল
৬. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধারা

১. নিকটবর্তী কোনো চিংড়ি হ্যাচারিতে গমন কর।
২. ডিমওয়ালা চিংড়ি প্রতিপালন ট্যাংক থেকে ডিমওয়ালা চিংড়ি সংগ্রহ করে ট্রে-এর উপর রাখ।
৩. চিংড়ির মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত ভালোভাবে পরীক্ষা কর।
৪. ডিম্বাশয়ের রং ও আকার ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর এবং খাতায় লিখ।
৫. ডিমওয়ালা চিংড়ি পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখ।

ব্যবহারিক- ১৯ঃ চিংড়ির নার্সারি পুকুর প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

নার্সারি পুকুরের আয়তন খামারের মোট উৎপাদন এলাকার শতকরা ১০ ভাগ হওয়া উচিত। তবে একটি নার্সারি পুকুরের আয়তন ৫০০ বর্গমিটার হলে ভালো হয়। দোআঁশ, এঁটেল বা বেলে দোআঁশ মাটি নার্সারি পুকুরের জন্য ভালো।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. চুন
২. গোবর সার
৩. ইউরিয়া সার
৪. টিএসপি সার
৫. পাওয়ার ট্রিলার
৬. ব্যবহারিক খাতা
৭. পেনসিল
৮. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধারা

১. প্রথমে উপকূলীয় অঞ্চলের চিংড়ি চাষ এলাকায় নির্মিত নার্সারি পুকুরের তলদেশ ২-৫ সপ্তাহ সূর্যালোকে শুকিয়ে নিতে হবে।

২. পুকুরের তলদেশ লাঙল বা ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করে মাটির পিএইচ অনুযায়ী চুন প্রয়োগ করতে হবে।

৩. চুন প্রয়োগের ৪/৫ দিন পর একর প্রতি ৮০০-১০০০ কেজি গোবর, ২০ কেজি ইউরিয়া ও ৩৮ কেজি টিএসপি সার প্রয়োগ করতে হবে।

৪. সার প্রয়োগের পর ৬ ইঞ্চি পানি প্রবেশ করিয়ে ১০-১২ দিন অপেক্ষা করতে হবে।

৫. অতঃপর পানির গভীরতা ২-৩ ফুট বাড়াতে হবে।

৬. পানিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক খাদ্য না জন্মালে পুনরায় ৮ কেজি/একর ইউরিয়া সার এবং ২০ কেজি। একর টিএসপি সার প্রয়োগ করতে হবে। এরপর ৫-৬ দিন অপেক্ষা করতে হবে।

৭. নার্সারি পুকুর প্রস্তুতির ধাপগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৮. ব্যবহারিক খাতায় নার্সারি পুকুর প্রস্তুতির ওপর প্রতিবেদন লিখ।

ব্যবহারিক- ২০: একটি খামারে চিংড়ির রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও পরামর্শ প্রদান

প্রাসঙ্গিক তথ্য

কোনো খামারের চিংড়ির যে কোনো রোগ নির্ণয়ের জন্য খামারটির বিস্তারিত তথ্য জানা বিশেষ প্রয়োজন। খামার প্রস্তুতির বিভিন্ন পদক্ষেপ, খামার ব্যবস্থাপনার অতীত ও বর্তমান কার্যক্রম ইত্যাদি রোগ নির্ণয়ের জন্য জানা অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া রোগ শনাক্তকরণের জন্য খামারের মাটি ও পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ সংক্রান্ত তথ্য ও চিংড়ির বাহ্যিক লক্ষণসমূহ ভালোভাবে জানা দরকার।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১. ওয়াটার এনালাইজার
২. থার্মোমিটার
৩. ডিও মিটার
৪. সেক্কি ডিক
৫. ব্যবহারিক খাতা
৬. পেনসিল
৭. ইরেজার, ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোনো চিংড়ি খামার বা পুকুরে যাও।

২. খামার/পুকুর মালিকের সাথে খামারের সমস্যা ও রোগবালাই সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩. পূর্বে প্রস্তুতকৃত নমুনা ছকে তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ কর।

৪. মাটি ও পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ কর।

৫. বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ শেষে সকল অংশগ্রহণকারী নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে গৃহীত সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ কর।

৬. খামারের জন্য পরবর্তী করণীয় কার্যক্রম সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান কর।

৭. অনুশীলনকৃত কার্যক্রম ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো হলো

ক. খামারের তথ্যাবলি

> খামার মালিকের নাম ও ঠিকানা
> খামারের অবস্থান
> খামারের আয়তন (একর)
> খামার স্থাপনের সাল
> পানির উৎস

খ. খামারের জৈবিক তথ্য

> চাষকৃত প্রজাতি
> মজুদ ঘনত্ব
> পোনা মজুদের তারিখ

২০২২

> রোগাক্রান্ত মাছ/চিংড়ির শতকরা হার

> রোগ শুরুর তারিখ

> প্রয়োগকৃত খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণ

> খাদ্য প্রয়োগের সময়

গ. ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য

> পুকুর প্রস্তুতির পদক্ষেপসমূহ

> পুকুর শুকানো হয়েছে কি না

> চুন প্রয়োগ করা হয়েছিল কি না

> অন্য কোনো রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করা হয়েছিল কী না

> নিয়মিত পানি পরিবর্তন করা হয় কি না

> পানি পরিবর্তনের হার

> প্রয়োগকৃত সারের নাম ও সারের পরিমাণ

ঘ. পানির রাসায়নিক গুণাগুণ সংক্রান্ত তথ্য

> পানির তাপমাত্রা

> পিএইচ

> অ্যালকালাইনিটি

> দ্রবীভূত অক্সিজেন

> অ্যামেনিয়া

ঙ. রোগের লক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

> মাছ/চিংড়ির শরীরে দাগ, ক্ষত প্রভৃতি

> চিংড়ি/মাছের চলাচল, সাঁতার কাটার ধরন প্রভৃতি

> ফুলকার অবস্থা

চ, পরজীবী সংক্রান্ত তথ্য

> বহিঃপরজীবী

> অতঃপরজীবী

> ছত্রাক

> ব্যাকটেরিয়া

২০২২

ছ. পরামর্শ

> চিংড়ির পোনা খামারে ছাড়ার পূর্বে এদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ চাষকালীন সময়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চিংড়ির দৈহিক গতিবিধি ও খাবার গ্রহণের প্রবণতার উপর নজর রাখতে হবে।

> বেশি সংখ্যক চিংড়ির চিকিৎসার পূর্বে ক্ষুদ্র আকার বালতিতে চিংড়ির সহ্যক্ষমতা পরীক্ষা করে নেওয়ার মাধ্যমে চিকিৎসার ত্রুটিজনিত মৃত্যু থেকে এদের রক্ষা করা যেতে পারে।

> রোগাক্রান্ত পুকুরে ব্যবহৃত বা অন্যান্য সামগ্রী জীবাণুমুক্ত না করে সুস্থ পুকুরে ব্যবহার করা যাবে না।

> চিংড়ি চিকিৎসার ক্ষেত্রে সঠিক ঔষধ সঠিক মাত্রায় সঠিক সময়ের জন্য প্রয়োগ করা জরুরি।

> পয়োজনের অতিরিক্ত জৈব সার ও খাদ্য প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে।

> অত্যধিক বৃষ্টিবাহিত পানি খামারে জমা হলে পরিমাণমত চুন প্রয়োগ করতে হবে।

> চিংড়ির খামারে পানি পরিবর্তনের সময় রোগাক্রান্ত জলাশয়ের পানি পরিহার করতে হবে।

> খামার স্থাপন থেকে শুরু করে চিংড়ি ধরার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই চিংড়িকে রোগমুক্ত করা সম্ভব।

১. ইসলাম, খ স ১৯৮৬। বাগদা চিংড়ির আধুনিক চাষ। প্রল হ্যাচারি এন্ড রিসার্চ সেন্টার, কক্সবাজার, বাংলাদেশ।

২. করিম, এম আর ১৯৯০। মাছ ও চিংড়ির চাষাবাদ। পানামা প্রিন্টার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৩. পাল, এস কে ১৯৯৪। চিংড়ি- জীববিদ্যা ও চাষ ব্যবস্থাপনা। মমিন অফসেট প্রেস, নীলক্ষেত, ঢাকা,

বাংলাদেশ।

৪. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৯৫। বাংলাদেশ পরিবেশ উপযোগী মাছ ও চিংড়ি চাষ। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ।

৫. মৎস্য অধিদপ্তর ১৯৯৬ (ক) মৎস্য পক্ষ সংকলন ১৯৯৬। মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৬. মৎস্য অধিদপ্তর ১৯৯৬ (খ) বাগদা চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা। মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৭. বাফরু ১৯৯৬। বাগদা চিংড়ি চাষাবাদ কারিগরি নির্দেশিকা। বাংলাদেশ একুয়াকালচার এন্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইউনিট (বাফরু), ঢাকা, বাংলাদেশ।

৮. পাল, এস কে ১৯৯৬। চিংড়ি হাচারী, আধুনিক চাষ প্রযুক্তি ও রোগ ব্যবস্থাপনা। মমিন অফসেট প্রেস, নীলক্ষেত, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৯. মৎস্য অধিদপ্তর ১৯৯৭ (ক)। বাগদা চিংড়ির আধানিবিড় চাষ ব্যবস্থাপনা। মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১০. মৎস্য অধিদপ্তর ১৯৯৭ (খ)। চিংড়ি পোনা আহরণ ও সুষ্ঠু পরিচর্যা। মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১১. আহমেদ, ম কবির ১৯৯৭। চিংড়ি চাষ ও হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা। হক প্রিন্টার্স, আরামবাগ, ঢাকা, । বাংলাদেশ।

১২. দাস, বি ১৯৯৮ (ক)। চিংড়ি চাষ ও ব্যবস্থাপনা। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৩. দাস, বি ১৯৯৮ (খ)। চিংড়ি চাষ ও ব্যবস্থাপনা। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৪. দাস, বি ১৯৯৯। চিংড়ি চাষ ও ব্যবস্থাপনা। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৫. কাদির, এম এম ২০০০ (ক)। শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-১। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড,

আগারগাঁও, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৬. কাদির, এম এম ২০০০ (খ)। শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-২। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাও, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৭. পাল, এস কে ২০০১। চিংড়ি ও লবস্টার জীববিদ্যা। মমিন অফসেট প্রেস, নীলক্ষেত, ঢাকা, বাংলাদেশ।
১৮. মৎস্য অধিদপ্তর ২০০৩। মৎস্য পক্ষ সংকলন ২০০৩। মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৯. মৎস্য অধিদপ্তর ২০০৫। পরিবেশবান্ধব বাগদা চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা কোর্স। চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

২০২২

২০. FAO 2005. Low cost Processing of Fish in Coastal Bangladesh. GoB/UNDP/FAO Project, BCAS, Dhaka, Bangladesh.

২১. Karim, M S 2006.:raceability & HACCP System Implementation for Quality Fish & Fish Products and Role of Field Level Officers of DoF. Commerce & Industry, Issue No. 211, Dhaka, Bangladesh.

২২. Karim, M S 2007. Aquaculture Practices & Constraints:o Meet:he EU Requirements. Commerce & Industry, Issue No. 156, Dhaka, Bangladesh.

২৩. মৎস্য অধিদপ্তর ২০০৭। মৎস্য পক্ষ সংকলন ২০০৭। মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

২৪. মৎস্য অধিদপ্তর ২০০৭। গলদা চিংড়ির চাষ। স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদশে।

২৫. Karim, M S ২০০৭. Safe Aquaculture Production Management. Sahittaya Prokasoni, Mohammadpur, Dhaka, Bangladesh.

২৬. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০০৭। গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষে উন্নত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল)। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ।

২৭. ওয়ার্ল্ডফিস ২০০৭। বাগদা চিংড়ি চাষের উন্নত পদ্ধতি। শ্রিম্প কোয়ালিটি সাপোর্ট প্রজেক্ট, ওয়ার্ল্ডফিস সেন্টার, ঢাকা, বাংলাদেশ।

২৮. মৎস্য অধিদপ্তর ২০০৮। মৎস্য পক্ষ সংকলন ২০০৮। মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

২৯. পাল, এস কে ২০০৮। চিংড়ি পরিবেশবান্ধব চাষ প্রযুক্তি, আর্থ-সামাজিক ও মান নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা। মমিন অফসেট প্রেস, নীলক্ষেত, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৩০. ওয়ার্ল্ডফিস ২০০৮। পোনা পরিবহন ব্যবস্থাপনা সহায়িকা। সাইক্লোন এ্যাফেক্টেড অ্যাকুয়াকালচার রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট, ওয়ার্ল্ডফিস সেন্টার, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৩১. মৎস্য অধিদপ্তর ২০০৯। মৎস্য পক্ষ সংকলন ২০০৯। মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

সমাপ্ত

২০২২

স্বাধীনতার
৫০
বছর
উন্নয়ন আমারও

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রঃ 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ'

বিদ্যুৎ উৎপাদনে পারমাণবিক প্রযুক্তি সর্বাধিক নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি। বিশ্বে মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ১০ ভাগ আসে পারমাণবিক প্রযুক্তি খাত থেকে। বাংলাদেশও বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের মতো ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য স্বল্প মূল্যে উৎপাদিত পরিবেশ বান্ধব এই প্রযুক্তির ব্যবহার করার প্রয়াসে পাবনা জেলার রূপপুরে দুই ইউনিট বিশিষ্ট পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করছে। প্রতিটি ইউনিট প্রায় ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করবে। ১৯৬১ সালে পাবনা জেলায় ৬৩২ একরের উপর এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হলেও তা স্থগিত হয়ে যায়। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন। তারই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে শেখ হাসিনা সরকারের উদ্যোগে ২০১৭ সালের নভেম্বরে প্রথম ইউনিট ও ২০১৮ সালে দ্বিতীয় ইউনিটের নির্মাণ কাজ শুরু হয় যা ২০২৩ বা ২০২৪ সাল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হবে।

২০২২ শিক্ষাবর্ষ

শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য